চৈতালি

রবীন্দ্রনাথ

চি

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত পা

“পদ্মা”

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশো

রবীন্দ্রনাথ

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে

সুচনা

নদীর প্রবাহের একধারে সামান্য একটা ভাঙা ডাল আটকা পড়েছিল। সেইটেতে ঘোলা জল থেকে পলি ছেঁকে নিতে লাগল। সেইখানে ক্রমে একটা দ্বীপ জমিয়ে তুললে। ভেসে-আসা নানা কিছু অবান্তর জিনিস দল বাঁধল সেখানে, শৈবাল ঘন হয়ে সেখানে ঠেকল এসে, মাছ পেল আশ্রয়, এক পায়ে বক রইল দাঁড়িয়ে শিকারের লোভে, খানিকটুকু সীমানা নিয়ে একটা অভাবিত দৃশ্য জেগে উঠল তার সঙ্গে চারদিকের বিশেষ মিল নেই। চৈতালি তেমনি একটুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যখেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার-প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যেই।

এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।

আমার অল্পবয়সের লেখাগুলিকে এক দিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ঐ দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে অন্তরে আমি গান গাই। চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে কিন্তু গানের রূপ নেই। কেননা তখন যে-আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল, তাতে গানের রস যদি বা নামে গানের সুর জায়গা পায় না।

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,— পরান-বল্লভ,
তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে,—
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

রবীন্দ্রনাথ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্যাস্টেল-চিত্র

চৈতালি

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে,
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এস নিকুঞ্জ-নিবাসে,
এস মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে

বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মর নিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।

১৩ চৈত্র, ১৩০২

গীতহীন

চলে গেছে মোর বীণাপাণি।
কতদিন হল সে না জানি।
কী জানি কী অনাদরে বিস্মৃত ধূলির 'পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি।

ফুটেছে কুসুমরাজি,— নিখিল জগতে আজি
আসিয়াছে গাহিবার দিন,
মুখরিত দশদিক অশ্রান্ত পাগল পিক,
উচ্ছ্বসিত বসন্ত-বিপিন।
বাজিয়া উঠেছে ব্যথা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
মনে ভরি উঠে কত বাণী,
বসে আছি সারাদিন গীতিহীন স্তুতিহীন,—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।
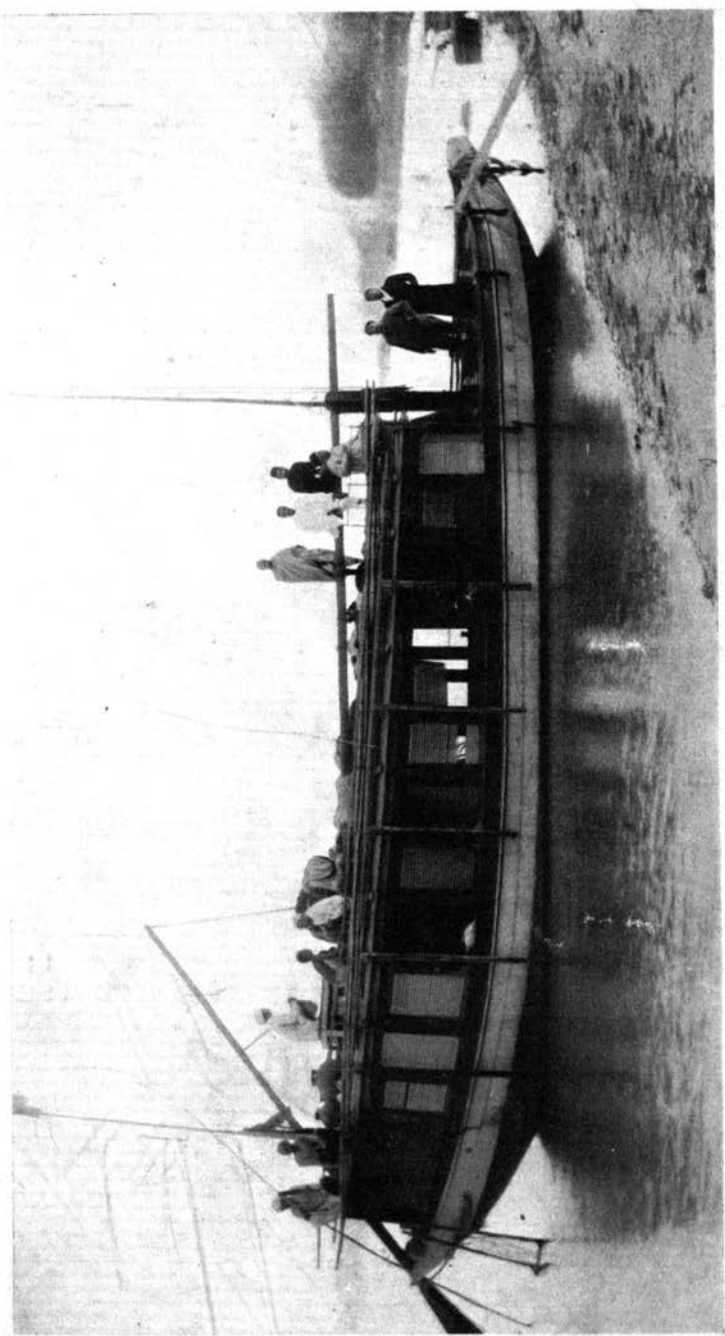
"পদ্মা"

এই বোটে চৈতালি ও ছিন্নপত্রের অধিকাংশ লিখিত হয়

আশার সীমা

সকল আকাশ সকল বাতাস
সকল শ্যামল ধরা
সকল কান্তি, সকল শান্তি
সন্ধ্যাগগন-ভরা,
যত কিছু সুখ, যত সুধামুখ,
যত মধুমাখা হাসি,
যত নব নব বিলাস-বিভব,
প্রমোদ-মদিরারাশি,
সকল পৃথ্বী সকল কীর্তি
সকল অর্ঘ্যভার,
বিশ্ব-মথন সকল যতন,
সকল রতনহার,—
সব পাই যদি তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন,—
যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহকোণ।

১৪ চৈত্র, ১৩০২

দেবতার বিদায়

দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।"

সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

১৪ চৈত্র, ১৩০২

পুণ্যের হিসাব

সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি
কহিলেন—আনো মোর পুণ্যের হিসাব।
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি
দেখিতে লাগিল তার মুখের কী ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া—মহা ভুল এ কী।
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছ আঁকে,
শেষের পাতায় এ যে সব শূন্য দেখি।
যতদিন ডুবে ছিনু সংসারের পাঁকে
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে।
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে বলে—যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা খাতে?
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—বড়ো শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।

১৪ চৈত্র, ১৩০২

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?"
দেবতা কহিলা, "আমি।"—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?"
দেবতা কহিলা, "আমি।"—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু।"
দেবতা কহিলা, "হেথা।"—শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,—
দেবতা কহিলা, "ফির।"—শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

১৪ চৈত্র, ১৩০২

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে

পাখা ঝটপটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্কতৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর,—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।
প্রবাস-বিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে;—
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে,—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

১৫ চৈত্র, ১৩০২

পল্লীগ্রামে

হেথায় তাহারে পাই কাছে,
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল,
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশির-নির্মলা উষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।

১৬ চৈত্র, ১৩০২

সামান্য লোক

সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে বোঝা বহি শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোনোমতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে

এই চাষি দেখা দেয় হয়ে মূর্তিমান
এই লাঠি কাঁধে লয়ে, বিস্মিত নয়ান,—
চারিদিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতিকথা।
তার সুখদুঃখ যত তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গোরু, তার চাষবাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবে না আশ।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

১৭ চৈত্র, ১৩০২

প্রভাত

নির্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর,
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর।
এখনো নামে নি জলে রাজহাঁসগুলি,
এখনো ছাড়ে নি নৌকা সাদা পাল তুলি।
এখনো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে,
চাষি নাহি চলে পথে, গোরু নাই মাঠে।
আমি শুধু একা বসি মুক্ত বাতায়নে
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি উদার গগনে।
বাতাস সোহাগস্পর্শ বুলাইছে কেশে,
প্রসন্ন কিরণখানি মুখে পড়ে এসে।
পাখির আনন্দগান দশদিক হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

১১ চৈত্র, ১৩০২

দুর্লভ জন্ম

এক দিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন'পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এই মতো পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ'পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।
সে-কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়নে।
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্ যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

১৮ চৈত্র, ১৩০২

খেয়া

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস;
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে'
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,

উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে—কে বা জানে নাম—
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

১৮ চৈত্র, ১৩০২

কর্ম

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে।
দুয়ার রয়েছে খোলা, স্নানজল নাই তোলা,
মূর্খাধম আসে নাই রাতে।
মোর ধৌত বস্ত্রখানি কোথা আছে নাহি জানি,
কোথা আহারের আয়োজন,
বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি
দেখা পেলে করিব শাসন।
বেলা হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে
দাঁড়াইল করি করজোড়,
আমি তারে রোষভরে কহিলাম, "দূর হ রে
দেখিতে চাহি নে মুখ তোর।"
শুনিয়া মূঢ়ের মতো ক্ষণকাল বাক্যহত
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে,
কহিল গদ্‌গদস্বরে, "কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে।"
এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।
প্রতিদিবসের মতো ঘষামাজামোছা কত,
কোনো কর্ম রহিল না বাকি।

১৮ চৈত্র, ১৩০২

বনে ও রাজ্যে

সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন'পরে
সন্ধ্যায় পশিলা রাম শয়নের ঘরে।
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল,
তারি 'পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল ;—
দেবশূন্য দেবালয়ে ভক্তের মতন
বসিলেন ভূমি'পরে সজল নয়ন,
কহিলেন নতজানু কাতর নিশ্বাসে—
যতদিন দীনহীন ছিনু বনবাসে
নাহি ছিল স্বর্ণমণি মাণিক্যমুক্তা,
তুমি সদা ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা।
আজি আমি রাজ্যেশ্বর, তুমি নাই আর,
আছে স্বর্ণমাণিক্যের প্রতিমা তোমার।
নিত্যসুখ দীনবেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

সভ্যতার প্রতি

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন

মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরানে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

বন

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন,—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা ;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র ; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণ-গাথা ; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননী-বক্ষের ; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশুসনে ; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

তপোবন

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি,—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

প্রাচীন ভারত

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত-ললাট ;
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সংগীত আর নূপুর-ঝংকারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জে, বিজয়-উল্লাসে,

রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

১ শ্রাবণ, ১৩০৩

ঋতুসংহার

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণ রাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে ;—ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে ; ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

২০ চৈত্র, ১৩০২

মেঘদূত

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্ধ্ব হতে এক দিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন ; মিলনের মরীচিকা,
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়া-কুহেলিকা
খররৌদ্রকরে। ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা—
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

২১ চৈত্র, ১৩০২

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে,—আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার ; পিত্তল কঙ্কণ
পিতলের থালি'পরে বাজে ঠন ঠন ;—
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন, তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,

পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থিরধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর; জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।

২১ চৈত্র, ১৩০২

পরিচয়

এক দিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদী তীরে তীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দু-জনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু,—দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

২১ চৈত্র, ১৩০২

অনন্ত পথে

বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন
ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন,
গম্ভীর কর্তব্যরত,—তৎপর-চরণে
আসে যায় নিত্যকাজে ; অশ্রুভরা মনে
ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।
আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে ;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম-অবসানে
আপন স্বদেশে ; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানি নে ওরে ; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি।
কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূরদেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

২১ চৈত্র, ১৩০২

ক্ষণ-মিলন

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দু-জনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।
দু-জনের এক জন এক দিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে

আর কভু ফিরিবে না মুখামুখি পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম ?

২২ চৈত্র, ১৩০২

প্রেম

নিবিড় তিমির নিশা অসীম কান্তার,
লক্ষ দিকে লক্ষ জন হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন পথপানে
কার তরে, পান্থ তাহা আপনি না জানে।
শুধু মনে হয় চিরজীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।
কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ।
দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো;
তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারি নে তারা আছে কি না আছে।

২২ চৈত্র, ১৩০২

পুঁটু

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে।
তৃষাতুরা বসুন্ধরা দিবসের দাহে।
হেনকালে শুনিলাম বাহিরে কোথায়
কে ডাকিল দূর হতে—"পুঁটুরানী আয়।"
জনশূন্য নদীতটে তপ্ত দ্বিপ্রহরে
কৌতূহল জাগি উঠে স্নেহকণ্ঠস্বরে।
গ্রন্থখানি বন্ধ করি উঠিলাম ধীরে,
দুয়ার করিয়া ফাঁক দেখিনু বাহিরে।
মহিষ বৃহৎকায় কাদামাখা গায়ে
স্নিগ্ধনেত্রে নদীতীরে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায়
স্নান করাবার তরে "পুঁটুরানী আয়।"
হেরি সে যুবারে, হেরি পুঁটুরানী তারি
মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধাবারি।

২৩ চৈত্র, ১৩০২

হৃদয়-ধর্ম

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
মধ্যদিনে দগ্ধদেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
মা বলে সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে-সকল তরুলতা রচি উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে, তারা ভাইবোন।

যে পশুরে জন্ম হতে আপনায় জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরানী।
বুদ্ধি শুনে হেসে উঠে, বলে কী মূঢ়তা।
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হৃদয়ের কথা।

১ শ্রাবণ, ১৩০৩

মিলন-দৃশ্য

হেসো না হেসো না তুমি বুদ্ধি-অভিমানী,
এক বার মনে আনো, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজনবৎসলা
জন্মতপোবন হতে,—সখা সহকার,
লতাভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে,—স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লব-মর্মরে,
ছলছল মালিনীর জলকলস্বরে ;—
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর
মঙ্গল বিদায়মন্ত্র গদ্‌গদ-গম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন।

২ শ্রাবণ, ১৩০৩

দুই বন্ধু

মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক হৃদয়,
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়!
কোন আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে

পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
সেদিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে ;—
তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
পরানে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি,
অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি,
মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে,—
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।
যেন দুই ছদ্মবেশে দু-বন্ধুর মেলা—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা।

২ শ্রাবণ, ১৩০৩

সঙ্গী

আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে
একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্ণবেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুকুরশিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে
লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারংবার।
বালিকা ভৎ র্সিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তাহে উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জনী,—
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গনি।
তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ'পরে
বালিকা ব্যথিল তারে আদরে আদরে।

২৩ চৈত্র, ১৩০২

সতী

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্তিহীনা কত না কামিনী ;—
কেহ ছিল রাজসৌধে কেহ পর্ণঘরে,
কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনাদরে ;
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্ত্যধাম।
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী
মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী-শিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব-কাহিনী।

২৪ চৈত্র, ১৩০২

স্নেহদৃশ্য

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার।
হেরি তার উদাসীন হাসিহীন মুখ
মনে হয় সংসারের লেশমাত্র সুখ
পারে না সে কোনোমতে করিতে শোষণ
দিয়ে তার সর্বদেহ সর্বপ্রাণমন।
স্বল্পপ্রাণ শীর্ণ দীর্ঘ জীর্ণ দেহভার
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার

আশাহীন দৃঢ়ধৈর্য মৌনম্লানমুখে
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সম্মুখে।
আসে যায় রেলগাড়ি, ধায় লোকজন,—
সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
একটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

২৪ চৈত্র, ১৩০২

করুণা

অপরাহ্ণে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড়; কর্মশালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কষাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানির খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে চলে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি,
পাষাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি।
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার,
স্বর্গে যেন দয়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

২৪ চৈত্র, ১৩০২

পদ্মা

হে পদ্মা আমার।
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
এক দিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়ে ছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সেদিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

নানা কর্মে মোর কাছে আসে নানা জন,
নাহি জানে আমাদের পরান-বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল ;
যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটিরে কুটিরে,
তুমি কোন্ গান কর আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায় নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শত বার দেখাশুনা তোমায় আমায়।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,

যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে,—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?
জন্মান্তরে শত বার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়।

২৫ চৈত্র, ১৩০২

স্নেহগ্রাস

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাত সম্পত্তি তোমার।

২৫ চৈত্র, ১৩০২

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।

২৬ চৈত্র, ১৩০২

দুই উপমা

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে;—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

২৬ চৈত্র, ১৩০২

অভিমান

কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ !
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ।
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালি।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি 'পরে তোমার নালিশ !
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্‌বিদিকে বাজাস নে ঢাক।
এক দিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।

২৬ চৈত্র, ১৩০২

পর-বেশ

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পর-বস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান ?
বলিছে না, "ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো,
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?"
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।

ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্‌কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে ?
বলিতেছে, যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়।
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' এ কী অহংকার।
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।

২৬ চৈত্র, ১৩০২

সমাপ্তি

যদিও বসন্ত গেছে তবু বারে বারে
সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবারে।
সহসা পঞ্চম রাগ আপনি সে বাজে,
তখনি থামাতে চাই শিহরিয়া লাজে।
যত না মধুর হ'ক মধু রসাবেশ
যেখানে তাহার সীমা সেথা করো শেষ।
যেখানে আপনি থামে যাক থেমে গীতি,
তার পরে থাক তার পরিপূর্ণ স্মৃতি।
পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়,
টানিয়া ক'রো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়।
নিঃশব্দে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার,
তেমনি হউক শেষ শেষ যা হবার।
আসুক বিষাদভরা শান্ত সান্ত্বনায়
মধুর মিলন অন্তে সুন্দর বিদায়।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

ধরাতল

ছোটো কথা ছোটো গীত আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে,—
ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাইবোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে,
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে
আমার পরান হতে ধরার পরানে,—
ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

তত্ত্ব ও সৌন্দর্য

শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার
ন'হি অন্ত মহামূল্য মণিমুকুতার।
নিশিদিন দেশে দেশে পণ্ডিত ডুবারি
রত রহিয়াছে কত অন্বেষণে তারি।
তাহে মোর নাহি লোভ, মহাপারাবার।
যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,
যে মহিমা প্রসারিত তব নীল জলে,
যে সংগীত উঠে তব নিয়ত আঘাতে,
যে বিচিত্র লীলা তব মহানৃত্যে মাতে,

এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি
তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

তত্ত্বজ্ঞানহীন

যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

২৮ চৈত্র, ১৩০২

নারী

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম-জন্ম আছ এ পরানে।
মানসীরূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্যসাথে যাও মিলে মিশে।
চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

২৮ চৈত্র, ১৩০২

প্রিয়া

শত বার ধিক আজি আমারে, সুন্দরী,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার 'পরে পড়ে নি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।

অপরূপ মায়াবলে তব হাসি-গান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

২৮ চৈত্র, ১৩০২

ধ্যান

যত ভালোবাসি, যত হেরি বড়ো করে
তত, প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি,
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।
আজি এ বসন্ত-দিনে বিকশিত মন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব স্বপন ;—
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহাপারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

২৮ চৈত্র, ১৩০২

মৌন

যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি—এ নয়, এ নয়।
যে-কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে-কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।

সে শুধু ভরিয়া উঠি' অশ্রুর আবেগে
হৃদয়-আকাশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে ;
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায়
অন্তর করিয়া ছিন্ন কী দেখাতে চায়।
মৌন মূক মূঢ় সম ঘনায়ে আঁধারে
সহসা নিশীথরাত্রে কাঁদে শত ধারে।
বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ,
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান।
বাঁশি যেন নাই, বৃথা নিশ্বাস কেবল।
রাগিণীর পরিবর্তে শুধু অশ্রুজল।

২৯ চৈত্র, ১৩০২

অসময়

বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি গড়িবে তুলি আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে,—এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবনসম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া ;
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি,—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।
শুধু এ মর্মরহীন বনপথ'পরি
তোমারি মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে,
কালিকার গান আজি আছে মৌন হয়ে।
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

২৯ চৈত্র, ১৩০২

গান

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।
যৌবনসমুদ্রমাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার।
উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে কী খেলা তোমার
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে
এস কাছে যাও দূরে শত লক্ষ বার।
তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

জাগরণসম তুমি আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।
সুষুপ্তির প্রান্ততীরে দেখা দাও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে।
দেখিতে দেখিতে শেষে সকল হৃদয়ে এসে
দাঁড়াও আকুল কেশে রাতুল চরণে,—
সকল আকাশ টুটে তোমাতে ভরিয়া উঠে;
সকল কানন ফুটে জীবনে যৌবনে।
জাগরণসম তুমি আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।

কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ'পরে।
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরানে পশিছে আসি,
সুখস্বপ্ন পরকাশি নিভৃত অন্তরে।

পরশ-পুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন, মোর সর্বাঙ্গে সঞ্চরে।
কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ'পরে।

২৯ চৈত্র, ১৩০২

শেষ কথা

মাঝে মাঝে মনে হয়, শত কথা ভারে
হৃদয় পড়েছে যেন শুয়ে একেবারে।
যেন কোন্ ভাব-যজ্ঞ বহু আয়োজনে
চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।
অধীর সিন্ধুর মতো কলধ্বনি তার
অতি দূর হতে কানে আসে বারংবার।
মনে হয় কত ছন্দ, কত না রাগিণী
কত না আশ্চর্য গাথা, অপূর্ব কাহিনী,
যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে
সব মিলিতেছে আসি অপূর্ব মিলনে;
এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।

৩০ চৈত্র, ১৩০২

বর্ষশেষ

নির্মল প্রত্যূষে আজি যত ছিল পাখি
বনে বনে শাখে শাখে উঠিয়াছে ডাকি।
দোয়েল শ্যামার কণ্ঠে আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার নাহি মিটে আশ।

করুণ মিনতিস্বরে অশ্রান্ত কোকিল
অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, উড়ে মত্তবৎ,
ফিরিয়া পেয়েছে যেন হারানো জগৎ।
পাখিরা জানে না কেহ আজি বর্ষশেষ,
বকবৃদ্ধ কাছে নাহি শুনে উপদেশ।
যত দিন এ আকাশে এ জীবন আছে,
বরষের শেষ নাহি তাহাদের কাছে।
মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।

৩০ চৈত্র, ১৩০২

অভয়

আজি বর্ষশেষ দিনে, গুরুমহাশয়,
কারে দেখাইছ বসে অন্তিমের ভয়।
অনন্ত আশ্বাস আজি জাগিছে আকাশে,
অনন্ত জীবনধারা বহিছে বাতাসে,
জগৎ উঠেছে হেসে জাগরণ-সুখে,
ভয় শুধু লেগে আছে তব শুষ্ক মুখে।
দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস ;
প্রবঞ্চনা করি তুমি দেখাইছ ত্রাস।
বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি,
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।
তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার-কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের।
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

৩০ চৈত্র, ১৩০২

অনাবৃষ্টি

শুনেছিনু পুরাকালে মানবীর প্রেমে
দেবতারা স্বর্গ হতে আসিতেন নেমে।
সেকাল গিয়েছে। আজি এই বৃষ্টিহীন
শুষ্কনদী দগ্ধক্ষেত্র বৈশাখের দিন
কাতরে কৃষক-কন্যা অনুনয়-বাণী
কহিতেছে বারংবার—আয় বৃষ্টি হানি।
ব্যাকুল প্রত্যাশাভরে গগনের পানে
চাহিতেছে থেকে থেকে করুণ নয়ানে।
তবু বৃষ্টি নাহি নামে, বাতাস বধির
উড়ায়ে সকল মেঘ ছুটেছে অধীর ;
আকাশের সর্বরস রৌদ্র রসনায়
লেহন করিল সূর্য। কলিযুগে, হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি। নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি।

২ বৈশাখ, ১৩০৩

অজ্ঞাত বিশ্ব

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে
অসীম প্রকৃতি। সরল বিশ্বাসভরে
তবু তোরে গৃহ বলে মাতা বলে মানি।
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি
প্রচণ্ড পিশাচরূপে ছুটিয়া গর্জিয়া
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ংকরী ধূলিপক্ষ'পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন।
সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ,

অনন্ত আকাশপথ রুধি চারিধারে
কে তুমি সহস্রবাহু ঘিরেছ আমারে।
আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি।
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি।

২ বৈশাখ, ১৩০৩

ভয়ের দুরাশা

জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে,
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্তস্বর। যদি ব্যাঘ্রিনীর মতো
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।
নখর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে।
এমনি দুরাশা। আছ তুমি লক্ষ কোটি
গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য গগনে প্রকটি
হে মহামহিম। তুলি তব বজ্রমুঠি
তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি,
আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোথা পড়ে আছি,
মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী!

২ বৈশাখ, ১৩০৩

ভক্তের প্রতি

সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়,
কী গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয়
তাই ভাবি মনে। উৎফুল্ল উত্তান চোখে
চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে

আমারে উজ্জ্বল করি। তারুণ্য তোমার
আপন লাবণ্যখানি লয়ে উপহার
পরায় আমার কণ্ঠে,—সাজায় আমারে
আপন মনের মতো দেবতা-আকারে
ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি।
সেথায় একাকী আমি সসংকোচে মরি।
সেথা নিত্য ধূপে দীপে পূজা-উপচারে
অচল আসন 'পরে কে রাখে আমারে।
গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুবতারা, নহি আমি রবি।

২১ আষাঢ়, ১৩০৩

নদীযাত্রা

চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ুভরে।
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্ত শিয়রে।
বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়।
দুই কূলে স্তব্ধ ক্ষেত্র শ্যাম শস্যে ভরা,
আলস্য-মন্থর যেন পূর্ণগর্ভা ধরা।
আজি সর্ব জলস্থল কেন এত স্থির।
নদীতে না হেরি তরী, জনশূন্য তীর।
পরিপূর্ণ ধরামাঝে বসিয়া একাকী
চিরপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান-আঁখি।
সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘভার
পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার।
গুঞ্জরিয়া গাহিতেছে সকরুণ তানে,
ভুলায়ে নিতেছে মোর উতলা পরানে।

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

মৃত্যুমাধুরী

পরান কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর।
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার।
মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।
প্রশান্ত করুণচক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।
প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

স্মৃতি

সে ছিল আরেক দিন এই তরী'পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।
ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়,
সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
পাশে বসি বলে যেত কলকণ্ঠকথা,
কত কী কাহিনী তার কত আকুলতা।

প্রত্যূষে আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাত-পাখির মতো জাগাত আসিয়া।
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে।

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

বিলয়

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।
বরষার নদী'পরে ছল ছল আলো,
দূরতীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি
"আজ প্রাতে সব পাখি উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে
অনন্ত জগৎমাঝে গিয়েছে হারায়ে।"

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

প্রথম চুম্বন

স্তব্ধ হল দশদিক নত করি আঁখি,—
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখি।
শান্ত হয়ে গেল বায়ু,—জলকলস্বর
মুহূর্তে থামিয়া গেল,—বনের মর্মর
বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায়
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্বাক ধরায়।
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন
আমাদের দু-জনের প্রথম চুম্বন।
দিক্-দিগন্তরে বাজি উঠিল তখনি
দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি,
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি।

১০ শ্রাবণ, ১৩০৩

শেষ চুম্বন

দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
উষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।
ম্লান হয়ে এল তারা ;—পূর্ব-দিগ্‌বধূর
কপোল শিশিরসিক্ত, পাণ্ডুর বিধুর।
ধীরে ধীরে নিবে গেল শেষ দীপশিখা,
খসে গেল যামিনীর স্বপ্ন-যবনিকা।
প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপসম
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।

সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্বর সঘন
আমাদের সর্বশেষ বিদায়-চুম্বন।
মুহূর্তে উঠিল বাজি চারিদিক হতে
কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্র সংসারের পথে।
মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে ;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

১০ শ্রাবণ, ১৩০৩

যাত্রী

ওরে যাত্রী যেতে হবে বহুদূরদেশে।
কিসের করিস চিন্তা বসি পথশেষে,
কোন্ দুঃখে কাঁদে প্রাণ। কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধনেত্র মেলি। কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে।
কোথায় রহিবে পড়ি এ তোর সংসার।
কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো,
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর-ক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দু-ধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।
তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে,
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

তৃণ

হে বন্ধু প্রসন্ন হও, দূর করো ক্রোধ।
তোমাদের সাথে মোর বৃথা এ বিরোধ।
আমি চলিবারে চাই যেই পথ বাহি
সেথা কারো তরে কিছু স্থানাভাব নাহি।
সপ্তলোক সেই পথে চলে পাশে পাশে
তবু তার অন্ত নাই মহান আকাশে।
তোমার ঐশ্বর্যরাশি গৃহভিত্তিমাঝে
ব্রহ্মাণ্ডেরে তুচ্ছ করি দীপ্তগর্বে সাজে।
তারে সেই বিশ্বপথে করিলে বাহির
মুহূর্তে সে হবে ক্ষুদ্র ম্লান নতশির,—
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নবতৃণদল
বরষার বৃষ্টিধারে সরস শ্যামল।
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ওগো অভিমান,
এ আমার আজিকার অতি ক্ষুদ্র গান।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

ঐশ্বর্য

ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে।
পুরবের নবসূর্য, নিশীথের শশী,
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি।
আমার এ গান এও জগতের গানে
মিশে যায় নিখিলের মর্মমাঝখানে ;—
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর।
কিন্তু, হে বিলাসী, তব ঐশ্বর্যের ভার
ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বারে শুধু একাকী তোমার।

নাহি পড়ে সূর্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ,
নাহি তাহে নিখিলের নিত্য আশীর্বাদ।
সম্মুখে দাঁড়ালে মৃত্যু মুহূর্তেই হায়
পাংশুপাণ্ডু শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হয়ে যায়।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

স্বার্থ

কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক,
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
লুকায় অনন্ত সত্য,—স্নেহ সখ্য প্রীতি
মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি,—
থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন
তোর তুচ্ছ পরিহাসে। ওগো বন্ধুগণ
সব স্বার্থ পূর্ণ হ'ক। ক্ষুদ্রতম কণা
ভাণ্ডারে টানিয়া আনো—কিছু ত্যজিয়ো না।
আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী
অমৃতে অশ্রুতে মাখা। মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক।
থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

প্রেয়সী

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা; মাথার উপর
সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর

রাখিয়াছে স্নিগ্ধহস্ত আশীর্বাদে ভরা,
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃত-চুম্বন;
উতলা বাতাস আসি করে আলিঙ্গন;
অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ
বহে যায় ভরা নদী; মধ্যাহ্নের মেঘ
স্বপ্নমালা গাঁথি দেয় দিগন্তের ভালে।
তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

শান্তিমন্ত্র

কাল আমি তরী খুলি লোকালয়মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে,—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে,
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা-পাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব ঝঞ্চনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি যবে রক্ত টেনে আনে
তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।
বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—ব'লো কানে কানে—
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

কালিদাসের প্রতি

আজি তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস,—রাজ-অধিরাজ।
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান,—গীতিসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া'পরে।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

কুমারসম্ভবগান

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান,—চারি দিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ,—শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল,—কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস

দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

১৫ শ্রাবণ, ১৩০৩

মানসলোক

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির-প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি,—কবি কালিদাস!
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধনীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি;—
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি,
শংকরচরিতগানে ভরিয়া ভুবন।—
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।

১৫ শ্রাবণ, ১৩০৩

কাব্য

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা যড়চক্র, আঘাত গোপন।

কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর,—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার উর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্যপানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্যদুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

প্রার্থনা

আজি, কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত,—
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর ঘরষে ঘরষে
মর্ম মাঝারে শল্য বরষে
তবু প্রাণমন পীযূষ-পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরান-বল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ করপল্লব।
হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাতে
আছি নতশির গঞ্জিত,

তবু চিত্তললাট তোমারি স্বকরে
রয়েছে তিলকরঞ্জিত।
হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে
বাজায় বিরোধ-ঝঞ্ঝনা।
প্রাণে দিবসরজনী উঠিতেছে ধ্বনি
তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

ইছামতী নদী

অয়ি তন্বী ইছামতী তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটিরে কুটিরে,—
শস্যে পূর্ণ হ'ক ক্ষেত্র তব তটদেশে।
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিত বেশে
ঘনঘোরঘটাসাথে বজ্রবাদ্যরবে
পূর্ববায়ু-কল্লোলিত তরঙ্গ-উৎসবে
তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে
আশ্রিত পালিত তব দুই তটগ্রামে,
সমারোহে চলে এস শৈলগৃহ হতে
সৌভাগ্যে শোভায় গর্বে উল্লসিত স্রোতে।
যখন রব না আমি, রবে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চরিয়া প্রাণ,
তোমার আনন্দগাথা এ বঙ্গে, পার্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতী।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

শুশ্রূষা

ব্যথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে
অতিথিবৎসলা নদী কত স্নেহভরে
শুশ্রূষা করিলে আজি,—স্নিগ্ধ হস্তখানি
দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে সুধা দিল আনি।
সায়াহ্ন আসিল নামি, পশ্চিমের তীরে
ধান্যক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে।
পূর্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা,
জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা ;
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর
কর্ম-অবসানধ্বনি অজ্ঞাত পল্লীর।
দুই তীর হতে তুলি দুই শান্তিপাখা
আমারে বুকের মাঝে দিলে তুমি ঢাকা।
চুপি চুপি বলি দিলে—বৎস, জেনো সার,
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

আশিস-গ্রহণ

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে।
সংসার-বিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে।
বিদায় নেবার আগে, পারি যতক্ষণ
পরিপূর্ণ করি লই মোর প্রাণমন
নিত্য-উচ্চারিত তব কলকণ্ঠস্বরে
উদার মঙ্গলমন্ত্রে—হৃদয়ের 'পরে
লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয়।
এই আশীর্বাদ করো, জয়পরাজয়
ধরি যেন নম্রচিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।

বিশ্বস্ত স্নেহের মূর্তি দুঃস্বপ্নের প্রায়
সহসা বিরূপ হয়—তবু যেন তায়
আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার,
আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

বিদায়

হে তটিনী সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো ;—উদার গগন
—অলিখিত মহাশাস্ত্র—নীল পত্রগুলি
দিক হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি ;—
শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্জনে
সত্যের স্বরূপখানি নির্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীত শিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমাসবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত আলিঙ্গনে
নির্জন লক্ষ্মীরে। শুভশান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

নাটক ও প্রহসন

কাহিনী

সাদর উৎসর্গ

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য

মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর

করকমলে

২০শে ফাল্গুন

১৩০৬

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর দেবমাণিক্য

কাহিনী

গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধন। প্রণমি চরণে তাত।

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়
অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ ?

দুর্যোধন। লভিয়াছি জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী ?

দুর্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
রে দুর্মতি ?

দুর্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ।
জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস—ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত—
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিত সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীব-টংকারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে,
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি, ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার—নিত্য নব ভোগসুখে

আছিনু নিশ্চিন্ত চিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরব-কর্ণ প্রতিধ্বনিরবে ;
পাণ্ডবের যশোবিম্ব-প্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন-কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু পিত
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডব-গৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি,—আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ।
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি ?

দুর্যোধন। ভুলিতে পারি নে সে যে,—
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি।—যদি হত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ ; শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,—
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্যলোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী।

দুর্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান,—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন ;

নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে,—
এক সূর্য এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল,—আজি কুরুসূর্য একা,
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিত।
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায় সুহৃদ্‌রূপে নির্ভর বন্ধন,—
কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে
বলভাগ করে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী; রাজদণ্ডে যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার?
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডব-গৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে ক'স জয়?
লজ্জাহীন অহংকারী।

দুর্যোধন। (যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিত, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্র সনে নখে দন্তে নহিক সমান,
তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়?) মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে,—জয়লাভ এক লক্ষ্য তার,—
আজি আমি জয়ী পিত, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্‌কারে।

দুর্যোধন। (নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে।) "দুর্যোধন পাপী,
দুর্যোধন ক্রূরমনা, দুর্যোধন হীন"—
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ,
"দুর্যোধন রাজা।—দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম।"

ধৃতরাষ্ট্র। (ওরে বৎস, শোন্।
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে,—দিয়ো না তাহারে

নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো বন্দী করো. নিন্দা-সর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।)

দুর্যোধন। (অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ। প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,—
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,—
সে প্রীতি বিলাক তারা, পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর পাণ্ডবভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ।) আমি চাহি ভয়
সে-ই মোর রাজপ্রাপ্য,—আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব,—এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টক-তরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান ;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান
আমাদের নিত্য নিন্দা,—এই মতে পিত
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চিরনির্বাসিত।
এই মতে পিত মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল,—উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত ; পাণ্ডবেরা স্ফীত
অখণ্ড অবাধগতি ;—অদ্য হতে পিত
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর

ভীষ্ম পিতামহে,—যদি তাঁরা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্‌কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব,—নাহি কাজ
সিংহাসন কণ্টকশয়নে,—মহারাজ
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস অভিমানী। পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য,—হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে,—
তবু পুত্র দোষ দিস স্নেহ নাই বলে?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা।
অন্ধ আমি।—অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয়-তিমিরে
চলিয়াছি,—বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ,—নিশাচর গৃধ্র সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার,—পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ,—আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর,—তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে

ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী,—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের।—সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে,—আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে ক'রো না সংশয়,
আলিঙ্গন ক'রো না শিথিল,—ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।—ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে,—
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর,
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ।

চরের প্রবেশ

চর। মহারাজ, অগ্নিহোত্র, দেব-উপাসনা,
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে, পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া;—পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব; সন্ধ্যা হল তবু
ভৈরব-মন্দিরমাঝে নাহি বাজে প্রভু
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে;—

শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বারপানে
দীন বেশে সজল নয়নে।

দুর্যোধন। নাহি জানে,
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। (দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা,—নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন,—নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।)

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্যোধন। পিত আমি চলিলাম তবে। [প্রস্থান

ধৃতরাষ্ট্র। করো পলায়ন। হায় কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত। মোরে তোর নাহি লাজ।

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ।

ধৃতরাষ্ট্র। কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা।

গান্ধারী। ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র। কারে হে মহিষী ?

গান্ধারী। পাপের সংঘর্ষে যার

পড়িছে ভীষণ শান ধর্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে সে জন? আছে কোন্‌খানে?
শুধু কহ নাম তার।

গান্ধারী। পুত্র দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাহারে করিব ত্যাগ?

গান্ধারী। এই নিবেদন
তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী
রাজমাতা।

গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব? কুরুকুল-পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ। ত্যাগ করো ত্যাগ করো তারে—
কৌরব-কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে,—আমি পিতা—

গান্ধারী। মাতা আমি নহি? গর্ভভার-জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মতো করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে,—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী
প্রাণ হতে প্রাণ?—তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

ধৃতরাষ্ট্র। কী রাখিব তারে ত্যাগ করি ?

গান্ধারী। ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম ?

গান্ধারী। দুঃখ নব নব।

পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?

ধৃতরাষ্ট্র। হায় প্রিয়ে,

ধর্মবশে এক বার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শত বার কর্ণে মোর—"কী করিলি ওরে।
এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি। অপমান-ক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে—শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।
সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,—
করহ দলন। ক'রো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত ; যদি ডেকে আন তারে,
বরণ করিয়া তবে লহ একেবারে।"
এই মতো পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম। পুনরায়

ফিরাম্থ পাণ্ডবগণে,—দ্যূতছলনায়
বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ। কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের।

গান্ধারী। (ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,—
ধর্মেই ধর্মের শেষ।) মূঢ় নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,
জান তো সকলি। পাণ্ডবেরা যাবে বনে
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে,—
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি,—পুত্রে তব ত্যজ এইবার,—
(নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না,—ন্যায়ধর্মে ক'রো না বিমুখ
পৌরব-প্রাসাদ হতে,—দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে ধর্মরাজ লহ তুলি লহ
দেহ তুলি মোর শিরে।)

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারানী
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী।

গান্ধারী। অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র ;—স্নেহমোহে ভুলি
সে-ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে,
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্মবিধি বিধাতার,—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য,—অয়ি মনস্বিনী,

তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী। তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বাম হস্ত ;—ধর্মরক্ষা-কাজ
তোমা'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে
যদি কোনো প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কী তাহার করিবে বিধান?

ধৃতরাষ্ট্র। নির্বাসন।

গান্ধারী। তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু। তুমি আছ, হে রাজন,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ,—ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার,—দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত,—পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে,—মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল
যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্ষার গরল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে,—পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ'পরে
কলুষ-পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ,—পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে-নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান? অকলুষ

পুরুবংশে পাপ যদি জন্ম লাভ করে
সেও সহে,—কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে,—হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদ-পাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে,—ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভামাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা,—ধর্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত।
তোমরা, হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি,—কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্র-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান
নিদ্রাগত।—মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান,—ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপ-দহনে জর্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী।

গান্ধারী। শতগুণ বেদনা কি, নাথ
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না,—
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক। শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা,—পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,—
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে,
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,—
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার
একমাত্র; উন্মত্ত তরঙ্গমাঝখানে
যে-পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,

এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে,—অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্মতির,—
সেই তো সান্ত্বনা মোর,—এখন তো আর
বিচারের কাল নাই—নাই প্রতিকার,
নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে। [প্রস্থান

গান্ধারী। হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র-ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—

হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধুলায় পড়িস লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন।—তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি, নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। (দাসীগণের প্রতি)
ইন্দুমুখী, পরভৃতে, লহ তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলংকার।

গান্ধারী। বৎসে, ধীরে, ধীরে।
পৌরব-ভবনে কোন্ মহোৎসব আজি?
কোথা যাও নব বস্ত্র-অলংকারে সাজি
বধূ মোর?

ভানুমতী। শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী। শত্রু যার আত্মীয়স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু। নব অলংকার
কোথা হতে, হে কল্যাণী?

ভানুমতী। জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্নমণি-অলংকার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচীমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে,—বিদ্ধ হত বুকে

কুরুকুলকামিনীর—সে-রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী। হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার,
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার।
এ কী ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ।
যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে? রত্ন-ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে,—চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডব-ঝংকার।

ভানুমতী। মাত মোরা ক্ষত্রনারী। দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়,—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমা সূর্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা মাত সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দিন-দুর্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি' উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী,
কেমনে বাঁচিতে হয়, শ্রীচরণ সেবি
সে-শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী। বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীর-রক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি—রত্ন-অলংকার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতা-কুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো।

ঝঞ্ঝাবাতে।) বৎসে, ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে। আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজন-দুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাত। হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ,—বেণী করি উন্মোচন
শান্ত মনে করো বৎসে দেবতা-অর্চন।
এ পাপ-সৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহংকারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে।
খুলে ফেলো অলংকার, নব রক্তাম্বর,
থামাও উৎসব-বাদ্য, রাজ-আড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে,
কালেরে প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে। [ভানুমতীর প্রস্থান

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী। (সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর। রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি দীন ছদ্মরূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব, সদা চুপে চুপে।
দুঃখ হতে তোমা তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ।) নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জলন্ত তেজ করুক সংযোগ—

বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত স্বর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের।—সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজ বিধি,—যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেব-নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।)

(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গনপূর্বক)

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী। এক বার
তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
(যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।)
যাও বৎসে, পতি সাথে অমলিন মুখ,
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভ সার্থকতা।
(রাজগৃহে আয়োজন দিবসযামিনী
সহস্র সুখের ; বনে তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা সকল আশ্রয়,
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা

উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী,—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।)

পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,—
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
ধরার নরক-সিংহদুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।
তুমি অমাত্য রাজসভাসদ
তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর।
আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র ?
হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই ?
ছেড়েছি ধরম, তা ব'লে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই।
নাহিক করম, লজ্জা শরম,
জানি নে জনমে সতীর প্রথা,

তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা।

সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন,
অদূরে সুনীল শৈলমালা,
কলগান করে পুণ্য তটিনী,
সে কি নগরীর নাট্যশালা।
মনে হল সেথা অন্তর-গ্লানি
বুকের বাহিরে বাহিরি' আসে।
ওগো বনভূমি মোরে ঢাকো তুমি
নবনির্মল শ্যামল বাসে।
অয়ি উজ্জ্বল উদার আকাশ
লজ্জিত জনে করুণা করে
তোমার সহজ অমলতাখানি
শতপাকে ঘেরি পরাও মোরে।

স্থান আমাদের রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের পীত আলোক জ্বালা,
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ-ঢালা।
রতননিকরে কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,
মদির-শীকর-সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে।
মোরা গাঁথা মালা প্রমোদ-রাতের,
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে
লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে।

তবু তবু ওগো কুসুম-ভগিনী
 এবার বুঝিতে পেরেছি মনে
ছিল ঢাকা সেই বনের গন্ধ
 অগোচরে কোন্ প্রাণের কোণে।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
 আঁকিল প্রথম সোনার লেখা;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
 নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
 পূর্ব অচলে উষার মতো;
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা
 জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত।
মনে হল মোর নব-জনমের
 উদয়শৈল উজল করি,
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
 উদিল নবীন জীবন ভরি।
তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
 পঞ্চম স্বরে ধরিল গান,
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
 মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
 মুনি-বালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
 নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
 নদী জলতলে বাজিল শিলা,
ভগবান ভানু রক্ত-নয়নে
 হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশু সম
চাহিলা কুমার কৌতূহলে,—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তি-কিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে,—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি,
বন্দনা-গান রচিলা কুমার
জোড় করি কর-কমল দুটি।
করুণ কিশোর কোকিল-কণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তিমগন
পাতায় পাতায় শিহরি উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
নির্জন গিরিশিখর'পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীল নির্বাক সিন্ধুতলে
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশির-শীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।

ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি,
কহিনু, "হে মোর প্রভু তপোধন
চরণে আগত অধম দাসী।"
তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানু পাতি বসি যুগল চরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো,—
তাপস কুমার চাহিলা, আমার
মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।
তোমার পরশ অমৃতসরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

হেসো না মন্ত্রী হেসো না হেসো না,
ব্যথায় বিঁধো না ছুরির ধার,
ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে
অবমান তুমি ক'রো না আর।
মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনি নি এমন সত্যবাণী।
সত্য কথা এ, কহিনু আবার,
স্পর্ধা আমার কভু এ নহে,—
ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
ঋষির রসনা মিছে না কহে।
বৃদ্ধ, বিষয়-বিষ-জর্জর,
হেরিছ বিশ্ব দ্বিধার ভাবে,
নগরীর ধূলি লেগেছে নয়নে,
আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে?
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা,
অমৃতসরস আমার পরশ,
আমার নয়নে দিব্য বিভা।
অমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা।
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।
দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ,—

স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসে নি কেহ।
সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে,—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
"আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন,
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
বহুদিন মোর প্রমোদ-নিশীথে
যত শত দীপ জ্বলিয়াছিল—
দূর হতে দূরে,—এক নিশ্বাসে
কে যেন সকলি নিবায়ে দিল।
প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি দিল কর আমার কেশে
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।
মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি,
বৃদ্ধ, তোমার হাসিরে ধিক।

চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্মে ফিরায়ে নিক।
তোমার পামরী পাপিনীর দল
তারাও অমনি হাসিল হাসি,—
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারিদিক হতে ঘেরিল আসি।
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।
হে মোর অমল কিশোর তাপস,
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি।
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতাম টানি
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না নিয়ো না
হে মোর অনল, তপের নিধি,
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি।
ধিক রমণীরে ধিক শত বার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক।
রমণীজাতির ধিক্কার-গানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।
ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নালতিকাসমা
কহিনু তাপসে, "পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।

আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি।"
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।
কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে,
"আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি।"
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি।
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবন-তরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী,—
"আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা।
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করে নি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার,
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

মন্ত্রী, আবার সেই বাঁকা হাসি?
না হয় দেবতা আমাতে নাই—
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে তো তাই।
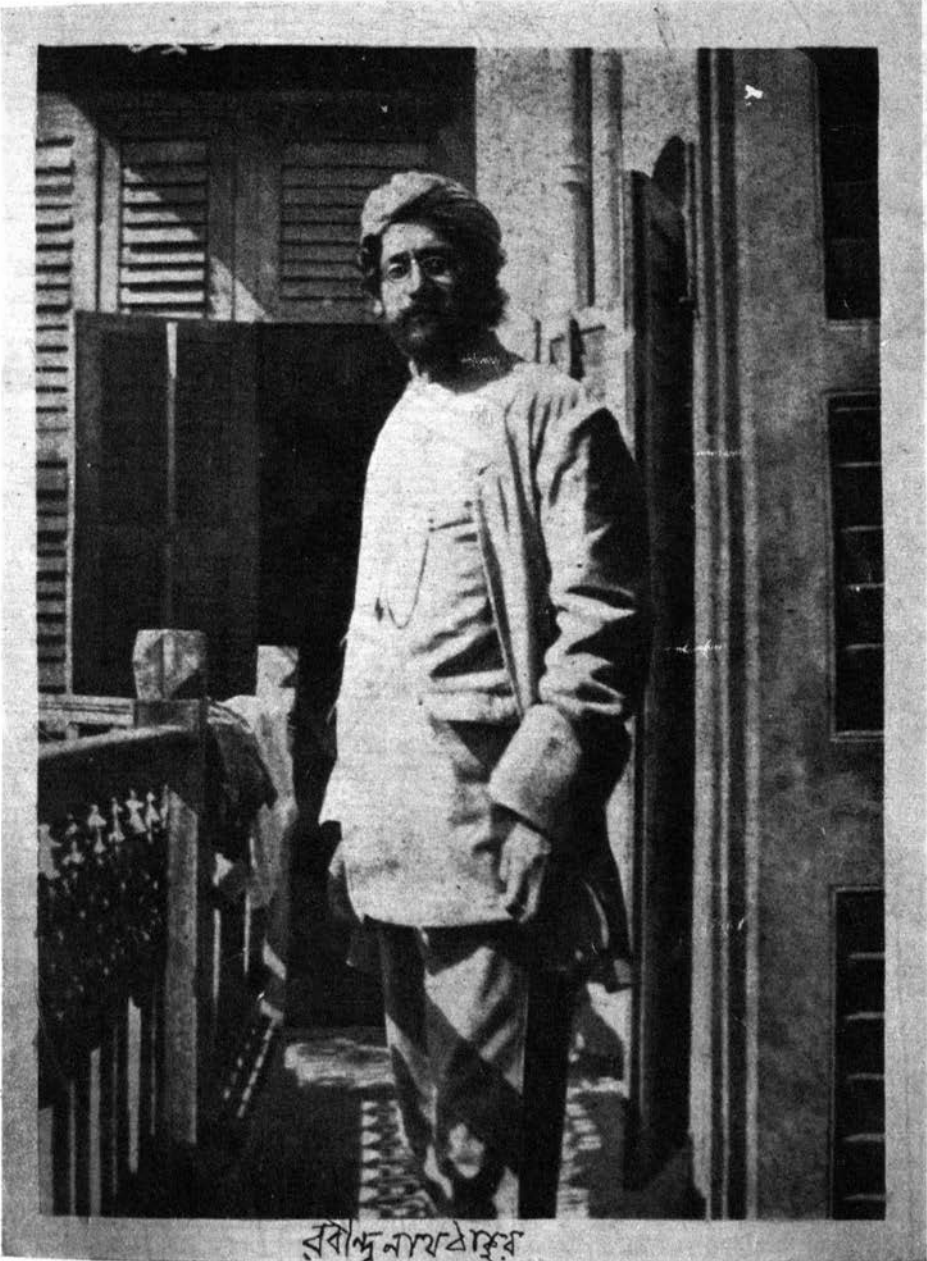
রবীন্দ্রনাথ
আনুমানিক ৩৫ বৎসর বয়সে

এক দিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন ?
পূজা যদি মোর হয়ে থাকে শেষ
হয়ে গেছে শেষ আমার খেলা।
দেবতার লীলা করি সমাপন
জলে ঝাঁপ দিবে মাটির ঢেলা।
হাসো হাসো তুমি হে রাজমন্ত্রী,
লয়ে আপনার অহংকার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা
ফিরে লও তব পুরস্কার।
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে।
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ করে,
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।

৯ কার্তিক, ১৩০৪

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায় ; সেই মতো বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে

অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত,
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তার উদ্দেশ,—
তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়। অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি'পরে।
নমস্কার করি কবি, শুধাইলা সঁপিয়া আসন,
"কী মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্ত্যে আগমন ?"
নারদ কহিলা হাসি, "করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এস,—ব'লো তারে, 'ওগো ভাগ্যবান,
এ মহা সংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান।
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা ?' "

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,

ভাষাশূন্য অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উঠায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জন-গান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে
সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধুপারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্‌ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গম পল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান; সেই মতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,

কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান নিশ্বাস ?
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে-আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি ;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ
যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্বপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা",
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"
নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্নহেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

সতী

মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওআর্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।

রণক্ষেত্র

অমাবাই ও বিনায়ক রাও

অমাবাই। পিতা।

বিনায়ক রাও। পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সী
স্বাতন্ত্র্যচারিণী। যবনের গৃহে পশি
ম্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলঙ্কিনী।
আমি তোর পিতা!

অমাবাই। অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষপঞ্জরে।
তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে। পিত, প্রণমি' চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব।

বিনায়ক রাও। কোথা যাবি অমা?
ধিক অশ্রুজল। ওরে দুর্ভাগিনী নারী
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল-হারা?

অমাবাই। পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও। থাক্ পুত্র। ফিরে আর চাস নে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষপানে। আজ রাতে
শোণিত-তর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ,—
যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু। বল্ তবে কোথা যাবি আজ?

অমাবাই। হে নির্দয়, আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ,
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্ত দ্বারে যাঁর
আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর।

বিনায়ক রাও। মৃত্যু? বৎসে। হা দুর্বৃত্তে। পরম পাবক
নির্মল উদার মৃত্যু—সকল পাতক
করে গ্রাস—সিন্ধু যথা সকল নদীর

সব পঙ্করাশি। সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি গতি। কিন্তু মৃত্যু আজ না সে,
নহে হেথা। চল্ তবে দূর তীর্থবাসে
সলজ্জ স্বজন আর সক্রোধ সমাজ
পরিহরি ; বিসর্জি কলঙ্ক ভয় লাজ
জন্মভূমি ধূলিতলে। সেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্মল বায়ু ;—স্বচ্ছ পুণ্যনীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, নির্জন কুটিরে
শিব শিব শিব নাম জপি শান্ত মনে,
সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্ন-পবনে
শুনিয়া আরতিধ্বনি,—এক দিন কবে
আয়ুঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে,—
পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা-উপহার
সাগরের পদে।

অমাবাই। পুত্র মোর!

বিনায়ক রাও। তার কথা
দূর কর্। অতীত-নির্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক তোরে। সদ্য শিশুসম
আর বার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি-মাতার গর্ভ হতে। নব দেশে,
নব তরঙ্গিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ-করে।

অমাবাই। জ্বলে পতিশোক,
বিশ্ব হেরি ছায়াসম ; তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে। ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও। পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়।

বিনায়ক রাও। কন্যা নহেক পিতার।
শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরে নাকো আর।
কিন্তু রে শুধাই তোরে কারে ক'স পতি
লজ্জাহীনা। কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্মতি
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে—বঞ্চিয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোত-বধূরে
আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে,—সে দুষ্ট দস্যুরে
পতি ক'স তুই!—সে-রাত্রি কি মনে পড়ে?
বিবাহ-সভায় সবে উৎসুক অন্তরে
বসে আছি,—শুভলগ্ন হল গতপ্রায়,—
জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়,
চায় পথপানে। দেখা দিল হেনকালে
মশালের রক্তরশ্মি নিশীথের ভালে,
শুনা গেল বাদ্যরব। হর্ষে উচ্ছ্বসিল
অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি। দুয়ারে পশিল
শতেক শিবিকা; কোথা জীবাজি কোথায়
শুধাতে না শুধাতেই, ঝটিকার প্রায়
অকস্মাৎ কোলাহলে হতবুদ্ধি করি
মুহূর্তের মাঝে তোরে বলে অপহরি
কে কোথা মিলাল। ক্ষণপরে নতশিরে
জীবাজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে—
শুনিনু কেমনে তারে বন্দী করি পথে
লয়ে তার দীপমালা, চড়ি তার রথে,
কাড়ি লয়ে পরি তার বর-পরিচ্ছদ
বিজাপুর যবনের রাজসভাসদ
দস্যুবৃত্তি করি গেল। সে দারুণ রাতে
হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি—দস্যুরক্তপাতে
লব এর প্রতিশোধ। বহুদিন পরে

হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথ-সমরে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি
লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি,—
দস্যু সে তো ধর্মনাশী।

অমাবাই। ধিক পিতা, ধিক।
বধেছ পতিরে মোর—আরো মর্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল। তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে ; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান।
মনে আছে দুই পত্র এক দিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু, "হানো তারে ছুরি,"
মাতা লিখেছিল, "পত্রে বিষ দিনু পুরি
করো তাহা পান।" যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত
তাহলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে-আদেশ? হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে। মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি ;—কোনো দিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প,—অবাধ্য শরীর
সংকোচে কুঞ্চিত হত ;—কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী। পূর্ণ ভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা ; হয়েছি যবনী

পবিত্র অন্তরে ; নহি পতিতা রমণী,—
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম।—এ কী, এ কী।
নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্তকেশে।

রমাবাইয়ের প্রবেশ

জননী আমার।
কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
হেন ভাবি নাই মনে। মাগো, মা জননী,
দেহ তব পদধূলি।

রমাবাই। ছুঁস নে যবনী
পাতকিনী।

অমাবাই। কোনো পাপ নাই মোর দেহে,—
নির্মল তোমারি মতো।

রমাবাই। যবনের গেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার ?

অমাবাই। পতি কাছে।

রমাবাই। পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!
জানিস কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি,
ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,
একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান,
ব্রাহ্মণ-কন্যার পতি! দেবতা সমান!

অমাবাই। উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যোমনে
পূজিয়াছি পতি বলি ; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে ? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

রমাবাই। সতী তুমি!

অমাবাই। আমি সতী।

রমাবাই। জানিস মরিতে অসংকোচে?

অমাবাই। জানি আমি।

রমাবাই। তবে জাল্ চিতানল। ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমরভূমে।

অমাবাই। জীবাজি?

রমাবাই। জীবাজি।
বাগ্‌দত্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে। বিবাহরাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে-রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন।

বিনায়ক রাও। যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।
দারুণ কর্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া
করেছি পালন,—যাও তুমি। অয়ি প্রিয়া,
বৃথা করিতেছ ক্ষোভ। যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তরছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে; সে যে ফলে ফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন
ধর্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। যাও বৎসে চলে।

যাও তব গৃহকর্মে ফিরে—যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে,—অভিনব
ধর্মক্ষেত্রমাঝে। এস প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে
সংসারের দুঃখ-সুখ চক্র-আবর্তন
ত্যাগ করি,—

রমাবাই। তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার গর্ভের লজ্জা। কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে
সতী-মঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

অমাবাই। ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,—
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য কবে—
কিন্তু মাত নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর-পদে।

রমাবাই। জ্বালো চিতা,
সৈন্যগণ। ঘেরো আসি বন্দীনীরে।

অমাবাই। পিতা।

বিনায়ক রাও। ভয় নাই, ভয় নাই। হায় বৎসে হায়
মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায়
পিতারে ডাকিতে হল। যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে
ধর্ম্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে এক দিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্যসূত্র হে বৎসে আমার।

অমাবাই। পিতা।

বিনায়ক রাও। আয় বৎসে। বৃথা আচার বিচার।
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়?

রমাবাই। কোথা যাস্। ফের্।
রে পাপিষ্ঠে, ঐ দেখ্ তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে,—তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না, তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে ধরি তোর মৃত্যুপূত হাতে
শূরস্বর্গমাঝে। শুন, যত আছ বীর,
তোমরা সকলে ভক্ত ভৃত্য জীবাজির,—
এই তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ,—চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়া সকলে
প্রভুকৃত্য শেষ করো।

সৈন্যগণ। ধন্য পুণ্যবতী।

অমাবাই। পিতা।

বিনায়ক রাও। ছাড়্ তোরা।

সৈন্যগণ। যিনি এ নারীর পতি
তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ।
বিনায়ক রাও। পতি এঁর স্বধর্মী যবন।
সেনাপতি। সৈন্যগণ,
বাঁধো বৃদ্ধ বিনায়কে।
অমাবাই। মাত, পাপীয়সী,
পিশাচিনী।
রমাবাই। মূঢ় তোরা কী করিস বসি।
বাজা বাদ্য, কর্‌ জয়ধ্বনি।
সৈন্যগণ। জয় জয়।
অমাবাই। নারকিণী।
সৈন্যগণ। জয় জয়।
রমাবাই। রটা বিশ্বময়
সতী অমা।
অমাবাই। জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ।
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু,—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।
রমাবাই। বল্‌ জয় পুণ্যময়ী,
বল্‌ জয় সতী।
সৈন্যগণ। জয় জয় পুণ্যবতী।
অমাবাই। পিতা, পিতা, পিতা মোর।
সৈন্যগণ। ধন্য ধন্য সতী।

২০ কার্তিক, ১৩০৪

নরকবাস

নেপথ্যে। কোথা যাও মহারাজ।

সোমক। কে ডাকে আমারে
দেবদূত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে
দেখিতে না পাই কিছু,—হেথা ক্ষণকাল
রাখো তব স্বর্গরথ।

নেপথ্যে। ওগো নরপাল
নেমে এস। নেমে এস হে স্বর্গ-পথিক।

সোমক। কে তুমি কোথায় আছ?

নেপথ্যে। আমি সে ঋত্বিক
মর্ত্যে তব ছিনু পুরোহিত।

সোমক। ভগবন,
নিখিলের অশ্রু যেন করেছে স্বজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকার লোক,—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল,—হেথা কেন তব আগমন?

প্রেতগণ। স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়,—স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষা-জর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

ঋত্বিক। মহারাজ, নামো
তব দেবরথ হতে।

প্রেতগণ। (ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যচ্ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির তৃণের গন্ধ, ফুলের পাতার,
শিশুর নারীর, হায়, বন্ধুর ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।)

সোমক। গুরুদেব, প্রভো,
এ নরকে কেন তব বাস?

ঋত্বিক। পুত্রে তব
যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি—সে পাপে এ গতি
মহারাজ।

প্রেতগণ। কহ সে কাহিনী, নরপতি,
পৃথিবীর কথা। পাতকের ইতিহাস
এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস।
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্ত্যরাগিণীর
সকল মূর্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন। কহ তব বিবরণ
মানবভাষায়।

সোমক। হে ছায়া-শরীরিগণ
সোমক আমার নাম, বিদেহ-ভূপতি।
বহু বর্ষ আরাধিয়া দেব দ্বিজ যতি
বহু যাগযজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু,—তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত।
সমস্ত সংসার-সিন্ধু-মথিত অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি

একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ'পরে—সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেই মতো রেখেছিনু তারে। সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম স্নেহপানে মোর
চাহিত সরোষ চক্ষে; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।
সভামাঝে
একদা অমাত্যসাথে ছিনু রাজকাজে
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে। ত্যজি সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্বকাজ।

ঋত্বিক। সে-মুহূর্তে প্রবেশিনু রাজসভামাঝ
আশিস করিতে নৃপে ধান্যদূর্বাকরে
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে—কহ হে রাজন
কী মহা অনর্থপাত দুর্দৈব ঘটন
ঘটেছিল, যার লাগি ব্রাহ্মণেরে ঠেলি
অন্ধ অবজ্ঞার বশে,—রাজকর্ম ফেলি,
না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত
রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,

প্রধান অমাত্য সবে রাজ্যের বারতা
না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা
অতিথি সজ্জন গুণীজনে—অসময়ে
ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে
শিশুর ক্রন্দন শুনি ? ধিক মহারাজ,
লজ্জায় আনতশির ক্ষত্রিয়সমাজ
তব মুগ্ধ ব্যবহারে, শিশু-ভুজপাশে
বন্দী হয়ে আছ পড়ি দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে,—নীরব সংকোচে
বন্ধুগণ সংগোপনে অশ্রুজল মোছে।

সোমক। ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি
অবাক হইল সভা।—পাত্রমিত্র গুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে
আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে
ভীত কৌতূহলে। রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত;—মুহূর্তের পরে
লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষসর্পশিরে। করি প্রণিপাত
গুরুপদে, কহিলাম বিনম্র বিনয়ে—
ভগবন, শান্তি নাই এক পুত্র লয়ে,
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল। মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি—ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
সাক্ষী থাকো মন্ত্রী সবে, হে রাজন্যগণ
রাজার কর্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
খর্ব করিব না আর ক্ষত্রিয়-গৌরব।

ঋত্বিক। কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব।
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি—এক-পুত্র-শাপ
দূর করিবারে চাও—পন্থা আছে তারো,—
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পার কি না পার

ভয় করি। শুনিয়া সগর্বে মহারাজ
কহিলেন—নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয়-তনয়—
কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয়।
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি—হে রাজন
শুন তবে। আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী—
কহিনু নিশ্চয়।—শুনি নীরব নৃপতি
রহিলেন নতশিরে। সভাস্থ সকলে
উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে।
কর্ণে হস্ত রুধি কহে যত বিপ্রগণ
ধিক পাপ এ প্রস্তাব।—নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে—তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।
তখন নারীর আর্ত বিলাপে চৌদিক
কাঁদি উঠে,—প্রজাগণ করে ধিক ধিক,
বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিলা অটল।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি। যজন-সময়ে
কেহ নাই,—কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি। রাজভৃত্য সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রিগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল,
অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল।
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী,
হৃদয়-বন্ধন সব মিথ্যা বলে মানি,—
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন

রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর উৎকণ্ঠাভরে। শিশু মোরে হেরি
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি ;—
জানাইল অর্ধস্ফুট কাকলি আকুলি—
মাতৃব্যূহ ভেদ করে নিয়ে যাও মোরে।
বহুক্ষণ বন্দী থাকি খেলাবার তরে
ব্যগ্র তার শিশু-হিয়া। কহিলাম হাসি—
মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি,
আয় মোর সাথে। এত বলি বল করি
মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি
সহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি দেবীগণ
পথ রুধি আর্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে। বহ্নি উঠে জ্বলি—
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণ-পুত্তলি।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু। অন্তঃপুর হতে
শতকণ্ঠে উঠে আর্তস্বর। রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া। কহিলাম—হে রাজন
আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে।

সোমক। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
কহিয়ো না আর।

প্রেতগণ। থামো থামো ধিক ধিক।
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক,
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি। খুঁজে যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।

দেবদূত। মহারাজ, এ নরকে ক্ষণকাল যাপি

নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা ?
উঠ স্বর্গরথে—থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার।

সোমক। রথ যাও লয়ে
দেবদূত। নাহি যাব বৈকুণ্ঠ-আলয়ে।
তব সাথে মোর গতি নরকমাঝারে
হে ব্রাহ্মণ। মত্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। (বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজমাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ,—এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।)
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনী-নির্মল,
করুণকোমলকান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী
অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি
ধরিলি দু-হাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে।
তার পরে কী ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ। হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ সন্তাপ। আমিও কি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান? দগ্ধ হব আমি
নরক-অনলমাঝে নিত্য দিনযামী,

তবু বৎস, তোর সেই নিমেষের ব্যথা,
আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃমুখপানে চেয়ে,—পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস
তার নাহি হবে পরিশোধ।

ধর্মের প্রবেশ

ধর্ম। মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা তরে আজ,
চলো ত্বরা করি।

সোমক। সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্মরাজ। বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে।

ধর্ম। করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

ঋত্বিক। যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ। সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহ রহ
মহারাজ, রহ হেথা।

সোমক। রব তব সহ
হে দুর্ভাগা। তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যজন

বিরাট নরক-হুতাশনে। ভগবন,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

ধর্ম। মহান গৌরবে হেথা রহ মহীপতি।
ভালের তিলক হ'ক দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হ'ক তব স্বর্গ-সিংহাসন।

প্রেতগণ। জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী।
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।
বসো আসি দীর্ঘ যুগ মহাশত্রুসনে
প্রিয়তম মিত্রসম এক দুঃখাসনে।
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি
নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি।

৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৪

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

প্রথম দৃশ্য

ক্ষীরো। ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম
গরিবের পড়ে মাথার ঘর্ম।
তুমি রানী, আছে টাকা শত শত,
খেলাছলে কর দান ধ্যান ব্রত;
তোমার তো শুধু হুকুম মাত্র;
খাটুনি আমারি দিবসরাত্র।
তবুও তোমারি সুযশ, পুণ্য,
আমার কপালে সকলি শূন্য।

নেপথ্যে। ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো।

ক্ষীরো। কেন ডাকাডাকি,

নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দেব না কি ?

রানী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। হল কী। তুই যে আছিস রেগেই।

ক্ষীরো। কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।

কতই বা সয় রক্তমাংসে,

কত কাজ করে একটা মানুষে।

দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট।

কল্যাণী। কেন, এত তোর কিসের কষ্ট ?

ক্ষীরো। যেথা যত আছে রামী ও বামী

সকলেরি যেন গোলাম আমি।

হ'ক ব্রাহ্মণ, হ'ক শুদ্দুর,

সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।

ঘরেতে কারো তো চড়ে না অন্ন,

তোমারি ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন।

হাড় বের হল বাসন মেজে

সৃষ্টির পান তামাক সেজে।

একা একা এত খেটে যে মরি

মায়া দয়া নেই ?

কল্যাণী। সে-দোষ তোরি।

চাকর দাসী কি টিঁকিতে পারে

তোমার প্রখর মুখের ধারে ?

লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের

লোক গেলে শেষে আর্তনাদের

ধুম পড়ে যাবে,—এর কি পথ্যি

আছে কোনোরূপ ?

ক্ষীরো। সে-কথা সত্যি।

সয় না আমার,—তাড়াই সাধে ?

অন্যায় দেখে পরান কাঁদে।

কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে,
টাকাকড়ি সব দু-হাতে লোটে।
আমি না তাদের তাড়াই যদি
তোমারে তাড়াত আমারে বধি।

কল্যাণী। ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু,
সবাই ডাকাত, তুমিই সাধু!

ক্ষীরো। আমি সাধু! মাগো, এমন মিথ্যে
মুখেও আনি নে, ভাবি নে চিত্তে।
নিই থুই খাই দু-হাত ভরি,
দু-বেলা তোমায় আশিস করি;
কিন্তু তবু সে দু-হাত 'পরে
দু-মুঠোর বেশি কতই ধরে।
ঘরে যত আন মানুষজনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে।
হাত যে স্বজন করেছে বিধি,
নেবার জন্মে, জান তো দিদি।
পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে
কিছু আপনার রাখো তো ঢেকে,
তার পরে বেশি রহিলে বাকি
চাকর বাকর আনিয়ো ডাকি।

কল্যাণী। একা বটে তুমি! তোমার সাথি
ভাইপো, ভাইঝি, নাতনী নাতি,
হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের,
ছুটো করে হাত নেই কি তাঁদের?
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায় ফের রাগও ধরে।

ক্ষীরো। বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত
স্বভাব আমার শুধরিয়ে যেত।

কল্যাণী। ম'লেও যাবে না স্বভাবখানি
নিশ্চয় জেনো।

ক্ষীরো। সে-কথা মানি।
তাই তো ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস করে।
ওই যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে।
কারো বা স্বামীর জোটে না খাদ্য,
কারো বা বেটার মামীর শ্রাদ্ধ।
মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে,
নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়া দানে।
নিতে চায় নিক, কত যে নিচ্ছে,
চোখে ধুলো দেবে, সেটা কি ইচ্ছে?

কল্যাণী। কেন তুই মিছে মরিস বকে?
ধুলো দেয়, ধুলো লাগে না চোখে।
বুঝি আমি সব,—এটাও জানি
তারা যে গরিব, আমি যে রানী।
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব,
আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে,
আমার সুখ সে আমার প্রাণে।

ক্ষীরো। নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু,
দিয়ে থুয়ে সুখ হইত তবু।
সামনে প্রণাম পদারবিন্দে,
আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে।

কল্যাণী। সামনে যা পাই তাই যথেষ্ট,
আড়ালে কী ঘটে জানেন কেষ্ট।
সে যাই হ'ক গে, শুধাই তোরে
কাল বৈকালে বল্ তো মোরে
অতিথি-সেবায় অনেকগুলি
কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি,—
কেন বা ছিল না রসকরা।

ক্ষীরো। কেন কর মিছে মসকরা,
দিদিঠাকরুন। আপন হাতে
গুনে দিয়েছিনু সবার পাতে
দুটো দুটো করে।

কল্যাণী। আপন চোখে
দেখেছি পায় নি সকল লোকে,
খালি পাত—

ক্ষীরো। ওমা তাই তো বলি,—
কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি
যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে।
ভোলা ময়রার শয়তানি এ।

কল্যাণী। এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ,
আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য।

ক্ষীরো। গয়লা তো নন যুধিষ্ঠির।
যত বিষ তব কুদৃষ্টির
পড়েছে আমারি পোড়া অদৃষ্টে,
যত ঝাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে,
হায় হায়—

কল্যাণী। ঢের হয়েছে, আর না,
রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না।

ক্ষীরো। সত্যি কান্না কাঁদেন যাঁরা
ওই আসছেন ঝেঁটিয়ে পাড়া।

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

প্রতিবেশিনীগণ। জয় জয় রানী হও চিরজয়ী।
কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী

ক্ষীরো। ওগো রানীদিদি
পাতে যদি [illegible]
এত গল[illegible]
উঠিত[illegible]

যদি দু-চারটে চন্দ্রপুলি
দৈবগতিকে দিতে না ভুলি
তাহলে কি আর রক্ষে থাকত,
হজম করতে বাপকে ডাকত।

কল্যাণী। আজ তো খাবার হয় নি কষ্ট?

প্রথমা। কত পাতে পড়ে হয়েছে নষ্ট,—
লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ত্রুটি?

কল্যাণী। হাঁ গো, কে তোমার সঙ্গে উটি?
আগে তো দেখি নি।

দ্বিতীয়া। আমার মধু,
তারি উটি হয় নতুন বধূ
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মা জননী।

ক্ষীরো। সেটা বুঝেছি ধরনে।

দ্বিতীয়া। (বধূর প্রতি) প্রণাম করিবে এস এদিকে
এই যে তোমার রানীদিদিকে।

কল্যাণী। এস কাছে এস, লজ্জা কাদের?
(আংটি পরাইয়া) আহা মুখখানি দিব্যি ছাঁদের
চেয়ে দেখ্ ক্ষীরি।

ক্ষীরো। মুখটি তো বেশ,
তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ।

দ্বিতীয়া। শুধু রূপ নিয়ে কী হবে অঙ্গে।
সোনাদানা কিছু আনে নি সঙ্গে।

ক্ষীরো। যাহা এনেছিল সবি সিন্দুকে
যতনে, বলে নিন্দুকে।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান

প্রথমা। দেখলি মাগীর কাণ্ড এ কী।
ক্ষীরো। কারে বাদ দিয়ে কারে বা দেখি।
তৃতীয়া। তা বলে এতটা সহ্য হয় না।
ক্ষীরো। অন্যের বউ পরলে গয়না
অন্যের তাতে জলে যে অঙ্গ।
তৃতীয়া। মাসী জান তুমি কতই রঙ্গ,
এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে,
হাসতে হাসতে নাড়ী যায় ফেটে।
প্রথমা। কিন্তু যা বল, আমাদের মাতা
নাই তাঁর মতো এত বড়ো দাতা।
ক্ষীরো। অর্থাৎ কি না এত বড়ো হাবা
জন্ম দেয় নি আর কারো বাবা।
তৃতীয়া। সে-কথা মিথ্যে নয় নিতান্ত।
দেখ্ না সেদিন কুশী ও খান্ত
কী ঠকান্‌টাই ঠকালে, মাগো!
আহা মাসী তুমি সাধে কি রাগ।
আমাদেরি গায়ে হয় অসহ্য।
চতুর্থী। বুড়ো মহারাজা যে ঐশ্বর্য
রেখে গেছে সে কি এমনি ভাবে
পাঁচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে।
প্রথমা। দেখলি তো ভাই কানা আন্দি
কত টাকা পেলে।
তৃতীয়া। বুড়ী ঠানদি
জুড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র
নিয়ে গেল কত শীতের বস্ত্র।
চতুর্থী। বুড়ী মাগী তার শীত কি এতই?
কাঁথা হলে চলে, নিয়ে গেল লুই।
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে,
এ যে বাড়াবাড়ি।
প্রথমা। সে-কথা যাগগে।

চতুর্থী। না না তাই বলি হও নাকো দাতা
তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা ?
যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল
যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল
কানা খোঁড়া নুলো যে আসে মরতে
বাচ বিচার কি হবে না করতে ?

তৃতীয়া। দেখ্ না ভাই সে গোপালের মাকে
দু-টাকা দিলেই খেয়ে পরে থাকে
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ
এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।

চতুর্থী। আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা
মেয়েমানষের এতগুলো টাকা।

তৃতীয়া। কত লোকে কত করে যে রটনা,—

প্রথমা। সেগুলো তো সব মিথ্যে ঘটনা।

চতুর্থী। সত্যি মিথ্যে দেবতা জানে
রটেছে তো কথা পাঁচের কানে
সেটা যে ভালো না।

প্রথমা। যা বলিস ভাই
এমন মানুষ ভূভারতে নাই।
ছোটো বড়ো বোধ নাইকো মনে,
মিষ্টি কথাটি সবার সনে।

ক্ষীরো। টাকা যদি পাই বাক্স ভরে,
আমার গলাও গলাবে তোরে।
বাপু বললেই মিলবে স্বর্গ,
বাছা বললেই বলবি ধর্ গো।
মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি,
কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।

চতুর্থী। তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি,
সবার সঙ্গে এত মেশামেশি।

বড়োলোক তুমি ভাগ্যিমন্ত,
সেই মতো চাই চাল চলন তো ?

তৃতীয়া। দেখলি সেদিন শশীর বাঁ গালে
আপনার হাতে ওষুধ লাগালে।

চতুর্থী। বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর
তারে কেন এত যত্ন আদর ?

তৃতীয়া। এত লোক আছে কেদারের মাকে
কেন বল দেখি দিনরাত ডাকে।
গয়লাপাড়ার কেষ্টদাসী
তারি সাথে কত গল্প হাসি,
যেন সে কতই বন্ধু পুরোনো।

চতুর্থী। ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো।

ক্ষীরো। এ সংসারের ওই তো প্রথা,
দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকো কথা।
ভাত তুলে দেন মোদের মুখে
নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়
নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয়।

চতুর্থী। ওই বউ নিয়ে ফিরে এল নেকী।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ

প্রথমা। কী পেলি লো বিধু দেখি দেখি দেখি।

দ্বিতীয়া। শুধু একজোড়া রতনচক্র।

তৃতীয়া। বিধি আজ তোরে বড়োই বক্র।
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে
ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে।

চতুর্থী। মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বুড়ী
পেয়েছিল হার তাছাড়া চুড়ি।

দ্বিতীয়া। আমি যে গরিব নই যথেষ্ট
গরিবিয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ।

অদৃষ্টে যার নেইকো গয়না
গরিব হয়ে সে গরিব হয় না।

চতুর্থী। বড়োমানষের বিচার তো নেই।
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই,
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।

প্রথমা। টাকাটা সিকেটা কুমড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভালো, কে দেয় তাই বা।

দ্বিতীয়া। অবিচারে দান দিলেন নাই বা।
মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নিচে
ভরি কত সোনা পেলেম মিছে।

ক্ষীরো। মা লক্ষ্মী যদি হতেন সদয়
দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়।

দ্বিতীয়া। আহা তাই হ'ক, লক্ষ্মীর বরে
তোর ঘরে যেন টাকা নাহি ধরে।

প্রথমা। ওলো থাম্ তোরা, রাখ্ বকুনি—
রানীর পায়ের শব্দ শুনি।

চতুর্থী। (উচ্চৈঃস্বরে) আহা জননীর অসীম দয়া।
ভগবতী যেন কমলালয়া।

দ্বিতীয়া। হেন নারী আর হয় নি সৃষ্টি,
সবা 'পরে তাঁর সমান দৃষ্টি।

তৃতীয়া। আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি
সার্থক হল অর্থরাশি।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। রাত হল তবু কিসের কমিটি ?

ক্ষীরো। সবাই তোমার যশের জমিটি
নিড়োতেছিলেন, চষতেছিলেন,
মই দিয়ে কষে ঘষতেছিলেন,
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে
বুনেছি ফসল আশ মিটিয়ে।

কল্যাণী। রাত হল আজ যাও সবে ঘরে,
এই কটি কথা রেখো মনে করে।
আশার অন্ত নাইকো বটে,
আর সকলেরি অন্ত ঘটে।
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হত, কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত, আমি তো তুচ্ছ।
নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো,
তবু এ-কথাটা ভেবে দেখো দিখি—
ভালো কথা বলা শক্ত বেশি কি? [প্রস্থান

চতুর্থী। কী বলছিলেম ছিল সেই খোঁজে।

ক্ষীরো। না গো না তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সামনে তোমরা যেটুকু বাড়ালে
সেটুকু কমিয়ে আনবে আড়ালে।
উপকার যেন মধুর পাত্র,
হজম করতে জলে যে গাত্র,
তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি
নিন্দে বান্দা কান্না কাটনি।
যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে,
জ্বালান তারেই গোপন হুলে।
দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি
কলিকাল তবে হবে তো সত্যি।

চতুর্থী। মিথ্যে না ভাই। সামলে চলিস।
যাই মুখে আসে তাই যে বলিস।
পালন যে করে সে হল মা বাপ,
তাহারি নিন্দে, সে যে মহাপাপ।
এমন লক্ষ্মী এমন সতী
কোথা আছে হেন পুণ্যবতী।
যেমন ধনের কপাল মস্ত
তেমনি দানের দরাজ হস্ত,

যেমন রূপসী তেমনি সাধ্বী,
খুঁত ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি।
দিস নেকো দোষ তাঁহার নামে।

তৃতীয়া। তুমি থামলে যে অনেক থামে।

দ্বিতীয়া। আহা কোথা হতে এলেন গুরু।
হিতকথা আর ক'রো না শুরু।
হঠাৎ ধর্মকথার পাঠটা
তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা।

ক্ষীরো। ধর্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্,
গলা ছেড়ে আর বাজিয়ো না ঢাক।
পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে,
বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজো গোবিন্দে।

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশী।

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ

কাশী। কেন দিদি।

কিনি। কেন খুড়ী।

বিনি। কেন মাসী।

ক্ষীরো। ওরে খাবি আয়।

বিনি। কিছু নেই খিধে।

ক্ষীরো। খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে।

কিনি। রসকরা খেয়ে পেট বড়ো ভার।

ক্ষীরো। বেশি কিছু নয়, শুধু গোটা চার
ভোলা ময়রার চন্দ্রপুলি
দেখ্ দেখি ওই ঢাকনা খুলি ;—
তাই মুখে দিয়ে, দু-বাটিখানিক
দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মানিক।

কাশী। কত খাব দিদি সমস্ত দিন।

ক্ষীরো। খাবার তো নয় খিদের অধীন।

পেটের জ্বালায় কত লোক ছোটে
খাবার কি তার মুখে এসে জোটে ?
দুঃখী গরিব কাঙাল ফতুর
চাষাভুষো মুটে অনাথ আতুর
কারো তো খিদের অভাব হয় না,
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস যেটার যা দর,
খিদের চাইতে খাবার আদর।
হাঁ রে বিনি তোর চিরুনি রুপোর
দেখছি নে কেন খোঁপার উপর ?

বিনি। সেটা ওপাড়ার খেতুর মেয়ে
কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে।

ক্ষীরো। ওই রে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া।
তোমারো লেগেছে দাতার হাওয়া !

বিনি। আহা কিছু তার নেই যে মাসী।

ক্ষীরো। তোমারি কি এত টাকার রাশি।
গরিব লোকের দয়ামায়া রোগ
সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ।
না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে,
হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়িতে।
রানী যত দেয় ফুরোয় না, তাই
দান করে তার কোনো ক্ষতি নাই।
তুই যেটা দিলি রইল না তোর
এতেও মনটা হয় না কাতর ?
ওরে বোকা মেয়ে আমি আরো তোরে
আনিয়ে নিলেম এই মনে করে
কী করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে
মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে।
কে জানত তুই পেট না ভরতে
উল্‌টো বিদ্যা শিখবি মরতে ?

—দুধ যে রইল বাটির তলায়
ওইটুকু বুঝি গলে না গলায় ?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ
ক'রো দান ধ্যান আর উপবাস।
যতদিন আমি রয়েছি বর্তে
দেব না করতে আত্মহত্যে।
খাওয়া দাওয়া হল, এখন তবে
রাত হল ঢের শোও গে সবে।

[কিনি বিনি কাশীর প্রস্থান।

কল্যাণীর প্রবেশ

ওগো দিদি আমি বাঁচি নে তো আর।

কল্যাণী। সেটা বিশ্বাস হয় না আমার।
তবু কী হয়েছে শুনি ব্যাপারটা।

ক্ষীরো। মাইরি দিদি এ নয়কো ঠাট্টা।
দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার
বাঁচে কি না বাঁচে খুড়ীটি আমার,—
শক্ত অসুখ হয়েছে এবার
টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার।

কল্যাণী। এখনো বছর হয় নি গত,
খুড়ীর শ্রাদ্ধে নিলি যে কত।

ক্ষীরো। হাঁ হাঁ বটে বটে মরেছে বেটী,
খুড়ী গেছে তবু আছে তো জ্যেঠী।
আহা রানীদিদি ধন্য তোরে
এত রেখেছিস স্মরণ করে।
এমন বুদ্ধি আর কি আছে।
এড়ায় না কিছু তোমার কাছে।
ফাঁকি দিয়ে খুড়ী বাঁচবে আবার
সাধ্য কি আছে সে তাঁর বাবার ?
কিন্তু কখনো আমার সে জ্যেঠী
মরে নি পূর্বে মনে রেখো সেটি।

কল্যাণী। মরেও নি বটে জন্মেও নি কভু।

ক্ষীরো। এমন বুদ্ধি দিদি তোর, তবু
সে-বুদ্ধিখানি কেবলি খেলায়
অনুগত এই আমারি বেলায় ?

কল্যাণী। চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা !
না বললে নয় মিথ্যে কথাটা ?
ধরা পড় তবু হও না জব্দ ?

ক্ষীরো। "দাও দাও" ও তো একটা শব্দ,
ওটা কি নিত্যি শোনায় মিষ্টি ?
মাঝে মাঝে তাই নতুন সৃষ্টি
করতেই হয় খুড়ী-জ্যেঠীমার।
জান তো সকলি তবে কেন আর
লজ্জা দেওয়া ?

কল্যাণী। অমনি চেয়ে কি
পাস নি কখনো তাই বল্ দেখি ?

ক্ষীরো। মরা পাখিরেও শিকার ক'রে
তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে।
সহজেই পাই তবু দিয়ে ফাঁকি
স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি।
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে।
সত্যি বলছি মিথ্যে কথায়
তোমারো কাছেতে ফল পাওয়া যায়।

কল্যাণী। এবার পাবে না।

ক্ষীরো। আচ্ছা বেশ তো
সেজন্যে আমি নইকো ব্যস্ত।
আজ না হয় তো কাল তো হবে,
ততখন মোর সবুর সবে।
গা ছুঁয়ে কিন্তু বলছি তোমার
খুড়ীটার কথা তুলব না আর। [কল্যাণীর হাসিয়া প্রস্থান

হরি বলো মন। পরের কাছে
আদায় করার সুখও আছে,
দুঃখও ঢের। হে মা লক্ষ্মীটি
তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি
এত ভালোবাসে এ-বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া
ভুলে কোনোদিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে
মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর,
জলপান দিই আশীটা ইঁদুর,
খেয়ে দেয়ে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারি দ্বারে ;
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে
ওড়বার পথ বন্ধ হবে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

কে আবার রাতে এসেছ জ্বালাতে,
দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে ?
আর তো পারি নে।

লক্ষ্মী। পালাব তবে কি ?
যেতে হবে দূরে।

ক্ষীরো। বসো বসো দেখি।
কী পরেছ ওটা মাথার ওপর,
দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর।
হাতে কী রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখতে পারি কি ? আচ্ছা, থাক্ সে।
এত হীরে সোনা কারো তো হয় না,—
ওগুলো তো নয় গিলটি গয়না ?
এগুলি তো সব সাঁচ্চা পাথর ?
গায়ে কী মেখেছ, কিসের আতর ?

ভূর ভূর করে পদ্মগন্ধ ;
মনে কত কথা হতেছে সন্ধ।
বসো বাছা, কেন এলে এত রাতে ?
আমারে তো কেউ আস নি ঠকাতে ?
যদি এসে থাক ক্ষীরিকে তাহলে
চিনতে পার নি সেটা রাখি বলে।
নাম কী তোমার বলো দেখি খাটি।
মাথা খাও ব'লো সত্য কথাটি।

লক্ষ্মী। একটা তো নয়, অনেক যে নাম।

ক্ষীরো। হাঁ হাঁ থাকে বটে স্বনাম বেনাম
ব্যবসা যাদের ছলনা করা।
কখনো কোথাও পড় নি ধরা ?

লক্ষ্মী। ধরা পড়ি বটে দুই দশ দিন
বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন।

ক্ষীরো। হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে,
অমন করলে হবে না স্থবিধে।
নামটি তোমার বলো অকপটে।

লক্ষ্মী। লক্ষ্মী।

ক্ষীরো। তেমনি চেহারাও বটে।
লক্ষ্মী তো আছে অনেকগুলি,
তুমি কোথাকার বলো তো খুলি।

লক্ষ্মী। সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক
নাই ত্রিভুবনে।

ক্ষীরো। ঠিক ঠিক ঠিক।
তাই বলো মাগো, তুমিই কি তিনি ?
আলাপ তো নেই চিনতে পারি নি।
চিনতেম যদি চরণজোড়া
কপাল হত কি এমন পোড়া ?
এসো, বসো, ঘর করো'সে আলো।
পেঁচা দাদা মোর আছে তো ভালো ?

এসেছ যখন, তখন যাত,
তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না তো।
জোগাড় করছি চরণসেবার ;
সহজ হস্তে পড় নি এবার।
সেয়ানা লোকেরে কর না মায়া
কেন যে জানি তা বিষ্ণুজায়া।
না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাকলে,
বোকারি বিপদ তুমি না রাখলে।

লক্ষ্মী। প্রতারণা করে পেটটি ভরাও,
ধর্মেরে তুমি কিছু না ডরাও ?

ক্ষীরো। বুদ্ধি দেখলে এগোও না গো,
তোর দয়া নেই কাজেই মাগো,
বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায়।

লক্ষ্মী। সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়,
বাঁকা বুদ্ধিরে ধিক জানিয়ো।

ক্ষীরো। ভালো তলোয়ার যেমন বাঁকা,
তেমনি বক্র বুদ্ধি পাকা।
ও জিনিস বেশি সরল হলে
নির্বুদ্ধি তো তারেই বলে।
ভালো মাগো, তুমি দয়া কর যদি,
বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি।

লক্ষ্মী। কল্যাণী তোর অমন প্রভু
তারেও দস্যু, ঠকাও তবু।

ক্ষীরো। অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর
যার লাগি চুরি সেই বলে চোর।
ঠকাতে হয় যে কপাল-দোষে
তোরে ভালোবাসি বলেই তো সে।
আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ো ;
আমারে ঠকিয়ে যেয়ো না তুমিও।

লক্ষ্মী। স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষি।

ক্ষীরো। তাহার কারণ আমি যে দুঃখী।
তুমি যদি করো রসের বৃষ্টি
স্বভাবটা হবে আপনি মিষ্টি।

লক্ষ্মী। তোরে যদি আমি করি আশ্রয়
যশ পাব কি না সন্দেহ হয়।

ক্ষীরো। যশ না পাও তো কিসের কড়ি?
তবে তো আমার গলায় দড়ি।
দশের মুখেতে দিলেই অন্ন
দশমুখে উঠে ধন্য ধন্য।

লক্ষ্মী। প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?

ক্ষীরো। এক বার তুমি করো পরীক্ষে।
পেট ভ'রে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কী।
দানের গরবে যিনি গরবিনী
তিনি হ'ন আমি, আমি হই তিনি,
দেখবে তখন তাঁহার চালটা,
আমারি বা কত উল্‌টো পাল্‌টা।
দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি,
রানী করো, পাব রানীর প্রকৃতি।
তাঁরো যদি হয় মোর অবস্থা
সুযশ হবে না এমন সস্তা।
তাঁর দয়াটুকু পাবে না অন্যে
ব্যয় হবে সেটা নিজেরি জন্যে।
কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ
অনেকখানিই হবেক ধ্বংস।
দিতে গেলে, কড়ি কভু না সরবে,
হাতের তেলোয় কামড়ে ধরবে।
ভিক্ষে করতে ধরতে দু-পায়
নিত্যি নতুন উঠবে উপায়।

লক্ষ্মী। তথাস্তু, রানী করে দিনু তোকে,
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।
কিন্তু সদাই থেকো সাবধান
আমার না যেন হয় অপমান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রানীবেশে ক্ষীরো ও তাহার পারিষদবর্গ

ক্ষীরো। বিনি।
বিনি। কেন মাসী।
ক্ষীরো। মাসী কী রে মেয়ে।
দেখি নি তো আমি বোকা তোর চেয়ে।
কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষি
তারাই মাসীরে বলে শুধু মাসী;
রানীর বোনঝি হয়েছ ভাগ্যে,
জান না আদব। মালতী।
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। রানীর বোনঝি রানীরে কী ডাকে
শিখিয়ে দে ওই বোকা মেয়েটাকে।
মালতী। ছি ছি শুধু মাসী বলে কি রানীকে?
রানীমাসী বলে রেখে দিয়ো শিখে।
ক্ষীরো। মনে থাকবে তো? কোথা গেল কাশী।
কাশী। কেন রানীদিদি।
ক্ষীরো। চার-চার দাসী
নেই যে সঙ্গে?
কাশী। এত লোক মিছে
কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে?
ক্ষীরো। মালতী।
মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে
শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে।
মালতী। তোমরা তো নও জেলেনী তাঁতিনী,
তোমরা হও যে রানীর নাতিনী।
যে নবাববাড়ি এনু আমি ত্যেজি
সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি
তাহারি একটা ছোটো বাচ্ছার
পিছনেতে ছিল দাসী চার-চার
তা ছাড়া সেপাই।
ক্ষীরো। শুনলি তো কাশী।
কাশী। শুনেছি।
ক্ষীরো। তাহলে ডাক্ তোর দাসী।
কিনি পোড়ামুখী।
কিনি। কেন রানীখুড়ী?
ক্ষীরো। হাই তুললেম দিলি নে যে তুড়ি?
মালতী।
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। শেখাও কায়দা।
মালতী। এত বলি তবু হয় না ফায়দা।
বেগমসাহেব যখন হাঁচেন
তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন।
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে।
ক্ষীরো। সোনার বাটায় পান দে তারিণী।
কোথা গেল মোর চামরধারিণী।
তারিণী। চলে গেছে ছুঁড়ি, সে বলে মাইনে
চেয়ে চেয়ে তবু কিছুতে পাই নে।
ক্ষীরো। ছোটোলোক বেটী হারামজাদী
রানীর ঘরে সে হয়েছে বাঁদি
তবু মনে তার নেই সন্তোষ

মাইনে পায় না ব'লে দেয় দোষ।
পিঁপড়ের পাখা কেবল মরতে।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। মাগীরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা,
না না, যাবে আরো দু-জন জেয়াদা।
কী বল মালতী।

মালতী। দস্তুর তাই।

ক্ষীরো। হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই।

তারিণী। ওপাড়ার মতি রানীমাতাজীর
চরণ দেখতে হয়েছে হাজির।

ক্ষীরো। মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। নবাবের ঘরে
কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে?

মালতী। কুর্নিস ক'রে ঢোকে মাথা নুয়ে,
পিছু হটে যায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ক্ষীরো। নিয়ে এস সাথে, যাও তো মালতী,
কুর্নিস করে আসে যেন মতি।

মতিকে লইয়া মালতীর পুনঃপ্রবেশ

মালতী। মাথা নিচু করো। মাটি ছোঁও হাতে,
লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে।
তিন পা এগোও, নিচু করো মাথা।

মতি। আর তো পারি নে, ঘাড়ে হল ব্যথা।

মালতী। তিন বার নাকে লাগাও হাতটা।

মতি। টন টন্ করে পিঠের বাতটা।

মালতী। তিন পা এগোও, তিন বার ফের্
ধুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।

মতি। ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ
এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খত।
জয় রানীমার, একাদশী আজি।

ক্ষীরো। রানীর জ্যোতিষী শুনিয়েছে পাঁজি।
কবে একাদশী, কবে কোন্ বার
লোক আছে মোর তিথি গোনবার।

মতি। টাকাটা সিকেটা যদি কিছু পাই
জয় জয় বলে বাড়ি চলে যাই।

ক্ষীরো। যদি না-ই পাও তবু যেতে হবে,
কুর্নিস করে চলে যাও তবে।

মতি। ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি
তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি।

ক্ষীরো। ঘরের জিনিস ঘরেরি ঘড়ায়
চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। এবার মাগীরে
কুর্নিস করে নিয়ে যাও ফিরে।

মতি। চললেম তবে।

মালতী। রসো, ফিরো নাকো,
তিন বার মাটি তুলে নাকে মাখো।
তিন পা কেবল হটে যাও পিছু,
প'ড়ো না উল্‌টে, মাথা করো নিচু।

মতি। হায়, কোথা এনু, ভরল না পেট,
বারে বারে শুধু মাথা হল হেঁট।
আহা কল্যাণী রানীর ঘরে
কর্ণ জুড়োয় মধুর স্বরে,—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই,—
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই।

ক্ষীরো। সে-ছাই পাবার ভরসা ক'রো না।

মালতী। সাবধানে হঠো, উল্‌টে প'ড়ো না। [মতির প্রস্থান

ক্ষীরো। বিনি।

বিনি। রানীমাসী।

ক্ষীরো। একগাছি চুড়ি
হাত থেকে তোর গেছে না কি চুরি।

বিনি। চুরি তো যায় নি।

ক্ষীরো। গিয়েছে হারিয়ে?

বিনি। হারায় নি।

ক্ষীরো। কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে?

বিনি। না গো রানীমাসী।

ক্ষীরো। এটা তো মানিস
পাখা নাই তার। একটা জিনিস
হয় চুরি যায়, নয় তো হারায়,
নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়;
তা না হলে থাকে, এ ছাড়া তাহার
কী যে হতে পারে জানি নে তো আর।

বিনি। দান করেছি সে।

ক্ষীরো। দিয়েছিস দানে?
ঠকিয়েছে কেউ, তারি হল মানে।
কে নিয়েছে বল্‌।

বিনি। মল্লিকা দাসী।
এমন গরিব নাই রানীমাসী।
ঘরে আছে তার সাত ছেলেমেয়ে
মাস পাঁচ-ছয় মাইনে না পেয়ে
খরচপত্র পাঠাতে পারে না
দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কেঁদে কেঁদে মরে, তাই চুড়িগাছি
লুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।
অনেক তো চুড়ি আছে মোর হাতে
একখানা গেলে কী হবে তাহাতে।

ক্ষীরো। বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যানা।
একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একেবারে ভারি নিশ্চয়।
কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,
যেটা দিয়ে ফেল সেটা তো রয় না,
এর চেয়ে কথা সহজ হয় না,
অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে ;
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে,
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে, আরো ঢের দিতে যে পারত।
অতএব বাছা হবি সাবধান,
বেশি আছে বলে করিস নে দান।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। বোকা মেয়েটি এ,
এরে ছুটো কথা দাও সমঝিয়ে।

মালতী। রানীর বোনঝি রানীর অংশ,
তফাতে থাকবে উচ্চ বংশ ;
দান করা-টরা যত হয় বেশি
গরিবের সাথে তত ঘেঁষাঘেঁষি।
পুরোনো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক,
গরিবের মতো নেই ছোটোলোক।

ক্ষীরো। মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। মল্লিকাটারে
আর তো রাখা না।

মালতী। তাড়াব তাহারে।
ছেলেমেয়েদের দয়ার চর্চা

বেড়ে গেলে, সাথে বাড়বে খরচা।

ক্ষীরো। তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা
বালাটা সুদ্ধ যেন তাড়িয়ো না।
বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি
দেখে আয় মোর ছয়-ছয় দাসী।

তারিণীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

তারিণী। মধুদত্তর পৌত্রের বিয়ে
ধুম করে তাই চলে পথ দিয়ে।

ক্ষীরো। রানীর বাড়ির সামনের পথে
বাজিয়ে যাচ্ছে কী নিয়মমতে।
বাঁশির বাজনা রানী কি সইবে।
মাথা ধ'রে যদি থাকত দৈবে?
যদি ঘুমোতেন, কাঁচা ঘুমে জেগে
অসুখ করত যদি রেগেমেগে?
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। নবাবের ঘরে
এমন কাণ্ড ঘটলে কী করে।

মালতী। যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে,
দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে
কেবলি বাজায় দুটো-দুটো বাঁশি;
তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি।

ক্ষীরো। ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার,
নিয়ে যাক দশ জুতোবরদার,
ফি লোকের পিঠে দশ ঘা চাবুক
সপাসপ বেগে সজোরে নাবুক।

মালতী। তবু যদি কারো চেতনা না হয়,
বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয়।

প্রথমা। ফাঁসি হল মাপ, বড়ো গেল বেঁচে,
জয় জয় বলে বাড়ি যাবে নেচে।
দ্বিতীয়া। প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ,
চাবুক ক-ঘা তো অনুগ্রহ।
তৃতীয়া। বলিস কী ভাই ফাঁড়া গেল কেটে,
আহা এত দয়া রানীমার পেটে।
ক্ষীরো। থাম্ তোরা, শুনে নিজ গুণগান
লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান।
বিনি।
বিনি। রানীমাসী।
ক্ষীরো। স্থির হয়ে রবি
ছটফট করা বড়ো বে-আদবি।
মালতী।
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। মেয়েরা এখনো
শেখে নি আমিরি দস্তুর কোনো।
মালতী। (বিনির প্রতি) রানীর ঘরের ছেলেমেয়েদের
ছটফট করা ভারি নিন্দের।
ইতর লোকেরি ছেলেমেয়েগুলো
হেসে খুসে ছুটে করে খেলাধুলো।
রাজারানীদের পুত্রকন্যে
অধীর হয় না কিছুরি জন্যে।
হাত-পা সামলে খাড়া হয়ে থাকো
রানীর সামনে ন'ড়ো চ'ড়ো নাকো।
ক্ষীরো। ফের গোলমাল করছে কাহারা।
দরজায় মোর নাই কী পাহারা।
তারিণী। প্রজারা এসেছে নালিশ করতে।
ক্ষীরো। আর কি জায়গা ছিল না মরতে।
মালতী। প্রজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী
ছোটোলোকদের এত কি ভাগ্যি।

প্রথমা। তাই যদি হবে তবে অগণ্য
নোকর চাকর কিসের জন্য।

দ্বিতীয়া। নিজের রাজ্যে রাখতে দৃষ্টি
রাজারানীদের হয় নি সৃষ্টি।

তারিণী। প্রজারা বলছে কর্মচারী
পীড়ন তাদের করছে ভারি।
নাই দয়া মায়া নাইক ধর্ম,
বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম।
বলে তারা, হায় কী করেছি পাপ,
এত ছোটো মোরা, এত বড়ো চাপ।

ক্ষীরো। সরষেও ছোটো, তবু সে ভোগায়,
চাপ না পেলে কি তৈল জোগায়?
টাকা জিনিসটা নয় পাকা ফল,
টুপ করে খ'সে ভরে না আঁচল;
ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে ঠেঙার বাড়িতে
তবে ও-জিনিস হয় যে পাড়িতে।

তারিণী। সেজন্যে না মা,—তোমার খাজনা
বঞ্চনা করা তাদের কাজ না।
তারা বলে যত আমলা তোমার
মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁয়ার।
লুটপাট করে মারছে প্রজা,
মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।

ক্ষীরো। রানী বটি, তবু নইকো বোকা,
পারবে না দিতে মিথ্যে ধোঁকা;
করবেই তারা দস্যুবৃত্তি,
মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।
প্রজাদের ঘরে ডাকাতি করে
তা বলে করবে রানীরো ঘরে?

তারিণী। তারা বলে রানী কল্যাণী যে
নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।

নালিশ শোনেন নিজের কানেই,
প্রজাদের 'পরে জুলুমটা নেই।

ক্ষীরো। ছোটোমুখে বলে বড়ো কথাগুলা,
আমার সঙ্গে অন্যের তুলা?
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। কী কর্তব্য?

মালতী। জরিমানা দিক যত অসভ্য
এক-শ এক-শ।

ক্ষীরো। গরিব ওরা যে,
তাই একেবারে এক-শর মাঝে
নব্বই টাকা করে দিনু মাপ।

প্রথমা। আহা গরিবের তুমিই মা বাপ।

দ্বিতীয়া। কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে,
নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে।

তৃতীয়া। নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে,
আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ট্যাঁকে।
হাজার টাকার ন-শ নব্বই
চোখের পলকে পেল সর্বই।

চতুর্থী। একদমে ভাই এত দিয়ে ফেলা,
অন্যে কে পারে, এ তো নয় খেলা।

ক্ষীরো। বলিস নে আর মুখের আগে,
নিজগুণ শুনে শরম লাগে।
বিনি।

বিনি। রানীমাসী।

ক্ষীরো। হঠাৎ কী হল।
ফোঁস ফোঁস করে কাঁদিস কেন লো।
দিনরাত আমি বকে বকে খুন,
শিখলি নে কিছু কায়দা কানুন?
মালতী।

মালতী আজ্ঞে।

ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে

শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে।

মালতী। রানীর বোনঝি জগতে মান্য,

বোঝ না এ-কথা অতি সামান্য।

সাধারণ যত ইতর লোকেই

সুখে হাসে, কাঁদে দুঃখশোকেই।

তোমাদেরো যদি তেমনি হবে,

বড়োলোক হয়ে হল কী তবে।

এক জন দাসীর প্রবেশ

দাসী। মাইনে না পেলে মিথ্যে চাকরি।

বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাকড়ি।

ধার করে খেয়ে পরের গোলামি

এমন কখনো শুনি নি তো আমি।

মাইনে চুকিয়ে দাও, তা না হলে

ছুটি দাও আমি ঘরে যাই চলে।

ক্ষীরো। মাইনে চুকোনো নয়কো মন্দ,

তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ।

বড়ো ঝঞ্ঝাট মাইনে বাঁটতে,

হিসেব কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।

ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর,

খুলতে হয় না খাতাপত্তর;

ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ,

নিমেষ ফেলতে কর্ম নিকেশ।

মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। সাথে যাও ওর

ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ো কাপড়চোপড়,

ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত
হিন্দুস্থানি দস্তরমতো।

মালতী। বুঝেছি রানীজি।

ক্ষীরো। আচ্ছা তাহলে
কুর্নিস করে যাক বেটী চলে।

[কুর্নিস করাইয়া দাসীকে বিদায়

দাসী। দুয়ারে রানীমা দাঁড়িয়ে আছে কে
বড়োলোকের ঝি মনে হয় দেখে।

ক্ষীরো। এসেছে কি হাতি কিংবা রথে ?

দাসী। মনে হল যেন হেঁটে এল পথে।

ক্ষীরো। কোথা তবে তার বড়োলোকত্ব ?

দাসী। রানীর মতন মুখটি সত্য।

ক্ষীরো। মুখে বড়োলোক লেখা নাহি থাকে
গাড়িঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। রানী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে
রানীজির সাথে দেখা করিবারে।

ক্ষীরো। হেঁটে এসেছেন ?

মালতী। শুনছি তাই তো।

ক্ষীরো। তাহলে হেথায় উপায় নাই তো।
সমান আসন কে তাহারে দেয়।
নিচু আসনটা সে-ও অন্যায়।
এ এক বিষম হল সমিস্তে,
মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে ?

প্রথমা। মাঝখানে রেখে রানীজির গদি
তাহার আসন দূরে রাখি যদি।

দ্বিতীয়া। ঘুরায়ে যদি এ আসনখানি
পিছন ফিরিয়া বসেন রানী।

তৃতীয়া। যদি বলা যায় ফিরে যাও আজ,
ভালো নেই আজ রানীর মেজাজ।

ক্ষীরো। মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। কী করি উপায়।

মালতী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখাশোনা, তবে সব গোল মেটে।

ক্ষীরো। এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে।
সেই ভালো। আগে দাঁড়া সার বাঁধি
আমার এক-শ পচিশটে বাঁদী।
ও হল না ঠিক,—পাঁচ পাঁচ করে
দাঁড়া ভাগে ভাগে,—তোরা আয় সরে,
না না এই দিকে,—না না কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাঁড়া সামনেই—
না না তাহলে যে মুখ যাবে ঢেকে
কোনাকুনি তোরা দাঁড়া দেখি বেঁকে।
আচ্ছা তাহলে ধরে হাতে হাতে
খাড়া থাক্ তোরা একটু তফাতে।
শশী, তুই সাজ ছত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। এইবার তারে
ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে। [মালতীর প্রস্থান
কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো,
খবরদার কেউ ন'ড়ো চ'ড়ো নাকো।
মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে
দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ

কল্যাণী। আছ তো কুশলে?

ক্ষীরো। আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি,
পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি,
এই ভাবে চলে জগৎ সুদ্ধ
নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ।

কল্যাণী। ভালো আছ বিনি ?

বিনি। ভালোই আছি মা,
ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা।

ক্ষীরো। বিনি করিস নে মিছে গোলযোগ,
ঘুচল না তোর কথা-কওয়া রোগ ?

কল্যাণী। রানী, যদি কিছু না কর মনে,
কথা আছে কিছু কব গোপনে।

ক্ষীরো। আর কোথা যাব, গোপন এই তো,
তুমি আমি ছাড়া কেহই নেই তো।
এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু,
রানীর সঙ্গে ফেরে পিছু পিছু।
হেথা হতে যদি করে দিই দূর
হবে না তো সেটা ঠিক দস্তুর।
কী বল মালতী।

মালতী। আজ্ঞে তাই তো।
দস্তুর মতো চলাই চাই তো।

ক্ষীরো। সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে।
খুঁজে দেখ্ দেখি।

দাসী। এই যে এখানে।

ক্ষীরো। ওটা নয়, সেই মুক্তো-বসানো
আরেকটা আছে সেইটেই আনো।

[অন্য বাটা আনয়ন

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়,
বাঁচি নে তো আর তোদের জ্বালায়।
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা,
না না নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াটা।

কল্যাণী। কথাটা আমার নিই তবে বলে।
পাঠান বাদশা অন্যায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে,—

ক্ষীরো। বল কী। তাহলে গেছে ফুলবেড়ে,
গিরিধরপুর, গোপালনগর,
কানাইগঞ্জ—

কল্যাণী। সব গেছে মোর।

ক্ষীরো। হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি?

কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।

ক্ষীরো। অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর।
গয়না যা ছিল হীরে মুক্তোর,
সেই বড়ো বড়ো নীলার কণ্ঠি
কানবালা-জোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই যে চুনীর পাঁচনলি হার
হীরে-দেওয়া সিঁথি লক্ষ টাকার,
সেগুলো নিয়েছে বুঝি লুটেপুটে?

কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জুটে।

ক্ষীরো। আহা তাই বলে, ধনজনমান
পদ্মপত্রে জলের সমান।
দামি তৈজস ছিল যা পুরোনো
চিহ্নও তার নেই বুঝি কোনো?
সেকালের সব জিনিসপত্র
আসাসোটাগুলো চামরছত্র
চাঁদোয়া কানাত, গেছে বুঝি সব?
শাস্ত্রে যে বলে ধনবৈভব
তড়িৎ সমান, মিথ্যে সে নয়।
এখন তাহলে কোথা থাকা হয়।
বাড়িটা তো আছে?

কল্যাণী। ফৌজের দল
প্রাসাদ আমার করেছে দখল।

ক্ষীরো। ওমা ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী,
কাল ছিল রানী আজ ভিখারিনী।
শাস্ত্রে তাই তো বলে সব মায়া,
ধনজন তালবৃক্ষের ছায়া।
কী বল মালতী।

মালতী। তাই তো বটেই
বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই।

কল্যাণী। কিছু দিন যদি হেথায় তোমার
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আবার আমার রাজ্যখানি;
অন্য উপায় নাহিক জানি।

ক্ষীরো। আহা, তুমি রবে আমার হেথায়
এ তো বেশ কথা, সুখেরি কথা এ।

প্রথমা। আহা কত দয়া।

দ্বিতীয়া। মায়ার শরীর।

তৃতীয়া। আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর।

চতুর্থী। হেথা ফেরে নাকো অধম পতিত,
আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ।

ক্ষীরো। কিন্তু একটা কথা আছে বোন।
বড়ো বটে মোর প্রাসাদ ভবন,
তেমনি যে ঢের লোকজন বেশি
কোনোমতে তারা আছে ঠেসাঠেসি।
এখানে তোমার জায়গা হবে না
সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।
তবে কিছু দিন যদি ঘর ছেড়ে
বাইরে কোথাও থাকি তাঁবু গেড়ে--

প্রথমা। ওমা সে কী কথা।

দ্বিতীয়া। তাহলে রানীমা
রবে না তোমার কষ্টের সীমা।

তৃতীয়া। যে-সে তাঁবু নয়, তবু সে তাঁবুই,

ঘর থাকতে কি ভিজবে বাবুই !

পঞ্চমী। দয়া করে কত নাববে নাবোতে,
রানী হয়ে কি না থাকবে তাঁবুতে ?

ষষ্ঠী। তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে
অধীনগণের বাজবে বক্ষে।

কল্যাণী। কাজ নেই রানী সে অস্থবিধায়,
আজকের তরে লইনু বিদায়।

ক্ষীরো। যাবে নিতান্ত ? কী করব ভাই।
ছুঁচ ফেলবার জায়গাটি নাই।
জিনিসপত্র লোক-লশ্‌করে
ঠাসা আছে ঘর—কারে ফস করে
বসতে বলি যে তার জোটি নেই।
ভালো কথা। শোনো, বলি গোপনেই,—
গয়নাপত্র কৌশলে রাতে
দু-দশটা যাহা পেরেছ সরাতে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই।

কল্যাণী। কিছুই আনি নি, শুধু হেরো এই
হাতে দুটি চুড়ি, পায়েতে নূপুর।

ক্ষীরো। আজ এস তবে বেজেছে দুপুর,—
শরীর ভালো না, তাইতে সকালে
মাথা ধরে যায় অধিক বকালে।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। জানে না কানাই
স্নানের সময় বাজবে সানাই ?

মালতী। বেটারে উচিত করব শাসন। [কল্যাণীর প্রস্থান

ক্ষীরো। তুলে রাখো মোর রত্ন আসন,—
আজকের মতো হল দরবার।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। নাম করবার
সুখ তো দেখলি।

মালতী। হেসে নাহি বাঁচি,—
ব্যাং থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি।

ক্ষীরো। আমি দেখ বাছা নাম-করাকরি,
যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,
জড়ো করে দল ইতর লোকের
জাঁকজমকের লোক-চমকের
যত রকমের ভণ্ডামি আছে
ঘেঁষি নে কখনো ভুলে তার কাছে।

প্রথমা। রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো,
তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।

দ্বিতীয়া। অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,
কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান।

তৃতীয়া। রানীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাবে
হেন লোক হেন ধুলো কোথা পাবে?

ক্ষীরো। থাম্ থাম্ তোরা রেখে দে বকুনি
লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি।
মালতী।

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। ওদের গয়না
ছিল যা এমন কাহারো হয় না।
দুখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে
দেখে আমি আর বাঁচি নে হেসে।
তবু মাথা যেন নুইতে চায় না,
ভিখ নেবে তবু কতই বায়না।
পথে বের হল পথের ভিখিরি
ভুলতে পারে না তবু রানীগিরি।
নত হয় লোক বিপদে ঠেকলে,
পিত্তি জ্বলে যে দেমাক দেখলে।

আবার কিসের শুনি কোলাহল।

মালতী। দুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল
আকাল পড়েছে, চালের বস্তা
মনের মতন হয় নি সস্তা,
তাইতে চেঁচিয়ে খাচ্ছে কানটা
বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা।

ক্ষীরো। রানী কল্যাণী আছেন দাতা।
মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা।
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে
ধরে নিয়ে যাক সকল কটাকে,
দাতা কল্যাণী রানীর ঘরে,
সেথায় আসুক ভিক্ষে করে।
সেখানে যা পাবে এখানে তাহার
আরো পাঁচ গুণ মিলবে আহার।

প্রথমা। হা হা হা। কী মজা হবেই না জানি।

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রানী।

তৃতীয়া। আমাদের রানী এতও হাসান।

চতুর্থী। দু-চোখ চক্ষু-জলেতে ভাসান।

দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঠাকরুন এক এসেছেন দ্বারে
হুকুম পেলেই তাড়াই তাঁহারে।

ক্ষীরো। না না ডেকে দে না। আজ কী জন্য
মন আছে মোর বড় প্রসন্ন।

ঠাকুরানীর প্রবেশ

ঠাকুরানী। বিপদে পড়েছি তাই এনু চলে।

ক্ষীরো। সে তো জানা কথা। বিপদে না প'লে
শুধু যে আমার চাঁদমুখখানি
দেখতে আস নি সেটা বেশ জানি।

ঠাকুরানী। চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—
ক্ষীরো। মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার।
ঠাকুরানী। দয়া করে যদি কিছু কর দান
এ-যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ।
ক্ষীরো। তোমার যা-কিছু নিয়েছে অন্যে
দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে।
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে
তার তরে দয়া আমায় কে করে।
ঠাকুরানী। ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে
দানসুখে তার সুখ আরো বাড়ে।
গ্রহণ যে করে তারি হেঁট মুখ,
দুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ।
তুমি সক্ষম আমি নিরুপায়
অনায়াসে পার ঠেলিবারে পায়;
ইচ্ছা না হয় না-ই ক'রো দান
অপমানিতেরে কেন অপমান।
চলিলাম তবে, বলো দয়া করে
বাসনা পুরিবে গেলে কার ঘরে।
ক্ষীরো। রানী কল্যাণী নাম শোন নাই?
দাতা বলে তাঁর বড়ো যে বড়াই।
এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এস ভরে,
পথ না জান তো মোর লোকজন
পৌঁছিয়ে দেবে রানীর ভবন।
ঠাকুরানী। তবে তথাস্তু। যাই তাঁরি কাছে।
তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে।
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে
অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে।
এই কথা কটি করিয়ো স্মরণ—
ধনে মানুষের বাড়ে নাকো মন।

আছে বহু ধনী আছে বহু মানী
সবাই হয় না রানী কল্যাণী !

ক্ষীরো। যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে
দস্তুরমতো কুর্নিস করে।
মালতী। মালতী। কোথায় তারিণী।
কোথা গেল মোর চামরধারিণী।
আমার এক-শ পঁচিশটে দাসী।
তোরা কোথা গেলি বিনি কিনি কাশী।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পাগল হলি কি। হয়েছে কী তোর।
এখনো যে রাত হয় নিকো ভোর
বল্ দেখি কী যে কাণ্ড কল্লি।
ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী ?

ক্ষীরো। ওমা তাই তো গা। কী জানি কেমন
সারারাত ধরে দেখেছি স্বপন।
বড়ো কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি,
স্বপনটা ভেঙে বাঁচলেম দিদি।
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব,
তুমি রানী আমি চিরদাসী তব।

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০৪

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা-সবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি,—কহ মোরে তুমি কে গো মাত।

কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব সাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্র-কিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে
শৈল-তুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহ মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা।

কুন্তী। ধৈর্য ধর্
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে।—কহি তোরে বীর
কুন্তী আমি।

কর্ণ। তুমি কুন্তী! অর্জুন-জননী!

কুন্তী। অর্জুন-জননী বটে। তাই মনে গনি
দ্বেষ করিয়ো না বৎস। আজো মনে পড়ে
অস্ত্র-পরীক্ষার দিন হস্তিনা নগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণকুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে; কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস-চুম্বন।
অর্জুন-জননী সে যে। যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,

কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার,"—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে,—সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে,
কে সে অভাগিনী। অর্জুন-জননী সে যে।
পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক সাথে। হেনকালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দ-বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেক-সিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃ-সম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল; সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণি
আশিসিল, আমি সেই অর্জুন-জননী।

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে। রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী। এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে,—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর, দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে।

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে—লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী,
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি,
মোরে কোথা দিবে স্থান।

কুন্তী। সর্ব উচ্চভাগে
তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র আগে
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণ। কোন্ অধিকার-মদে
প্রবেশ করিব সেথা। সাম্রাজ্য-সম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহ মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়,—
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী। পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি এক দিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে,
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান।

কর্ণ। শুনি স্বপ্নসম
হে দেবী তোমার বাণী। হেরো, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্‌বিদিকে, লুপ্ত চারিধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনা-প্রত্যুষে। পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাত অয়ি,

সত্য হ'ক স্বপ্ন হ'ক, এস স্নেহময়ী
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়,
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডব-জননীরূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে।
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক,—এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুন-জননী-কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া—চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়।

কুন্তী। তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়।

কর্ণ। যাব মাত চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু না করি ভাবনা।—
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে—নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কুন্তী। ওই পরপারে
যেথা জলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।
কর্ণ। (হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে। দেবি, কহ আরবার
আমি পুত্র তব।)
কুন্তী। পুত্র মোর।
কর্ণ। (কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে) কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে।
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে,—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে! মাত, নিরুত্তর?
লজ্জা তব, ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে—
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু।—থাক্ থাক্ তবে।
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
(বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে-কথার দিয়ো না উত্তর। কহ মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।)
কুন্তী। হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শত বজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম

শত খণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্চপুত্র বক্ষে করে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন,—তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার।—আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা।—যবে মুখে তোর
একটি ফুটে নি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা, বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল
পাপ দগ্ধ করে মোরে করুক নির্মল।

ক[illegible]। মাত, দেহ পদধূলি, দেহ পদধূলি,
লহ অশ্রু মোর।

কুন্তী। তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান,
দূর করি দিয়া বৎস সর্ব অপমান,
এস চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

[illegible]। মাত সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী। রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহ হে বৎস, উদ্ধার।
ঢুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর

সারথি হবেন রথে,—ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র—তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্ন-সিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরাল মাতৃস্নেহপাশ—
তাহারে দিতেছ মাত রাজ্যের আশ্বাস।
এক দিন যে-সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাত করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূত-জননীরে ছলি
আজ যদি রাজ-জননীরে মাতা বলি,—
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক মোরে।

কুন্তী। বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি। হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত হায়
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে এক দিন অন্ধকার পথে
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ।

কর্ণ। মাত, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে

চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সংগীত,—আশাহীন
কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে-পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে ক'রো না আহ্বান।
জয়ী হ'ক রাজা হ'ক পাণ্ডব-সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্গুন, ১৩০৬

উপন্যাস ও গল্প

নৌকাডুবি

সূচনা

পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ-কাজ করা অসম্ভব—এইজন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না। প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে সে হল প্রকাশকের তাগিদ। উৎসটা গভীর ভিতরে, গোমুখী তো উৎস নয়। প্রকাশকের ফরমাসকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে বসা আর প্রকাশকে পেয়ে বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্পলেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞান-জনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো এক জন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল

বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তাহলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ—তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না। কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে-অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে তাহলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এও অসংকোচে বলতে পারি নে কেননা রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

নৌকাডুবি

১

রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস হইবে, সে-সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন—স্কলারশিপও কখনো ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ি যাইবে।

অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহাধ্যায়ী। পাশের বাড়িতেই সে থাকে। অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার কন্যা হেমনলিনী এবার এফ. এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদা-বাবুর বাড়ি চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত।

হেমনলিনী স্নানের পর চুল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত। রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জন ছাদে চিলকোঠার এক পাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে এরূপ স্থান অনুকূল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ্য আছে।

সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে-বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। সে তর্ক তুলিয়াছিল যে, পুরুষের বুদ্ধি খড়্গের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে পারে; মেয়েদের বুদ্ধি কলমকাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও না কেন, তাহাতে কোনো বৃহৎ কাজ চলে না—ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগল্‌ভতা নীরবে

উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিকে খাটো করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি আনয়ন করিল। তখন রমেশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীজাতির স্তবগান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্যদিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় বেহারা তাহার হাতে একটুকরা চিঠি দিল। বহির্ভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা। চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কী ?" রমেশ কহিল, "বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন।" হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, "দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আন না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।"

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আজ থাক্‌, আমি যাই।"

অক্ষয় মনে মনে খুশি হইয়া বলিয়া লইল, "এখানে খাইতে তাঁহার হয়তো আপত্তি হইতে পারে।"

রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, "কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।"

রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিশেষ কোনো কাজ আছে কি ?"

ব্রজমোহন কহিলেন, "এমন কিছু গুরুতর নহে।"

তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্য রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌতূহল নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। 'শ্রীচরণ-কমলেষু' পর্যন্ত লিখিয়া লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, "আমি হেমনলিনী সম্বন্ধে যে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোনোমতেই উচিত হইবে না।" অনেকগুলা চিঠি অনেক রকম করিয়া লিখিল—সমস্তই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকাইয়া নিশাচরের মতো সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল—রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল—রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর

বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে-বাড়ির কক্ষে কক্ষে সুগভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহনবাবুর সতর্কতায় গাড়ি ফেল করিবার কোনোই সুযোগ উপস্থিত হইল না।

২

বাড়ি গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতি করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভালো ছিল না—ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশু কন্যাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্যাটি আজ বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারই সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভাল নয়। ব্রজমোহন কহিলেন, "ও-সকল কথা আমি ভালো বুঝি না—মানুষ তো ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভালো দেখার বিচারটাই সর্বাগ্রে তুলিতে হইবে। মেয়েটির মা যেমন সতী-সাধ্বী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে।"

শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সংকোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, "বাবা, এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি অন্যস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।"

ব্রজমোহন। বল কী। একেবারে পানপত্র হইয়া গেছে?

রমেশ। না, ঠিক পানপত্র নয়, তবে—

ব্রজমোহন। কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?

রমেশ। না, কথাবার্তা যাহাকে বলে, তাহা হয় নাই—

ব্রজমোহন। হয় নাই তো! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর কটা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে।

রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, "আর কোনো কন্যাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "না-করা তোমার পক্ষে আরও বেশি অন্যায় হইতে পারে।"

রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে।"

রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে এক বৎসর অকাল ছিল— সে ভাবিয়াছিল, কোনোক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার এক বৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।

কন্যার বাড়ি নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে—নিতান্ত কাছে নহে—ছোটো-বড়ো দুটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিন চার দিন লাগিবার কথা। ব্রজমোহন দৈবের জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া এক সপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

বরাবর বাতাস অনুকূল ছিল। শিমুলঘাটায় পৌঁছিতে পুরা তিন দিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো চার দিন দেরি আছে।

ব্রজমোহনবাবুর দু-চার দিন আগে আসিবারই ইচ্ছা ছিল। শিমুলঘাটায় তাঁহার বেহান দীন অবস্থায় থাকেন। ব্রজমোহনবাবুর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, ইহার বাসস্থান তাঁহাদের স্বগ্রামে উঠাইয়া লইয়া ইহাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখেন ও বন্ধুঋণ শোধ করেন। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকাতে হঠাৎ সে-প্রস্তাব করা সংগত মনে করেন নাই। এবারে বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার বেহানকে তিনি বাস উঠাইয়া লইতে রাজি করাইয়াছেন। সংসারে বেহানের একটিমাত্র কন্যা,—তাহার কাছে থাকিয়া মাতৃহীন জামাতার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "যে যাহা বলে বলুক, যেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকিবে, সেখানেই আমার স্থান।"

বিবাহের কিছুদিন আগে আসিয়া ব্রজমোহনবাবু তাঁহার বেহানের ঘরকন্না তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করাই তাঁহার ইচ্ছা। এইজন্য তিনি বাড়ি হইতে আত্মীয় স্ত্রীলোক কয়েকজনকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন।

বিবাহকালে রমেশ ঠিকমতো মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাস্যোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ্য করিল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিবাহ সম্পন্ন হইলে মেয়েরা এক নৌকায়, বৃদ্ধেরা এক নৌকায়, বর ও বয়স্যগণ আর এক নৌকায় যাত্রা করিল। অন্য এক নৌকায় রোশনচৌকির দল যখন-তখন যে-সে রাগিণী যেমন-তেমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন অসহ্য গরম। আকাশে মেঘ নাই, অথচ একটা বিবর্ণ আচ্ছাদনে চারিদিক ঢাকা পড়িয়াছে—তীরের তরুশ্রেণী পাংশুবর্ণ। গাছের পাতা নড়িতেছে না। দাঁড়িমাঝিরা গলদ্‌ঘর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমিবার পূর্বেই মাল্লারা কহিল, "কর্তা, নৌকা এইবার ঘাটে বাঁধি—সম্মুখে অনেকদূর আর নৌকা রাখিবার জায়গা নাই।" ব্রজমোহনবাবু পথে বিলম্ব করিতে চান না। তিনি কহিলেন, "এখানে বাঁধিলে চলিবে না। আজ প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না আছে, আজ বালুহাটায় পৌঁছিয়া নৌকা বাঁধিব। তোরা বকশিস পাইবি।"

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। এক দিকে চর ধুধু করিতেছে, আর-এক দিকে ভাঙা উচ্চ পাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। 'রাখ্ রাখ্, সামাল সামাল, হায় হায়' করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কী হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল, তাহার কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

৩

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রমেশ দেখিল, সে বালির তটে পড়িয়া আছে। কী ঘটিয়াছিল, তাহা মনে করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় গেল—তাহার পরে দুঃস্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের কী দশা হইল, সন্ধান করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই। বালুতটের তীর বাহিয়া সে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল।

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো ঊর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে। রমেশ যখন একটি শাখার তীরপ্রান্ত ঘুরিয়া অন্য শাখার তীরে গিয়া

উপস্থিত হইল, তখন কিছুদূরে একটা লাল কাপড়ের মতো দেখা গেল। দ্রুতপদে কাছে আসিয়া রমেশ দেখিল, লাল-চেলি-পরা নববধূটি প্রাণহীনভাবে পড়িয়া আছে।

জলমগ্ন মুমূর্ষুর শ্বাসক্রিয়া কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, রমেশ তাহা জানিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া রমেশ বালিকার বাহুদুটি এক বার তাহার শিয়রের দিকে প্রসারিত করিয়া পরক্ষণেই তাহার পেটের উপরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বধূর নিশ্বাস বহিল এবং সে চক্ষু মেলিল।

রমেশ তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকাকে কোনো প্রশ্ন করিবে, সেটুকু শ্বাসও যেন তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

বালিকা তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে নাই। এক বার চোখ মেলিয়া তখনই তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। রমেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার শ্বাসক্রিয়ার আর কোনো ব্যাঘাত নাই। তখন এই জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

কে বলিল সুশীলাকে ভালো দেখিতে নয়। এই নিমীলিতনেত্র সুকুমার মুখখানি ছোটো—তবু এত-বড়ো আকাশের মাঝখানে, বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্নায়, কেবল এই সুন্দর কোমল মুখ একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো গৌরবে ফুটিয়া আছে।

রমেশ আর-সকল কথা ভুলিয়া ভাবিল, "ইহাকে যে বিবাহসভার কলরব ও জনতার মধ্যে দেখি নাই, সে ভালোই হইয়াছে। ইহাকে এমন করিয়া আর কোথাও দেখিতে পাইতাম না। ইহার মধ্যে নিশ্বাস সঞ্চার করিয়া বিবাহের মন্ত্রপাঠের চেয়ে ইহাকে অধিক আপনার করিয়া লইয়াছি। মন্ত্র পড়িয়া ইহাকে আপনার নিশ্চিত প্রাপ্যস্বরূপ পাইতাম, এখানে ইহাকে অনুকূল বিধাতার প্রসাদের স্বরূপ লাভ করিলাম।"

জ্ঞানলাভ করিয়া বধূ উঠিয়া বসিয়া শিথিল বস্ত্র সারিয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নৌকার আর সকলে কোথায় গেছেন, কিছু জান?"

সে কেবল নীরবে মাথা নাড়িল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এইখানে একটুখানি বসিতে পারিবে, আমি এক বার চারিদিক ঘুরিয়া সকলের সন্ধান লইয়া আসিব?"

বালিকা তাহার কোনো উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার সর্বশরীর যেন সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে আমাকে একলা ফেলিয়া যাইয়ো না।"

রমেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সে এক বার উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইল—সাদা বালির মধ্যে কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নাই। আত্মীয়দিগকে আহ্বান করিয়া প্রাণপণ উর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, কাহারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রমেশ বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া দেখিল—বধূ মুখে দুই হাত দিয়া কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। রমেশ সান্ত্বনার কোনো কথা না বলিয়া বালিকার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার কান্না আর চাপা রহিল না—অব্যক্তকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রমেশের দুই চক্ষু দিয়াও জলধারা ঝরিয়া পড়িল।

শ্রান্ত হৃদয় যখন রোদন বন্ধ করিল, তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকঝিক করিতেছে।

তখন রমেশ বালিকার ভয়শীতল কোমল ক্ষুদ্র দুইটি হাত দুই হাতে তুলিয়া লইয়া বধূকে আপনার দিকে ধীরে আকর্ষণ করিল। শঙ্কিত বালিকা কোনো বাধা দিল না। মানুষকে কাছে অনুভব করিবার জন্য সে তখন ব্যাকুল। অটল অন্ধকারের মধ্যে নিশ্বাসস্পন্দিত রমেশের বক্ষপটে আশ্রয় লাভ করিয়া সে আরাম বোধ করিল। তখন তাহার লজ্জা করিবার সময় নহে। রমেশের দুই বাহুর মধ্যে সে আপনি নিবিড় আগ্রহের সহিত আপনার স্থান করিয়া লইল।

প্রত্যূষের শুকতারা যখন অস্ত যায়-যায়, পূর্বদিকের নীল নদীরেখার উপরে প্রথমে আকাশ যখন পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রমশ রক্তিম হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল, নিদ্রাবিহ্বল রমেশ বালির উপরে শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার বুকের কাছে বাহুতে মাথা রাখিয়া নববধূ সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন। অবশেষে প্রভাতের মৃদু রৌদ্র যখন উভয়ের চক্ষুপুট স্পর্শ করিল, তখন উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য চারিদিকে চাহিল; তাহার পরে হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাহারা ঘরে নাই, মনে পড়িল, তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছে।

৪

সকালবেলায় জেলেডিঙির সাদা-সাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহারই একটিকে ডাকাডাকি করিয়া লইয়া জেলেদের সাহায্যে একখানি বড় পানসি

ভাড়া করিল এবং নিরুদ্দেশ আত্মীয়দের সন্ধানের জন্য পুলিস নিযুক্ত করিয়া বধূকে লইয়া গৃহে রওনা হইল।

গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁছিতেই রমেশ খবর পাইল যে, তাহার পিতার, শাশুড়ীর ও আর কয়েকটি আত্মীয়-বন্ধুর মৃতদেহ নদী হইতে পুলিস উদ্ধার করিয়াছে। জনকয়েক মাল্লা ছাড়া আর যে কেহ বাঁচিয়াছে, এমন আশা আর কাহারও রহিল না।

বাড়িতে রমেশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি বধূসহ রমেশকে ফিরিতে দেখিয়া উচ্চকলরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার যে-সকল বরযাত্র গিয়াছিল, তাহাদেরও ঘরে ঘরে কান্না পড়িয়া গেল। শাঁখ বাজিল না, হুলুধ্বনি হইল না, কেহ বধূকে বরণ করিয়া লইল না, কেহ তাহার দিকে তাকাইল না মাত্র।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইবার পরেই রমেশ বধূকে লইয়া অন্যত্র যাইবে স্থির করিয়াছিল— কিন্তু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার শীঘ্র নড়িবার জো ছিল না। পরিবারের শোকাতুর স্ত্রীলোকগণ তীর্থবাসের জন্য তাহাকে ধরিয়া পড়িয়াছে, তাহারও বিধান করিতে হইবে।

এই সকল কাজকর্মের অবকাশকালে রমেশ প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না। যদিও পূর্বে যেমন শুনা গিয়াছিল, বধূ তেমন নিতান্ত বালিকা নয়, এমন কি, গ্রামের মেয়েরা ইহাকে অধিকবয়স্কা বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল, তবু ইহার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি. এ. পাস-করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে-উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসংগত বলিয়াই জানিত। তবু কোনো বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোটো মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতা রূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে কল্যাণীকে পূর্ণমহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

৫

এইরূপে প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া গেল। বৈষয়িক ব্যবস্থা সমস্ত সমাধা হইয়া আসিল। প্রাচীনারা তীর্থবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশীমহল হইতে দুই-একটি সঙ্গিনী নববধূর সহিত পরিচয়স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে দুজনে মাদুর পাতিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে, বধূ যখন রাত্রি অধিক না হইতেই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রমেশ তখন নানাবিধ উপদ্রবে তাহাকে সচেতন করিয়া তাহার বিরক্তি-তিরস্কার লাভ করে।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় রমেশ বালিকার খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "সুশীলা, আজ তোমার চুলবাঁধা ভালো হয় নাই।"

বালিকা বলিয়া বসিল, "আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?"

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বধূ কহিল, "আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে? আমি তো শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত—না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুচিবে না।"

হঠাৎ রমেশের বুক ধক করিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল—কোথায় কী-একটা প্রমাদ ঘটিয়াছে, এ সংশয় হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "শিশুকাল হইতেই তুমি অপয়মন্ত কিসে হইলে?"

বধূ কহিল, "আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা মরিয়াছেন, আমাকে জন্মদান করিয়া তাহার ছয় মাসের মধ্যে আমার মা মারা গেছেন। মামার বাড়িতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম, কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে পছন্দ করিলে—দুই দিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, তার পরে দেখো, কী সব বিপদই ঘটিল।"

রমেশ নিশ্চল হইয়া তাকিয়ার উপরে শুইয়া পড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালি হইয়া গেল। রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল। যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকুকে সে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ হাওয়া বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিতেছে—অদূরে

নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার ছাদ হইতে মাঝিদের গান আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া না পাইয়া বধূ অতি ধীরে ধীরে রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ ?"

রমেশ কহিল, "না।"

তাহার পরেও অনেকক্ষণ রমেশের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বধূ কখন আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। রমেশ উঠিয়া বসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপ্তলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজও এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্যের ভিতরে সেই ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে।

৬

বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে, এ-কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী, তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কী মনে হইল ?"

বালিকা কহিল, "আমি তো তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নিচু করিয়া ছিলাম।"

রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই ?

বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল—তোমার নাম আমি শুনিই নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন।

রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখো দেখি।

রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেনসিল দিল। সে বলিল, "তা বুঝি আমি আর পারি না! আমার নাম বানান করা খুব সহজ।"—বলিয়া বড়ো বড়ো অক্ষরে নিজের নাম লিখিল—শ্রীমতী কমলা দেবী।

রমেশ। আচ্ছা, মামার নাম লেখো।

কমলা লিখিল—শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও ভুল হইয়াছে ?"

রমেশ কহিল, "না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখো দেখি।"

সে লিখিল—ধোবাপুকুর।

এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত আবিষ্কার করিল তাহাতে বড়ো-একটা সুবিধা হইল না।

তাহার পরে রমেশ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল। খুব সম্ভব, ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদি বা শ্বশুরবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না, সন্দেহ। মামার বাড়ি পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না। এতকাল বধূভাবে অন্যের বাড়িতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কী গতি হইবে, কোথায় ইহার স্থান হইবে ? স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে ? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।

ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না। রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানাবর্ণের স্নেহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল।

রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া একটা কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল।

কলিকাতা দেখিবার জন্য কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রথম দিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানলায় গিয়া বসিল—সেখান হইতে জনস্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কৌতূহলে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। ঘরে এক জন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন। সে বালিকার বিস্ময়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "হাঁগা, হাঁ করিয়া কী দেখিতেছ ? বেলা যে অনেক হইল, চান করিবে না ?"

ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ি চলিয়া যাইবে। রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলাকে এখন তো এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না—অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কী করিয়া রাত কাটাইবে ?"

রাত্রে আহারের পর ঝি চলিয়া গেল। রমেশ কমলাকে তাহার বিছানা দেখাইয়া কহিল, "তুমি শোও, আমার এই বই পড়া হইলে আমি পরে শুইব।"

এই বলিয়া রমেশ একখানা বই খুলিয়া পড়িবার ভান করিল, শ্রান্ত কমলার ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

সে-রাত্রি এমনি করিয়া কাটিল। পররাত্রেও রমেশ কোনো ছলে কমলাকে একলা বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সেদিন বড়ো গরম ছিল। শোবার ঘরের সামনে একটুখানি খোলা ছাদ আছে, সেইখানে একটা শতরঞ্চি পাতিয়া রমেশ শয়ন করিল এবং নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ও হাতপাখার বাতাস খাইতে খাইতে গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-তিনটার সময় আধঘুমে রমেশ অনুভব করিল, সে একলা শুইয়া নয় এবং তাহার পাশে আস্তে আস্তে একটি হাতপাখা চলিতেছে। রমেশ ঘুমের ঘোরে পার্শ্ববর্তিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিজড়িতস্বরে কহিল, "সুশীলা, তুমি ঘুমাও, আমাকে পাখা করিতে হইবে না।" অন্ধকারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষপট আশ্রয় করিয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের বেলায় রমেশ জাগিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল, নিদ্রিত কমলার ডান হাতখানি তাহার কণ্ঠে জড়ানো—সে দিব্য অসংকোচে রমেশের 'পরে আপন বিশ্বস্ত অধিকার বিস্তার করিয়া তাহার বক্ষে লগ্ন হইয়া আছে। নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রমেশের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এই সংশয়হীন কোমল বাহুপাশ সে কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবে? রাত্রে বালিকা যে কখন এক সময় তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে বাতাস করিতেছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িল—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বালিকার বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া রমেশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

অনেক চিন্তা করিয়া রমেশ বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে কমলাকে রাখা স্থির করিয়াছে। তাহা হইলে এখনকার মতো অন্তত কিছুকাল সে ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পায়।

রমেশ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, তুমি পড়াশুনা করিবে?"

কমলা রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবটা এই যে, "তুমি কী বল?"

রমেশ লেখাপড়ার উপকারিতা ও আনন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না, কমলা কহিল, "আমাকে পড়াশুনা শেখাও।"

রমেশ কহিল, "তাহা হইলে তোমাকে ইস্কুলে যাইতে হইবে।"

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "ইস্কুলে? এতবড়ো মেয়ে হইয়া আমি ইস্কুলে যাইব?"

কমলার এই বয়োমর্যাদার অভিমানে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার চেয়েও অনেক বড়ো মেয়ে ইস্কুলে যায়।"

কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া এক দিন রমেশের সঙ্গে ইস্কুলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি—তাহার চেয়ে অনেক বড়ো এবং ছোটো কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কোথায় আসিতেছ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।"

কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখানে থাকিবে না?"

রমেশ। আমি তো এখানে থাকিতে পারি না।

কমলা রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চলো।"

রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "ছি কমলা।"

এই ধিক্কারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোটো হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীত মুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

৭

এইবার আলিপুরে ওকালতির কাজ শুরু করিয়া দিবে, রমেশের এইরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেছে। চিত্ত স্থির করিয়া কাজে হাত দিবার এবং প্রথম কার্যারম্ভের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার মত স্ফূর্তি তাহার ছিল না। সে এখন কিছুদিন গঙ্গার পোলের উপর এবং গোলদিঘিতে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক বার মনে করিল, কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া আসি, এমন সময় অন্নদাবাবুর কাছ হইতে একখানি চিঠি পাইল।

অন্নদাবাবু লিখিতেছেন, "গেজেটে দেখিলাম, তুমি পাস হইয়াছ—কিন্তু সে খবর তোমার নিকট হইতে না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। বহুকাল তোমার কোনো সংবাদ পাই নাই। তুমি কেমন আছ এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও সুখী করিবে।"

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অন্নদাবাবু যে বিলাতগত ছেলেটির 'পরে

তাঁহার চক্ষু রাখিয়াছিলেন, সে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক ধনিকন্যার সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

ইতিমধ্যে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পরে হেমনলিনীর সহিত পূর্বের ন্যায় সাক্ষাৎ করা তাহার কর্তব্য হইবে কি না, তাহা রমেশ কোনোমতেই স্থির করিতে পারিল না। সম্প্রতি কমলার সহিত তাহার যে-সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, সে-কথা কাহাকেও বলা সে কর্তব্য বোধ করে না। নিরপরাধা কমলাকে সে সংসারের কাছে অপদস্থ করিতে পারে না। অথচ সকল কথা স্পষ্ট না বলিয়া হেমনলিনীর নিকট সে তাহার পূর্বের অধিকার লাভ করিবে কী করিয়া?

কিন্তু অন্নদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করা আর তো উচিত হয় না। সে লিখিল, "গুরুতর কারণবশত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়াছি, আমাকে মার্জনা করিবেন।" নিজের নূতন ঠিকানা পত্রে দিল না।

এই চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া তাহার পরদিনেই রমেশ শামলা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল।

এক দিন সে আদালত হইতে ফিরিবার সময় কতক পথ হাঁটিয়া একটি ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় একটি পরিচিত বাগ্রকণ্ঠের স্বরে শুনিতে পাইল, "বাবা, এই যে রমেশবাবু!"

"গাড়োয়ান, রোখো, রোখো!"

গাড়ি রমেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন আলিপুরের পশুশালায় একটি চড়িভাতির নিমন্ত্রণ সারিয়া অন্নদাবাবু ও তাঁহার কন্যা বাড়ি ফিরিতেছিলেন—এমন সময়ে হঠাৎ এই সাক্ষাৎ।

গাড়িতে হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরণের সেই শাড়ি পরা, তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত ভঙ্গী, তাহার হাতের সেই প্লেন বালা এবং তারাকাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি দেখিবামাত্র রমেশের বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "এই যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল! আজকাল চিঠিলেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি বা লেখ, তবু ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায়? বিশেষ কোনো কাজ আছে?"

রমেশ কহিল, "না, আদালত হইতে ফিরিতেছি।"

অন্নদা। তবে চলো, আমাদের ওখানে চা খাইবে চলো।

রমেশের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল—সেখানে আর দ্বিধা করিবার স্থান ছিল না।

সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল। একান্ত চেষ্টায় সংকোচ কাটাইয়া হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভাল আছেন?"

হেমনলিনী কুশলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়াই কহিল, "আপনি পাস হইয়া আমাদের যে এক বার খবর দিলেন না বড়ো?"

রমেশ এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, "আপনিও পাস হইয়াছেন দেখিলাম।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "তবু ভালো, আমাদের খবর রাখেন!"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "তুমি এখন বাসা কোথায় করিয়াছ?"

রমেশ কহিল, "দরজিপাড়ায়।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কেন, কলুটোলায় তোমার সাবেক বাসা তো মন্দ ছিল না!"

উত্তরের অপেক্ষায় হেমনলিনী বিশেষ কৌতূহলের সহিত রমেশের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টি রমেশকে আঘাত করিল—সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, সেই বাসাতেই ফিরিব স্থির করিয়াছি।"

তাহার এই বাসা-বদল করার অপরাধ যে হেমনলিনী গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রমেশ বেশ বুঝিল—সাফাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল। অন্য পক্ষ হইতে আর কোনো প্রশ্ন উঠিল না। হেমনলিনী গাড়ির বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ আর থাকিতে না পারিয়া অকারণে আপনি কহিয়া উঠিল, "আমার একটি আত্মীয় হেদুয়ার কাছে থাকেন, তাঁহার খবর লইবার জন্য দরজিপাড়ায় বাসা করিয়াছি।"

রমেশ নিতান্ত মিথ্যা বলিল না, কিন্তু কথাটা কেমন অসংগত শুনাইল। মাঝে মাঝে আত্মীয়ের খবর লইবার পক্ষে কলুটোলা হেদুয়া হইতে এতই কি দূর? হেমনলিনীর দুই চক্ষু গাড়ির বাহিরে পথের দিকেই নিবিষ্ট হইয়া রহিল। হতভাগ্য রমেশ ইহার পরে কী বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। এক বার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেনের খবর কী?" অন্নদাবাবু কহিলেন, "সে আইন-পরীক্ষায় ফেল করিয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গেছে।"

গাড়ি যথাস্থানে পৌছিলে পর পরিচিত ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর মন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দিল। রমেশের বুকের মধ্য হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল।

রমেশ কিছু না বলিয়াই চা খাইতে লাগিল। অন্নদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার তো তুমি অনেক দিন বাড়িতে ছিলে, কাজ ছিল বুঝি।"

রমেশ কহিল, "বাবার মৃত্যু হইয়াছে।"

অন্নদা। আঁ্যা, বল কী! সে কী কথা। কেমন করিয়া হইল?

রমেশ। তিনি পদ্মা বাহিয়া নৌকা করিয়া বাড়ি আসিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন অকস্মাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়, তেমনি এই শোকের সংবাদে রমেশ ও হেমনলিনীর মাঝখানকার গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। হেম অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিল, "রমেশবাবুকে ভুল বুঝিয়াছিলাম,—তিনি পিতৃবিয়োগের শোকে এবং গোলমালে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এখনো হয়তো তাহাই লইয়া উন্মনা হইয়া আছেন। উঁহার সাংসারিক কী সংকট ঘটিয়াছে, উঁহার মনের মধ্যে কী ভার চাপিয়াছে, তাহা কিছুই না জানিয়াই আমরা উঁহাকে দোষী করিতেছিলাম।"

হেমনলিনী এই পিতৃহীনকে বেশি করিয়া যত্ন করিতে লাগিল। রমেশের আহারে অভিরুচি ছিল না, হেমনলিনী তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইল। কহিল, "আপনি বড়ো রোগা হইয়া গেছেন, শরীরের অযত্ন করিবেন না।" অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, রমেশবাবু আজ রাত্রেও এইখানেই খাইয়া যান না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "বেশ তো।"

এমন সময় অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত। অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে কিছুকাল অক্ষয় একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা রমেশকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, "এ কী! এ যে রমেশবাবু। আমি বলি, আমাদের বুঝি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।"

রমেশ কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিল। অক্ষয় কহিল, "আপনার বাবা আপনাকে যে-রকম তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি এবার আপনার বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না—ফাঁড়া কাটাইয়া আসিয়াছেন তো?"

হেমনলিনী অক্ষয়কে বিরক্তিদৃষ্টিদ্বারা বিদ্ধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, রমেশের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।"

রমেশ বিবর্ণ মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে বেদনার উপর ব্যথা দিল বলিয়া হেমনলিনী অক্ষয়ের প্রতি মনে মনে ভারি রাগ করিল। রমেশকে তাড়াতাড়ি কহিল, "রমেশবাবু, আপনাকে আমাদের নূতন অ্যালবমখানা দেখানো হয় নাই।" বলিয়া অ্যালবম আনিয়া রমেশের টেবিলের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া ছবি লইয়া

আলোচনা করিতে লাগিল এবং এক সময়ে আস্তে আস্তে কহিল, "রমেশবাবু, আপনি বোধ হয় নূতন বাসায় একলা থাকেন?"

রমেশ কহিল, "হাঁ।"

হেমনলিনী। আমাদের পাশের বাড়িতে আসিতে আপনি দেরি করিবেন না।

রমেশ কহিল, "না, আমি এই সোমবারেই নিশ্চয় আসিব।"

হেমনলিনী। মনে করিতেছি, আমাদের বি.এ.র ফিলজফি আপনার কাছে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া লইব।

রমেশ তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল।

৮

রমেশ পূর্বের বাসায় আসিতে বিলম্ব করিল না।

ইহার আগে হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরভাব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না। রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক। হাসিকৌতুক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব জমিয়া উঠিল।

অনেক কাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্বে হেমনলিনীর চেহারা একপ্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল। মনে হইত, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন তাহার কথা অল্প ছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিতেই ভয় হইত—পাছে সামান্য কিছুতেই সে অপরাধ লয়।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মসৃণতা দেখা দিল। তাহার চক্ষু এখন কথায় কথায় হাস্যচ্ছটায় নাচিয়া উঠে। আগে সে বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে চাপল্য, এমন কি, অন্যায় মনে করিত। এখন কারও সঙ্গে কোনো তর্ক না করিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মত ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না।

কর্তব্যবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত রমেশও বড়ো কম গম্ভীর ছিল না। বিচারশক্তির প্রাবল্যে তাহার শরীরমন যেন মন্থর হইয়া গিয়াছিল। আকাশের জ্যোতির্ময় গ্রহতারা চলিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মানমন্দির আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে—রমেশ সেইরূপ এই চলমান জগৎসংসারের মাঝখানে আপনার পুঁথিপত্র যুক্তিতর্কের আয়োজনভারে স্তম্ভিত হইয়া ছিল,

তাহাকেও আজ এতটা হালকা করিয়া দিল কিসে? সেও আজকাল সব সময়ে পরিহাসের সদুত্তর দিতে না পারিলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চুলে এখনো চিরুনি উঠে নাই বটে, কিন্তু তাহার চাদর আর পূর্বের মতো ময়লা নাই। তাহার দেহে মনে এখন যেন একটা চলৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

৯

প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে-সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতা শহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক-বকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি? তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্যহীন আধুনিক নগরে ভালোবাসার জাদুবিদ্যা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না। এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহনিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত রাত্রে কত দিনে কত বার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে।

রমেশ ও হেমনলিনী চামড়ার দোকানের সামনে মুদির দোকানের পাশে কলুটোলায় ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিতেছিল বলিয়া প্রণয়-বিকাশ সম্বন্ধে কুঞ্জকুটিরচারীদের চেয়ে তাহারা যে কিছুমাত্র পিছাইয়া ছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অন্নদাবাবুদের চা-রস-চিহ্নিত মলিন ক্ষুদ্র টেবিলটি পদ্মসরোবর নহে বলিয়া রমেশ কিছুমাত্র অভাব অনুভব করে নাই। হেমনলিনীর পোষা বিড়ালটি কৃষ্ণসার মৃগশাবক না হইলেও রমেশ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার গলা চুলকাইয়া দিত—এবং সে যখন ধনুকের মতো পিঠ ফুলাইয়া আলস্যত্যাগপূর্বক গাত্রলেহন দ্বারা প্রসাধনে রত হইত, তখন রমেশের মুগ্ধদৃষ্টিতে এই প্রাণীটি গৌরবে অন্য কোনো চতুষ্পদের চেয়ে ন্যূন বলিয়া প্রতিভাত হইত না।

হেমনলিনী পরীক্ষা পাস করিবার ব্যগ্রতায় সেলাইশিক্ষায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কিছুদিন হইতে তাহার এক সীবনপটু সখীর কাছে একাগ্রমনে সে সেলাই শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেলাই ব্যাপারটাকে রমেশ অত্যন্ত অনাবশ্যক ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। সাহিত্যে দর্শনে হেমনলিনীর সঙ্গে তাহার দেনাপাওনা চলে—কিন্তু সেলাই ব্যাপারে রমেশকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্য সে প্রায়ই কিছু অধীর হইয়া বলিত, "আজকাল সেলাইয়ের কাজ কেন আপনার এত ভালো

লাগে। যাহাদের সময় কাটাইবার আর কোনো সদুপায় নাই, তাহাদের পক্ষেই ইহা ভালো।" হেমনলিনী কোনো উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ছুঁচে রেশম পরাইতে থাকে। অক্ষয় তীব্রস্বরে বলে, "যে-সকল কাজ সংসারের কোনো প্রয়োজনে লাগে, রমেশবাবুর বিধানমতে সে-সমস্ত তুচ্ছ। মশায় যত-বড়োই তত্ত্বজ্ঞানী এবং কবি হ'ন না কেন, তুচ্ছকে বাদ দিয়া এক দিনও চলে না।" রমেশ উত্তেজিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসে; হেমনলিনী বাধা দিয়া বলে, "রমেশ-বাবু, আপনি সকল কথারই উত্তর দিবার জন্য এত ব্যস্ত হন কেন? ইহাতে সংসারে অনাবশ্যক কথা যে কত বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক নাই।" এই বলিয়া সে মাথা নিচু করিয়া ঘর গনিয়া সাবধানে রেশমসূত্র চালাইতে প্রবৃত্ত হয়।

এক দিন সকালে রমেশ তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর রেশমের ফুলকাটা মখমলে বাঁধানো একটি ব্লটিং-বহি সাজানো রহিয়াছে। তাহার একটি কোণে "র" অক্ষর লেখা আছে, আর-এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বইখানির ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝিতে রমেশের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। সেলাই জিনিসটা তুচ্ছ নহে, তাহা তাহার অন্তরাত্মা বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইল। ব্লটিং-বইটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে অক্ষয়ের কাছেও হার মানিতে রাজি হইল। সেই ব্লটিং-বই খুলিয়া তখনি তাহার উপরে একখানি চিঠির কাগজ রাখিয়া সে লিখিল,

> "আমি যদি কবি হইতাম, তবে কবিতা লিখিয়া প্রতিদান দিতাম, কিন্তু প্রতিভা হইতে আমি বঞ্চিত। ঈশ্বর আমাকে দিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু লইবার ক্ষমতাও একটা ক্ষমতা। আশাতীত উপহার আমি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্তর্যামী ছাড়া তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না। দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতরে লুকানো। ইতি। চিরঋণী।"

এই লিখনটুকু হেমনলিনীর হাতে পড়িল। তাহার পরে এ-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আর কোনো কথাই হইল না।

বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল। বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে শহুরে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে—ওটা আরণ্যপ্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী; শহরের বাড়িগুলা তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ও ছাদ লইয়া, পথিক তাহার ছাতা লইয়া, ট্রামগাড়ি তাহার পর্দা লইয়া, বর্ষাকে কেবল নিষেধ করিবার চেষ্টায় ক্লেদাক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। নদী-পর্বত-অরণ্য-প্রান্তর বর্ষাকে সাদর কলরবে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করে। সেইখানেই

বর্ষার যথার্থ সমারোহ—সেখানে শ্রাবণে দ্যুলোক-ভূলোকের আনন্দসম্মিলনের মাঝখানে কোনো বিরোধ নাই।

কিন্তু নূতন ভালোবাসায় মানুষকে অরণ্যপর্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। অবিশ্রাম বর্ষায় অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তস্ফূর্তির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের দুই জনের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল। বৃষ্টির উপলক্ষ্যে রমেশের আদালতযাত্রায় প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। এক-এক দিন সকালে এমনি চাপিয়া বৃষ্টি আসে যে, হেমনলিনী উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, "রমেশবাবু, এ বৃষ্টিতে আপনি বাড়ি যাইবেন কী করিয়া?" রমেশ নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বলে, "এইটুকু বই তো নয়, কোনোরকম করিয়া যাইতে পারিব।" হেমনলিনী বলে, "কেন ভিজিয়া সর্দি করিবেন? এইখানেই খাইয়া যান না।" সর্দির জন্য উৎকণ্ঠা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না; অল্পেই যে তাহার সর্দি হয়, এমন কোনো লক্ষণও তাহার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে নাই, কিন্তু বর্ষণের দিনে হেমনলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাহাকে কাটাইতে হইত,—দুই পা মাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অন্যায় দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত। কোনোদিন বাদলার একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলেই হেমনলিনীদের ঘরে প্রাতঃকালে রমেশের খিচুড়ি এবং অপরাহ্ণে ভাজাভুজি খাইবার নিমন্ত্রণ জুটিত। বেশ দেখা গেল, হঠাৎ সর্দি লাগিবার সম্বন্ধে ইহাদের আশঙ্কা যত অতিরিক্ত প্রবল ছিল, পরিপাকের বিভ্রাট সম্বন্ধে ততটা ছিল না।

এমনি দিন কাটিতে লাগিল। এই আত্মবিস্মৃত হৃদয়াবেগের পরিণাম কোথায়, রমেশ স্পষ্ট করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু অন্নদাবাবু ভাবিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের সমাজের আরও পাঁচ জন আলোচনা করিতেছিল। একে রমেশের পাণ্ডিত্য যতটা, কাণ্ডজ্ঞান ততটা নাই, তাহাতে তাহার বর্তমান মুগ্ধ অবস্থায় তাহার সাংসারিক বুদ্ধি আরও অস্পষ্ট হইয়া গেছে। অন্নদাবাবু প্রত্যহই বিশেষ প্রত্যাশার সহিত তাহার মুখের দিকে চান, কিন্তু কোনো জবাবই পান না।

১৩

অক্ষয়ের গলা বিশেষ ভালো ছিল না, কিন্তু সে যখন নিজে বেহালা বাজাইয়া গান গাহিত, তখন অত্যন্ত কড়া সমজদার ছাড়া সাধারণ শ্রোতার দল আপত্তি করিত না, এমন কি, আরও গাহিতে অনুরোধ করিত। অন্নদাবাবুর সংগীতে বিশেষ অনুরক্তি

ছিল না, কিন্তু সে-কথা তিনি কবুল করিতে পারিতেন না—তবু তিনি আত্মরক্ষার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন। কেহ অক্ষয়কে গান গাহিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "ওই তোমাদের দোষ, বেচারা গাহিতে পারে বলিয়াই কি উহার 'পরে অত্যাচার করিতে হইবে ?"

অক্ষয় বিনয় করিয়া বলিত, "না না অন্নদাবাবু, সে-জন্য ভাবিবেন না—অত্যাচারটা কাহার 'পরে হইবে, সেইটেই বিচার্য।"

অনুরোধের তরফ হইতে জবাব আসিত, "তবে পরীক্ষা হউক।"

সেদিন অপরাহ্ণে খুব ঘনঘোর করিয়া মেঘ আসিয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অক্ষয় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেমনলিনী কহিল, "অক্ষয়বাবু, একটা গান করুন।"

এই বলিয়া হেমনলিনী হারমোনিয়মে সুর দিল।

অক্ষয় বেহালা মিলাইয়া লইয়া হিন্দুস্থানি গান ধরিল—

"বায়ু বহেঁ পুরবৈঞা, নীদ নহিঁ বিন সৈঞা।"

গানের সকল কথার স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় না—কিন্তু একেবারে প্রত্যেক কথায় কথায় বুঝিবার কোনো প্রয়োজন নাই। মনের মধ্যে যখন বিরহমিলনের বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, তখন একটু আভাসই যথেষ্ট। এটুকু বোঝা গেল যে, বাদল ঝরিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং এক জনের জন্য আর-এক জনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

অক্ষয় সুরের ভাষায় নিজের অব্যক্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু সে-ভাষা কাজে লাগিতেছিল আর-দুই জনের। দুই জনের হৃদয় সেই স্বরলহরীকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরকে আঘাত-অভিঘাত করিতেছিল। জগতে কিছু আর অকিঞ্চিৎকর রহিল না। সব যেন মনোরম হইয়া গেল। পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত মানুষ যত ভালোবাসিয়াছে, সমস্ত যেন দুটিমাত্র হৃদয়ে বিভক্ত হইয়া অনির্বচনীয় সুখে-দুঃখে আকাঙ্ক্ষায় আকুলতায় কম্পিত হইতে লাগিল।

সেদিন মেঘের মধ্যে যেমন ফাঁক ছিল না, গানের মধ্যেও তেমনি হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কেবল অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "অক্ষয়বাবু, থামিবেন না, আর-একটা গান, আর-একটা গান।"

উৎসাহে এবং আবেগে অক্ষয়ের গান অবাধে উৎসারিত হইতে লাগিল। গানের সুর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইল, যেন তাহা সূচিভেদ্য হইয়া উঠিল, যেন তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল—বেদনাতুর হৃদয় তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন-আবৃত হইয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাত্রে অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ বিদায় লইবার সময় যেন গানের সুরের ভিতর দিয়া নীরবে হেমনলিনীর মুখের দিকে এক বার চাহিল। হেমনলিনীও চকিতের মতো এক বার চাহিল, তাহার দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।

রমেশ বাড়ি গেল। বৃষ্টি ক্ষণকালমাত্র থামিয়াছিল, আবার ঝুপঝুপ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রমেশ সে-রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। হেমনলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিপতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল,

বায়ু বহঁ পুরবৈঞা, নীদ নহীঁ বিন সৈঞা।

পরদিন প্রাতে রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "আমি যদি কেবল গান গাহিতে পারিতাম, তবে তাহার বদলে আমার অন্য অনেক বিদ্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।"

কিন্তু কোনো উপায়ে এবং কোনো কালেই সে যে গান গাহিতে পারিবে, এ ভরসা রমেশের ছিল না। সে স্থির করিল, "আমি বাজাইতে শিখিব।" ইতিপূর্বে এক দিন নির্জন অবকাশে সে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালাখানা লইয়া ছড়ির টান দিয়াছিল—সেই ছড়ির একটিমাত্র আঘাতে সরস্বতী এমনি আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে বেহালার চর্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে-আশা সে পরিত্যাগ করে। আজ সে ছোটো দেখিয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিল। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে অঙ্গুলিচালনা করিয়া এটুকু বুঝিল যে, আর যাই হ'ক, এ যন্ত্রের সহিষ্ণুতা বেহালার চেয়ে বেশি।

পরদিনে অন্নদাবাবুর বাড়ি যাইতেই হেমনলিনী রমেশকে কহিল, "আপনার ঘর হইতে কাল যে হারমোনিয়মের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল!"

রমেশ ভাবিয়াছিল, দরজা বন্ধ থাকিলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমন কান আছে, যেখানে রমেশের অবরুদ্ধ ঘরের শব্দও সংবাদ লইয়া আসে। রমেশকে একটুকু লজ্জিত হইয়া কবুল করিতে হইল যে, সে একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিয়াছে এবং বাজাইতে শেখে, ইহাই তাহার ইচ্ছা।

হেমনলিনী কহিল, "ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজে কেন মিথ্যা চেষ্টা করিবেন। তাহার চেয়ে আপনি আমাদের এখানে অভ্যাস করুন—আমি যতটুকু জানি, সাহায্য করিতে পারিব।"

রমেশ কহিল, "আমি কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি, আমাকে লইয়া আপনার অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী কহিল, "আমার যেটুকু বিদ্যা, তাহাতে আনাড়িকে শেখানোই কোনো-মতে চলে।"

ক্রমশই প্রমাণ হইতে লাগিল, রমেশ যে নিজেকে আনাড়ি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিনয় নহে। এমন শিক্ষকের এত অযাচিত সহায়তাসত্ত্বে স্বরের জ্ঞান রমেশের মগজের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো সন্ধি খুঁজিয়া পাইল না। সন্তরণমূঢ় জলের মধ্যে পড়িয়া যেমন উন্মত্তের মতো হাতপা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশ সংগীতের হাঁটু-জলে তেম্‌নিতরো ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার কোন্ আঙুল কখন কোথায় গিয়া পড়ে, তাহার ঠিকানা নাই,—পদে পদে ভুল স্বর বাজে, কিন্তু রমেশের কানে তাহা বাজে না, স্বর-বেস্বরের মধ্যে সে কোনোপ্রকার পক্ষপাত না করিয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে রাগরাগিণীকে সর্বত্র লঙ্ঘন করিয়া যায়। হেমনলিনী যেই বলে, "ও কী করিতেছেন, ভুল হইল যে,"—অমনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ভুলের দ্বারা প্রথম ভুলটা নিরাকৃত করিয়া দেয়। গম্ভীরপ্রকৃতি অধ্যবসায়ী রমেশ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নহে। রাস্তা-তৈরির স্টীমরোলার যেমন মন্থরগমনে চলিতে থাকে, তাহার তলায় কী যে দলিত-পিষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, হতভাগ্য স্বরলিপি এবং হারমোনিয়মের চাবিগুলার উপর দিয়া রমেশ সেইরূপ অনিবার্য অন্ধতার সহিত বার বার যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

রমেশের এই মূঢ়তায় হেমনলিনী হাসে, রমেশও হাসে। রমেশের ভুল করিবার অসাধারণ শক্তিতে হেমনলিনীর অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। ভুল হইতে, বেস্বর হইতে, অক্ষমতা হইতে আনন্দ পাইবার শক্তি ভালোবাসারই আছে। শিশু চলিতে আরম্ভ করিয়া বার বার ভুল পা ফেলিতে থাকে, তাহাতেই মাতার স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠে। বাজনা সম্বন্ধে রমেশ যে অদ্ভুত রকমের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, হেমনলিনীর এই এক বড়ো কৌতুক।

রমেশ এক-এক বার বলে, "আচ্ছা, আপনি যে এত হাসিতেছেন, আপনি যখন প্রথম বাজাইতে শিখিতেছিলেন, তখন ভুল করেন নাই?"

হেমনলিনী বলে, "ভুল নিশ্চয়ই করিতাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি রমেশবাবু, আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

রমেশ ইহাতে দমিত না, হাসিয়া আবার গোড়া হইতে শুরু করিত। অন্নদাবাবু সংগীতের ভালোমন্দ কিছুই বুঝিতেন না, তিনি এক-এক বার গম্ভীর হইয়া কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেন, "তাই তো, রমেশের ক্রমেই হাত বেশ পাকিয়া আসিতেছে।"

হেমনলিনী বলিত, "হাত বেসুরায় পাকিতেছে।"

অন্নদা। না না, প্রথমে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আমার তো বোধ হয়, রমেশ যদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার হাত নিতান্ত মন্দ হইবে না। গানবাজনায় আর কিছু নয়, খুব অভ্যাস করা চাই। এক বার সারেগামার বোধটা জন্মিয়া গেলেই তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া আসে।

এ-সকল কথার উপরে প্রতিবাদ চলে না। সকলকে নিরুত্তর হইয়া শুনিতে হয়।

১১

প্রায় প্রতিবৎসর শরৎকালে পূজার টিকিট বাহির হইলে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু জব্বলপুরে তাঁহার ভগিনীপতির কর্মস্থানে বেড়াইতে যাইতেন। পরিপাক-শক্তির উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার এই সাংবৎসরিক চেষ্টা।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হইয়া আসিল, এবারে পূজার ছুটির আর বড়ো বেশি বিলম্ব নাই। অন্নদাবাবু এখন হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় রমেশ আজকাল খুব বেশি করিয়া হারমোনিয়ম শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক দিন কথায় কথায় হেমনলিনী কহিল, "রমেশবাবু, আমার বোধ হয়, আপনার অন্তত কিছুদিন বায়ুপরিবর্তন দরকার। না বাবা?"

অন্নদাবাবু ভাবিলেন কথাটা সংগত বটে, কারণ ইতিমধ্যে রমেশের উপর দিয়া শোকদুঃখের দুর্যোগ গিয়াছে। কহিলেন, "অন্তত কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসা ভালো। বুঝিয়াছ রমেশ, পশ্চিমই বল আর যে-দেশই বল, আমি দেখিয়াছি, কেবল কিছুদিনের জন্য একটু ফল পাওয়া যায়। প্রথম দিনকতক বেশ ক্ষুধা বাড়ে, বেশ খাওয়া যায়, তাহার পরে যে কে সেই। সেই পেট ভার হইয়া আসে, বুক জ্বালা করিতে থাকে, যা খাওয়া যায়, তা-ই—"

হেমনলিনী। রমেশবাবু, আপনি নর্মদা-ঝরনা দেখিয়াছেন?

রমেশ। না, দেখি নাই।

হেমনলিনী। এ আপনার দেখা উচিত, না বাবা?

অন্নদা। তা বেশ তো, রমেশ আমাদের সঙ্গেই আসুন না কেন? হাওয়া-বদলও হইবে, মারবল-পাহাড়ও দেখিবে।

হাওয়া-বদল করা এবং মারবল-পাহাড় দেখা, এই দুইটি যেন রমেশের পক্ষে সম্প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—সুতরাং রমেশকেও রাজি হইতে হইল।

সেদিন রমেশের শরীরমন যেন হাওয়ার উপরে ভাসিতে লাগিল। অশান্ত হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা রাস্তায় ছাড়া দিবার জন্য সে আপনার বাসার ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া হারমোনিয়মটা লইয়া পড়িল। আজ আর তাহার যন্ত্রণত্বজ্ঞান রহিল না—যন্ত্রটার উপরে তাহার উন্মত্ত আঙুলগুলা তাল-বেতালের নৃত্য বাধাইয়া দিল। হেমনলিনীর দূরে যাইবার সম্ভাবনায় কয় দিন তাহার হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হইয়া ছিল—আজ উল্লাসের বেগে সংগীতবিদ্যাসম্বন্ধে সর্বপ্রকার ন্যায়-অন্যায়-বোধ একেবারে বিসর্জন দিল।

এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল, "আ সর্বনাশ, থামুন, থামুন রমেশবাবু, করিতেছেন কী ?"

রমেশ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আরক্ত মুখে দরজা খুলিয়া দিল। অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, গোপনে বসিয়া এই যে কাণ্ডটি করিতেছেন, আপনাদের ক্রিমিনাল কোডের কোনো দণ্ডবিধির মধ্যে কি ইহা পড়ে না ?"

রমেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, "অপরাধ কবুল করিতেছি।"

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আলোচনা করিবার আছে।"

রমেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে আলোচ্য বিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অক্ষয়। আপনি এতদিনে এটুকু বুঝিয়াছেন, হেমনলিনীর ভালোমন্দের প্রতি আমি উদাসীন নহি।

রমেশ হাঁ-না কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

অক্ষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কী, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমার আছে—আমি অন্নদাবাবুর বন্ধু।

কথাটা এবং কথায় ধরণটা রমেশের অত্যন্ত খারাপ লাগিল। কিন্তু কড়া জবাব দিবার অভ্যাস ও ক্ষমতা রমেশের নাই। সে মৃদুস্বরে কহিল, "তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে, এ আশঙ্কা আপনার মনে আসিবার কি কোনো কারণ ঘটিয়াছে ?"

অক্ষয়। দেখুন, আপনি হিন্দুপরিবারে আছেন, আপনার পিতা হিন্দু ছিলেন। আমি জানি, পাছে আপনি ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনাকে অন্যত্র বিবাহ দিবার জন্য দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

এই সংবাদটি অক্ষয়ের জানিবার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ অক্ষয়ই রমেশের পিতার মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছিল। রমেশ ক্ষণকালের জন্য অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

অক্ষয় কহিল, "হঠাৎ আপনার পিতার মৃত্যু ঘটিল বলিয়াই কি আপনি নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছেন? তাঁহার ইচ্ছা কি—"

রমেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল, "দেখুন অক্ষয়বাবু, অন্যের সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবার অধিকার যদি আপনার থাকে, তবে দিন, আমি শুনিয়া যাইব—কিন্তু আমার পিতার সহিত আমার যে-সম্বন্ধ, তাহাতে আপনার কোনো কথা বলিবার নাই।"

অক্ষয় কহিল, "আচ্ছা বেশ, সে-কথা তবে থাক্। কিন্তু হেমনলিনীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় এবং অবস্থা আপনার আছে কি না, সে-কথা আপনাকে বলিতে হইবে।"

রমেশ আঘাতের পর আঘাত খাইয়া ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল,—কহিল, "দেখুন অক্ষয়বাবু, আপনি অন্নদাবাবুর বন্ধু হইতে পারেন, কিন্তু আমার সহিত আপনার তেমন বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। দয়া করিয়া আপনি এ-সব প্রসঙ্গ বন্ধ করুন।"

অক্ষয়। আমি বন্ধ করিলেই যদি সব কথা বন্ধ থাকে এবং আপনি এখন যেমন ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতেছেন, এমনি বরাবর কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু সমাজ আপনাদের মত নিশ্চিন্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে সুখের স্থান নহে। যদিও আপনারা অত্যন্ত উঁচুদরের লোক, পৃথিবীর কথা বড়ো বেশি ভাবেন না, তবু চেষ্টা করিলে হয়তো এটুকুও বুঝিতে পারিবেন যে, ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আপনি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এরূপ করিয়া আপনি বাহিরের লোকের জবাবদিহি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন না—এবং যাঁহাদিগকে আপনি শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে লোকসমাজে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার ইহাই উপায়।

রমেশ। আপনার উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। আমার যাহা কর্তব্য, তাহা আমি শীঘ্রই স্থির করিব এবং পালন করিব, এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন—এ-সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অক্ষয়। আমাকে বাঁচাইলেন রমেশবাবু। এত দীর্ঘকাল পরে আপনি যে কর্তব্য স্থির করিবেন এবং পালন করিবেন বলিতেছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হইলাম—

আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার শখ আমার নাই। আপনার সংগীতচর্চায় বাধা দিয়া অপরাধী হইয়াছি—মাপ করিবেন। আপনি পুনর্বার শুরু করুন, আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরে অত্যন্ত বেসুরো সংগীতচর্চাও আর চলে না। রমেশ মাথার নিচে দুই হাত রাখিয়া বিছানার উপরে চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। হঠাৎ ঘড়িতে টংটং করিয়া পাঁচটা বাজিল শুনিয়াই সে দ্রুত উঠিয়া পড়িল। কী কর্তব্য স্থির করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন—কিন্তু আশু প্রতিবেশীর ঘরে গিয়া যে পেয়ালা-দুয়েক চা খাওয়া কর্তব্য, সে-সম্বন্ধে তাহার মনে দ্বিধামাত্র রহিল না।

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, "রমেশবাবু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে ?"

রমেশ কহিল, "বিশেষ কিছু না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "আর কিছুই নয়, হজমের গোল হইয়াছে—পিত্তাধিক্য। আমি যে-পিল ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার একটা খাইয়া দেখো দেখি—"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "বাবা, ওই পিল খাওয়াও নাই, তোমার এমন আলাপী কেহ দেখি না—কিন্তু তাহাদের এমন কী উপকার হইয়াছে ?"

অন্নদা। অনিষ্ট তো হয় নাই। আমি যে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—এ-পর্যন্ত যতরকম পিল খাইয়াছি, এইটেই সব চেয়ে উপকারী।

হেমনলিনী। বাবা, যখনি তুমি একটা নূতন পিল খাইতে আরম্ভ কর, তখনি কিছুদিন তাহার অশেষ গুণ দেখিতে পাও—

অন্নদা। তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না—আচ্ছা, অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিয়ো দেখি, আমার চিকিৎসায় সে উপকার পাইয়াছে কি না।

সেই প্রামাণিক সাক্ষীকে তলবের ভয়ে হেমনলিনীকে নিরুত্তর হইতে হইল। কিন্তু সাক্ষী আপনি আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই অন্নদাবাবুকে কহিল, "অন্নদাবাবু, আপনার সেই পিল আমাকে আর-একটি দিতে হইবে। বড়ো উপকার হইয়াছে। আজ শরীর এমনি হালকা বোধ হইতেছে।"

অন্নদাবাবু সগর্বে তাঁহার কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন।

১২

পিল খাওয়ার পর অন্নদাবাবু অক্ষয়কে শীঘ্র ছাড়িতে চাহিলেন না। অক্ষয়ও যাইবার জন্য বিশেষ ত্বরা প্রকাশ না করিয়া মাঝে মাঝে রমেশের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। রমেশের চোখে সহজে কিছু পড়ে না—কিন্তু আজ অক্ষয়ের এই কটাক্ষগুলি তাহার চোখ এড়াইল না। ইহাতে তাহাকে বার বার উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে—মনে মনে তাহারই আলোচনায় হেমনলিনীর চিত্ত আজ বিশেষ প্রফুল্ল ছিল। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, আজ রমেশবাবু আসিলে ছুটিযাপন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার পরামর্শ করিবে। সেখানে নিভৃতে কী কী বই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, দুজনে মিলিয়া তাহার একটা তালিকা করিবার কথা ছিল। স্থির ছিল, রমেশ আজ সকাল সকাল আসিবে, কেন না, চায়ের সময় অক্ষয় কিংবা কেহ-না-কেহ আসিয়া পড়ে, তখন মন্ত্রণা করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আজ রমেশ অন্যদিনের চেয়েও দেরি করিয়া আসিয়াছে। মুখের ভাবও তাহার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। ইহাতে হেমনলিনীর উৎসাহে অনেকটা আঘাত পড়িল। কোনো এক সুযোগে সে রমেশকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আজ বড়ো যে দেরি করিয়া আসিলেন ?"

রমেশ অন্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হাঁ, আজকে একটু দেরি হইয়া গেছে বটে।"

হেমনলিনী আজ তাড়াতাড়ি করিয়া কত সকাল-সকাল চুল বাঁধিয়া লইয়াছে। চুল-বাঁধা, কাপড়-ছাড়ার পরে সে আজ কতবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়াছে—অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে করিয়াছে, তাহার ঘড়িটা ভুল চলিতেছে, এখনো বেশি দেরি হয় নাই। যখন এই বিশ্বাস রক্ষা করা একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন সে জানলার কাছে বসিয়া একটা সেলাই লইয়া কোনোমতে মনের অধৈর্য শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পরে রমেশ মুখ গম্ভীর করিয়া আসিল—কী কারণে দেরি হইয়াছে, তাহার কোনোপ্রকার জবাবদিহি করিল না—আজ সকাল-সকাল আসিবার যেন কোনো শর্তই ছিল না।

হেমনলিনী কোনোমতে চা-খাওয়া শেষ করিয়া লইল। ঘরের প্রান্তে একটি টিপাইয়ের উপরে কতকগুলি বই ছিল—হেমনলিনী কিছু বিশেষ উদ্যমের সহিত

রমেশের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক সেই বইগুলা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তখন হঠাৎ রমেশের চেতনা হইল; সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "ওগুলি কোথায় লইয়া যাইতেছেন ? আজ এক বার বইগুলি বাছিয়া লইবেন না ?"

হেমনলিনীর ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল। সে উদ্বেল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস বহুকষ্টে সংবরণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "থাক্ না, বই বাছিয়া কী আর হইবে।"

এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। উপরের শয়নঘরে গিয়া বইগুলা মেজের উপর ফেলিয়া দিল।

রমেশের মনটা আরও বিকল হইয়া গেল। অক্ষয় মনে মনে হাসিয়া কহিল, "রমেশবাবু, আপনার বোধ হয় শরীরটা আজ তেমন ভালো নাই ?"

রমেশ ইহার উত্তরে অর্ধস্ফুটস্বরে কী বলিল, ভালো বোঝা গেল না। শরীরের কথায় অন্নদাবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "সে তো রমেশকে দেখিয়াই আমি বলিয়াছি।"

অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "শরীরের প্রতি মনোযোগ করা রমেশবাবুর মতো লোকেরা বোধ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেন। উঁহারা ভাবরাজ্যের মানুষ—আহার হজম না হইলে তাহা লইয়া চেষ্টাচরিত্র করাটাকে গ্রাম্যতা বলিয়া জ্ঞান করেন।"

অন্নদাবাবু কথাটাকে গম্ভীরভাবে লইয়া বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, ভাবুক হইলেও হজম করাটা চাইই।

রমেশ নীরবে বসিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আমার পরামর্শ শুনুন—অন্নদাবাবুর পিল খাইয়া একটু সকাল-সকাল শুইতে যান।"

রমেশ কহিল, "অন্নদাবাবুর সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ কথা আছে, সেইজন্য আমি অপেক্ষা করিয়া আছি।"

অক্ষয় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "এই দেখুন, এ-কথা পূর্বে বলিলেই হইত। রমেশবাবু সকল কথা পেটে রাখিয়া দেন, শেষকালে সময় যখন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন ব্যস্ত হইয়া উঠেন।"

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ নিজের জুতাজোড়াটার প্রতি দুই নত চক্ষু বদ্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, "অন্নদাবাবু, আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতো আপনার ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিবার অধিকার দিয়াছেন, ইহা আমি যে কত সৌভাগ্যের

বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা আপনাকে মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি আমাদের যোগেনের বন্ধু, তোমাকে ঘরের ছেলে বলিয়া মনে করিব না তো কী করিব?"

ভূমিকা তো হইল, তাহার পরে কী বলিতে হইবে, রমেশ কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। অন্নদাবাবু রমেশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য কহিলেন, "রমেশ, তোমার মতো ছেলেকে ঘরের ছেলে করিতে পারা আমারই কি কম সৌভাগ্য!"

ইহার পরেও রমেশের কথা জোগাইল না।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখো না, তোমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোক অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে, হেমনলিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, এখন তাহার সঙ্গিনির্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমি তাহাদিগকে বলি, রমেশকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সে আমাদের উপরে কখনোই অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না।"

রমেশ। অন্নদাবাবু, আমার সম্বন্ধে আপনি সমস্তই তো জানেন, আপনি যদি আমাকে যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে—

অন্নদা। সে-কথা বলাই বাহুল্য। আমরা তো একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি—কেবল তোমার সাংসারিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে দিন স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু বাপু, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। সমাজে এ লইয়া ক্রমেই নানা কথার সৃষ্টি হইতেছে—সেটা যত শীঘ্র হয়, বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। কী বল?

রমেশ। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে। অবশ্য সর্বপ্রথমে আপনার কন্যার মত জানা আবশ্যক।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। কিন্তু সে একপ্রকার জানাই আছে। তবু কাল সকালেই সে-কথাটা পাকা করিয়া লইব।

রমেশ। আপনার শুইতে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, আজ তবে আসি।

অন্নদা। একটু দাঁড়াও। আমি বলি কী, আমরা জব্বলপুরে যাইবার আগেই তোমাদের বিবাহটা হইয়া গেলে ভালো হয়।

রমেশ। সে তো আর বেশি দেরি নাই।

অন্নদা। না, এখনো দিনদশেক আছে। আগামী রবিবারে যদি তোমাদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পরেও যাত্রার আয়োজনের জন্য দু-তিন দিন

সময় পাওয়া যাইবে। বুঝিয়াছ রমেশ, এত তাড়া করিতাম না,—কিন্তু আমার শরীরের জন্যই ভাবনা।

রমেশ সম্মত হইল এবং আর-একটা পিল গিলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

১৩

বিদ্যালয়ের ছুটি নিকটবর্তী। ছুটির সময়ে কমলাকে বিদ্যালয়েই রাখিবার জন্য রমেশ কর্ত্রীর সহিত পূর্বেই ঠিক করিয়াছিল।

রমেশ প্রত্যুষে উঠিয়া ময়দানের নির্জন রাস্তায় পদচারণা করিতে করিতে স্থির করিল, বিবাহের পর সে কমলা সম্বন্ধে হেমনলিনীকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিস্তারিত করিয়া বলিবে। তাহার পরে কমলাকেও সমস্ত কথা বলিবার অবকাশ হইবে। এইরূপ সকল পক্ষে বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা স্বচ্ছন্দে বন্ধুভাবে হেমনলিনীর সঙ্গেই বাস করিতে পারিবে। দেশে ইহা লইয়া নানা কথা উঠিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া সে হাজারিবাগে গিয়া প্র্যাকটিস করিবে স্থির করিয়াছে।

ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি গেল। সিঁড়িতে হঠাৎ হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা হইল। অন্যদিন হইলে এরূপ সাক্ষাতে একটু কিছু আলাপ হইত। আজ হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল,—সেই রক্তিমার মধ্য দিয়া একটা হাসির আভা উষার আলোকের মতো দীপ্তি পাইল—হেমনলিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ নিচু করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

রমেশ যে গৎটা হেমনলিনীর কাছ হইতে হারমোনিয়মে শিখিয়াছিল, বাসায় গিয়া সেইটে খুব করিয়া বাজাইতে লাগিল। কিন্তু একটিমাত্র গৎ সমস্তদিন বাজানো চলে না। কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিল—মনে হইল, তাহার ভালোবাসার সুর যে সুদূর উচ্চে উঠিতেছে, কোনো কবিতা সে-পর্যন্ত নাগাল পাইতেছে না।

আর হেমনলিনী অশ্রান্ত আনন্দের সহিত তাহার গৃহকর্ম সমস্ত সারিয়া নিভৃত দ্বিপ্রহরে শয়নঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সেলাইটি লইয়া বসিয়াছে। মুখের উপরে একটি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার শান্তি। একটি সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

চায়ের সময়ের পূর্বেই কবিতার বই এবং হারমোনিয়ম ফেলিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যদিন হেমনলিনীর সহিত দেখা হইতে বড়ো বিলম্ব হইত না। কিন্তু আজ চায়ের ঘরে দেখিল সে-ঘর শূন্য, দোতলায় বসিবার ঘরে দেখিল সে-ঘরও শূন্য, হেমনলিনী এখনো তাহার শয়নগৃহ ছাড়িয়া নামে নাই।

অন্নদাবাবু যথাসময়ে আসিয়া টেবিল অধিকার করিয়া বসিলেন। রমেশ ক্ষণে ক্ষণে চকিতভাবে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

পদশব্দ হইল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিল অক্ষয়। যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখাইয়া কহিল, "এই যে রমেশবাবু, আমি আপনার বাসাতেই গিয়াছিলাম।"

শুনিয়াই রমেশের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "ভয় কিসের রমেশবাবু? আপনাকে আক্রমণ করিতে যাই নাই। শুভসংবাদে অভিনন্দন প্রকাশ করা বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য—তাহাই পালন করিতে গিয়াছিলাম।"

এই কথায় অন্নদাবাবুর মনে পড়িল, হেমনলিনী উপস্থিত নাই। হেমনলিনীকে ডাক দিলেন—উত্তর না পাইয়া তিনি নিজে উপরে গিয়া কহিলেন, "হেম, এ কী, এখনো সেলাই লইয়া বসিয়া আছ? চা তৈরি যে। রমেশ-অক্ষয় আসিয়াছে।"

হেমনলিনী মুখ ঈষৎ লাল করিয়া কহিল, "বাবা, আমার চা উপরে পাঠাইয়া দাও —আজ আমি সেলাইটা শেষ করিতে চাই।"

অন্নদা। ওই তোমার দোষ হেম। যখন যেটা লইয়া পড়, তখন আর-কিছুই খেয়াল কর না। যখন পড়া লইয়া ছিলে, তখন বই কোল হইতে নামিত না—এখন সেলাই লইয়া পড়িয়াছ, এখন আর-সমস্তই বন্ধ। না না, সে হইবে না—চলো, নিচে গিয়া চা খাইবে চলো।

এই বলিয়া অন্নদাবাবু জোর করিয়াই হেমনলিনীকে নিচে লইয়া আসিলেন। সে আসিয়াই কাহারেও দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাড়াতাড়ি চা ঢালিবার ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অন্নদাবাবু অধীর হইয়া কহিলেন, "হেম, ও কী করিতেছ? আমার পেয়ালায় চিনি দিতেছ কেন? আমি তো কোনোকালেই চিনি দিয়া চা খাই না।"

অক্ষয় টিপিটিপি হাসিয়া কহিল, "আজ উনি ঔদার্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না—আজ সকলকেই মিষ্ট বিতরণ করিবেন।"

হেমনলিনীর প্রতি এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রমেশের মনে মনে অসহ্য হইল। সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিল, "আর যাই হউক, বিবাহের পরে অক্ষয়ের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখা হইবে না।"

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আপনার নামটা বদলাইয়া ফেলুন।"

রমেশ এই রসিকতার চেষ্টায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন বলুন দেখি।"

অক্ষয় খবরের কাগজ খুলিয়া কহিল, "এই দেখুন, আপনার নামের এক জন ছাত্র

অন্য লোককে নিজের নামে চালাইয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া পাস হইয়াছিল—হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে।”

হেমনলিনী জানে, রমেশ মুখের উপর উত্তর দিতে পারে না—সেইজন্য এতকাল অক্ষয় রমেশকে যত আঘাত করিয়াছে, সে-ই তাহার প্রতিঘাত দিয়া আসিয়াছে। আজও থাকিতে পারিল না। গূঢ় ক্রোধের লক্ষণ চাপিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, “অক্ষয় বলিয়া ঢের লোক বোধ হয় জেলখানায় আছে।”

অক্ষয় কহিল, “ওই দেখুন, বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিতে গেলে আপনারা রাগ করেন। তবে সমস্ত ইতিহাসটা বলি। আপনি তো জানেন, আমার ছোট বোন শরৎ বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। সে কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়া কহিল, ‘দাদা, তোমাদের রমেশবাবুর স্ত্রী আমাদের ইস্কুলে পড়েন।’

“আমি বলিলাম, ‘দূর পাগলী! আমাদের রমেশবাবু ছাড়া কি আর দ্বিতীয় রমেশবাবু জগতে নাই।’ শরৎ কহিল, ‘তা যেই হ’ন, তিনি তাঁর স্ত্রীর উপরে ভারি অন্যায় করিতেছেন। ছুটিতে প্রায় সব মেয়েই বাড়ি যাইতেছে,—তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোর্ডিঙে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে বেচারা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থপাত করিতেছে।’ আমি তখনি মনে মনে কহিলাম, ‘এ তো ভালো কথা নহে, শরৎ যেমন ভুল করিয়াছিল, এমন ভুল আরও তো কেহ কেহ করিতে পারে!’”

অন্নদাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, “অক্ষয়, তুমি কী পাগলের মতো কথা কহিতেছ। কোন্ রমেশের স্ত্রী ইস্কুলে পড়িয়া কাঁদিতেছে বলিয়া আমাদের রমেশ নাম বদলাইবে নাকি?”

এমন সময়ে হঠাৎ বিবর্ণমুখে রমেশ ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় বলিয়া উঠিল, “ও কী রমেশবাবু, আপনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন নাকি? দেখুন দেখি, আপনি কি মনে করেন আপনাকে আমি সন্দেহ করিতেছি?” বলিয়া রমেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “এ কী কাণ্ড!”

হেমনলিনী কাঁদিয়া ফেলিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “ও কী হেম, কাঁদিস কেন?”

সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “বাবা, অক্ষয়বাবুর ভারি অন্যায়। কেন উনি আমাদের বাড়িতে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপমান করেন?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয় ঠাট্টা করিয়া একটা কী বলিয়াছে, ইহাতে এত অস্থির হইবার কী দরকার ছিল?”

"এ-রকম ঠাট্টা অসহ্য।" বলিয়া দ্রুতপদে হেমনলিনী উপরে চলিয়া গেল।

এইবার কলিকাতায় আসার পর রমেশ বিশেষ যত্নের সহিত কমলার স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। বহুকষ্টে, ধোবাপুকুরটা কোন্ জায়গায়, তাহা বাহির করিয়া কমলার মামা তারিণীচরণকে এক পত্র লিখিয়াছিল।

উক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে রমেশ সেই পত্রের জবাব পাইল। তারিণীচরণ লিখিতেছেন, দুর্ঘটনার পরে তাঁহার জামাতা শ্রীমান্ নলিনাক্ষের কোনো সংবাদই পাওয়া যায় নাই। রংপুরে তিনি ডাক্তারি করিতেন—সেখানে চিঠি লিখিয়া তারিণীচরণ জানিয়াছেন, সেখানেও কেহ আজ পর্যন্ত তাঁহার কোনো খবর পায় নাই। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, তাহা তারিণীচরণের জানা নাই।

কমলার স্বামী নলিনাক্ষ যে বাঁচিয়া আছেন, এ-আশা আজ রমেশের মন হইতে একেবারে দূর হইল।

সকালে রমেশের হাতে আরও অনেকগুলা চিঠি আসিয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার আলাপী পরিচিত অনেকে তাহাকে অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছে। কেহ বা আহারের দাবি জানাইয়াছে, কেহ বা, এতদিন সমস্ত ব্যাপারটা সে গোপন রাখিয়াছে বলিয়া, রমেশকে সকৌতুক তিরস্কার করিয়াছে।

এমন সময়ে অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে চাকর একখানি চিঠি লইয়া রমেশের হাতে দিল। হাতের অক্ষর দেখিয়া রমেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল।

হেমনলিনীর চিঠি। রমেশ মনে করিল, "অক্ষয়ের কথা শুনিয়া হেমনলিনীর মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং তাহাই দূর করিবার জন্য সে রমেশকে পত্র লিখিয়াছে।"

চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কেবল এই কটি কথা লেখা আছে—

> "অক্ষয়বাবু কাল আপনার উপর ভারি অন্যায় করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, আজ সকালেই আপনি আসিবেন, কেন আসিলেন না? অক্ষয়বাবুর কথা কেন আপনি এত করিয়া মনে লইতেছেন? আপনি তো জানেন, আমি তাঁর কথা গ্রাহ্যই করি না। আপনি আজ সকাল-সকাল আসিবেন—আমি আজ সেলাই ফেলিয়া রাখিব।"

এই কটি কথার মধ্যে হেমনলিনীর সান্ত্বনাসুধাপূর্ণ কোমল হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিয়া রমেশের চোখে জল আসিল। রমেশ বুঝিল, কাল হইতেই হেমনলিনী রমেশের বেদনা শান্ত করিবার জন্য ব্যগ্রহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এমনি করিয়া রাত গিয়াছে, এমনি করিয়া সকালটা কাটিয়াছে, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এই চিঠিখানি লিখিয়াছে।

রমেশ কাল হইতে ভাবিতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া এইবার হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু কল্যকার ব্যাপারের পর বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন ঠিক শুনাইবে যেন অপরাধ ধরা পড়িয়া জবাবদিহির চেষ্টা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, অক্ষয়ের যে কতকটা জয় হইবে, সেও অসহ্য।

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলার স্বামী যে আর-কোনো রমেশ, নিশ্চয়ই অক্ষয়ের মনে সেই ধারণাই আছে—নহিলে সে এতক্ষণে কেবল ইঙ্গিত করিয়া থামিয়া থাকিত না, পাড়াসুদ্ধ গোল করিয়া বেড়াইত। অতএব এই বেলা যাহা-হয়-একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার।"

এমন সময় আর-একটা ডাকের চিঠি আসিল। রমেশ খুলিয়া দেখিল, সে-চিঠি স্ত্রীবিদ্যালয়ের কর্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, কমলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এ-অবস্থায় ছুটির সময় বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে রাখা তিনি সংগত বোধ করেন না। আগামী শনিবারে ইস্কুল হইয়া ছুটি হইবে, সেই সময়ে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

আগামী শনিবারে কমলাকে বিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিতে হইবে! আগামী রবিবারে রমেশের বিবাহ!

"রমেশবাবু, আমাকে মাপ করিতে হইবে," এই বলিয়া অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কহিল, "এমন একটা সামান্য ঠাট্টায় আপনি যে এত রাগ করিবেন, তাহা আগে জানিলে আমি ও-কথা তুলিতাম না। ঠাট্টার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেই লোকে চটিয়া ওঠে, কিন্তু যাহা একেবারে অমূলক, তাহা লইয়া আপনি সকলের সাক্ষাতে এত রাগারাগি করিলেন কেন? অন্নদাবাবু তো কাল হইতে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন—হেমনলিনী আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছেন। আজ সকালে তাঁহাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন। আমি এমন কী অপরাধ করিয়াছিলাম বলুন দেখি?"

রমেশ কহিল, "এ-সমস্ত বিচার যথাসময়ে হইবে। এখন আমাকে মাপ করিবেন—আমার বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে।"

অক্ষয়। রোশনচৌকির বায়না দিতে চলিয়াছেন বুঝি। এদিকে সময়সংক্ষেপ। আমি আপনার শুভকর্মে বাধা দিব না, চলিলাম।

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। আজ রমেশ সকাল-সকাল আসিবে, ইহা হেমনলিনী নিশ্চয় ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার

সেলাইয়ের ব্যাপারটি ভাঁজ করিয়া রুমালে বাঁধিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়াছিল। পাশে হারমোনিয়ম-যন্ত্রটি ছিল। আজ খানিকটা সংগীত-আলোচনা হইতে পারিবে, এইরূপ তাহার আশা ছিল ; তা ছাড়া, অব্যক্ত সংগীত তো আছেই।

রমেশ ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর মুখে একটি উজ্জ্বল-কোমল আভা পড়িল। কিন্তু সে-আভা মুহূর্তেই ম্লান হইয়া গেল যখন রমেশ আর-কোনো কথা না বলিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নদাবাবু কোথায় ?"

হেমনলিনী উত্তর করিল, "বাবা তাঁহার বসিবার ঘরে আছেন। কেন ? তাঁহাকে কি এখনি প্রয়োজন আছে ? তিনি তো সেই চা খাইবার সময় নামিয়া আসিবেন।"

রমেশ। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

হেমনলিনী। তবে যান, তিনি ঘরেই আছেন।

রমেশ চলিয়া গেল। প্রয়োজন আছে! সংসারে প্রয়োজনেরই কেবল সবুর সয় না! আর ভালোবাসাকেই দ্বারের বাহিরে অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

শরতের এই অম্লান দিন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আপন আনন্দ-ভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল। হেমনলিনী হারমোনিয়মের নিকট হইতে চৌকি সরাইয়া লইয়া টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছুঁচ ফুটিতে লাগিল কেবল বাহিরে নহে, ভিতরেও। রমেশের প্রয়োজনও শীঘ্র শেষ হইল না। প্রয়োজন রাজার মতো আপনার পুরা সময় লয়—আর ভালোবাসা কাঙাল !

১৪

রমেশ অন্নদাবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অন্নদাবাবু মুখের উপরে খবরের কাগজ চাপা দিয়া কেদারায় পড়িয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া কাসিতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া খবরের কাগজটা তুলিয়া ধরিয়াই কহিলেন, "দেখিয়াছ রমেশ, এবারে ওলাউঠায় কত লোক মরিয়াছে ?"

রমেশ কহিল, "বিবাহ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখিতে হইবে—আমার বিশেষ কাজ আছে।"

অন্নদাবাবুর মাথা হইতে শহরের মৃত্যুতালিকার বিবরণ একেবারে লুপ্ত হইয়া

গেল। ক্ষণকাল রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "সে কী কথা রমেশ। নিমন্ত্রণ যে হইয়া গেছে।"

রমেশ কহিল, "এই রবিবারের পরের রবিবারে দিন পিছাইয়া দিয়া আজই পত্র বিলি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

অন্নদা। রমেশ, তুমি আমাকে অবাক করিলে। একি মকদ্দমা যে, তোমার সুবিধা-মতো তুমি দিন পিছাইয়া মুলতুবি করিতে থাকিবে ? তোমার প্রয়োজনটা কী, শুনি।

রমেশ। সে অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন, বিলম্ব করিলে চলিবে না।

অন্নদাবাবু বাতাহত কদলীবৃক্ষের মতো কেদারার উপর হেলান দিয়া পড়িলেন—কহিলেন, "বিলম্ব করিলে চলিবে না! বেশ কথা, অতি উত্তম কথা! এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করো। নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা তোমার বুদ্ধিতে যাহা আসে, তাহাই হ'ক! লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি বলিব, 'আমি ও-সব কিছুই জানি না,—তাঁহার কী আবশ্যক, সে তিনিই জানেন, আর কবে তাঁহার সুবিধা হইবে, সে তিনিই বলিতে পারেন।' "

রমেশ উত্তর না করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমনলিনীকে সব কথা বলা হইয়াছে ?"

রমেশ। না, তিনি এখনো জানেন না।

অন্নদা। তাঁহার তো জানা আবশ্যক। তোমার তো একলার বিবাহ নয়।

রমেশ। আপনাকে আগে জানাইয়া তাঁহাকে জানাইব স্থির করিয়াছি।

অন্নদাবাবু ডাকিয়া উঠিলেন, "হেম, হেম।"

হেমনলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কী বাবা।"

অন্নদা। রমেশ বলিতেছেন, উঁহার কী-একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে, এখন উঁহার বিবাহ করিবার অবকাশ হইবে না।

হেমনলিনী এক বার বিবর্ণমুখে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ অপরাধীর মতো নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হেমনলিনীর কাছে এ-খবরটা যে এমন করিয়া দেওয়া হইবে, রমেশ তাহা প্রত্যাশা করে নাই। অপ্রিয় বার্তা অকস্মাৎ এইরূপ নিতান্ত রূঢ়ভাবে হেমনলিনীকে যে কিরূপ মর্মান্তিকরূপে আঘাত করিল, রমেশ তাহা নিজের ব্যথিত অন্তঃকরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু যে তীর এক বার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আর ফেরে না,—রমেশ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই নিষ্ঠুর তীর হেমনলিনীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

এখন কথাটা আর কোনোমতে নরম করিয়া লইবার উপায় নাই। সবই সত্য— বিবাহ এখন স্থগিত রাখিতে হইবে, রমেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কী প্রয়োজন, তাহাও সে বলিতে ইচ্ছা করে না। ইহার উপরে এখন আর নূতন ব্যাখ্যা কী হইতে পারে।

অন্নদাবাবু হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমাদেরই কাজ, এখন তোমরাই ইহার যা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লও।"

হেমনলিনী মুখ নত করিয়া বলিল, "বাবা, আমি ইহার কিছুই জানি না।" এই বলিয়া, ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্যাস্তের ম্লান আভাটুকু যেমন মিলাইয়া যায়, তেমনি করিয়া সে চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু খবরের কাগজ মুখের উপর তুলিয়া পড়িবার ভান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রমেশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রমেশ একসময় চমকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বসিবার বড়ো ঘরে গিয়া দেখিল, হেমনলিনী জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার ছুটির কলিকাতা জোয়ারের নদীর মতো তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চল-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শরতের অপরাহ্ণ-আলোকে বাতায়ন-বর্তিনী এই স্তব্ধমূর্তিটি রমেশের মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গি, ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি, তাহারই নিচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বাম স্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিম প্রান্ত, সমস্তই রেখায় রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

রমেশ আস্তে আস্তে হেমনলিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমনলিনী রমেশের চেয়ে রাস্তার লোকদের জন্য যেন বেশি ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। রমেশ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

রমেশের কণ্ঠস্বরে উদ্বেল বেদনার আঘাত অনুভব করিয়া মুহূর্তের মধ্যে হেমনলিনীর মুখ ফিরিয়া আসিল। রমেশ বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না।" রমেশ এই প্রথম হেমনলিনীকে 'তুমি' বলিল। "এই কথা আমাকে বলো যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না। আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না।"

রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল। তখন হেমনলিনী তাহার স্নিগ্ধকরুণ দুই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর দুই কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়নতলে দুই জনের মধ্যে একটি বাক্যবিহীন শান্তি ও সান্ত্বনার স্বর্গখণ্ড সৃজিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ এই অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌনের মধ্যে হৃদয়মন নিমগ্ন রাখিয়া একটি আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, "কেন আমি এখন সপ্তাহের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি জানিতে চাও?"

হেমনলিনী নীরবে মাথা নাড়িল—সে জানিতে চায় না।

রমেশ কহিল, "বিবাহের পরে আমি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিব।"

এই কথাটায় হেমনলিনীর কপোলের কাছটা একটুখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

আজ আহারান্তে হেমনলিনী যখন রমেশের সহিত মিলনপ্রত্যাশায় উৎসুকচিত্তে সাজ করিতেছিল, তখন সে অনেক হাসিগল্প, অনেক নিভৃত পরামর্শ, অনেক ছোটো-খাটো সুখের ছবি কল্পনায় সৃজন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এই যে অল্প কয় মুহূর্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা বদল হইয়া গেল—এই যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্তা কিছুই হইল না, কিছুক্ষণের জন্য দুই জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল—ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

হেমনলিনী কহিল, "তুমি এক বার বাবার কাছে যাও, তিনি বিরক্ত হইয়া আছেন।"

রমেশ প্রফুল্লচিত্তে সংসারের ছোটো-বড়ো আঘাত-সংঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেল।

১৫

অন্নদাবাবু রমেশকে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

রমেশ কহিল, "নিমন্ত্রণের ফর্দটা যদি আমার হাতে দেন, তবে দিনপরিবর্তনের চিঠিগুলি আজই রওনা করিয়া দিতে পারি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "তবে দিনপরিবর্তনই স্থির রহিল?"

রমেশ কহিল, "হাঁ, অন্য উপায় আর কিছুই দেখি না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখো বাপু, তবে আমি ইহার মধ্যে নাই। যাহা-কিছু বন্দোবস্ত করিবার, সে তুমিই করিয়ো। আমি লোক হাসাইতে পারিব না। বিবাহ-ব্যাপারটাকে যদি নিজের মর্জি অনুসারে ছেলেখেলা করিয়া তোল, তবে আমার মতো বয়সের লোকের ইহার মধ্যে না থাকাই ভালো। এই লও তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ। ইতিমধ্যে আমি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার অনেকটাই নষ্ট হইবে। এমনি করিয়া বার বার টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারি, এমন সংগতি আমার নাই।"

রমেশ সমস্ত ব্যয় ও ব্যবস্থার ভার নিজের স্কন্ধে লইতেই প্রস্তুত হইল। সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অন্নদাবাবু কহিলেন, "রমেশ, বিবাহের পরে তুমি কোথায় প্র্যাকটিস করিবে, কিছু স্থির করিয়াছ? কলিকাতায় নয়?"

রমেশ কহিল, "না। পশ্চিমে একটা ভালো জায়গার সন্ধান করিতেছি।"

অন্নদা। সেই ভালো, পশ্চিমই ভালো। এটোয়া তো মন্দ জায়গা নয়। সেখানকার জল হজমের পক্ষে অতি উত্তম—আমি সেখানে মাসখানেক ছিলাম—সেই এক মাসে আমার আহারের পরিমাণ ডবল বাড়িয়া গিয়াছিল। দেখো বাপু, সংসারে আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে—আমি সর্বদা উহার কাছে-কাছে না থাকিলে সে-ও সুখী হইবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাই আমার ইচ্ছা, তোমাকে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে।

অন্নদাবাবু রমেশের একটা অপরাধের অবকাশ পাইয়া সেই সুযোগে নিজের বড়ো বড়ো দাবিগুলা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সে-সময়ে রমেশকে তিনি যদি এটোয়া না বলিয়া গারো বা চেরাপুঞ্জির কথা বলিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ সে রাজি হইত। সে কহিল, "যে আজ্ঞা, আমি এটোয়াতেই প্র্যাকটিস করিব।" এই বলিয়া রমেশ নিমন্ত্রণপ্রত্যাখ্যানের কার্যভার লইয়া প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে অক্ষয় ঘরে ঢুকিতেই অন্নদাবাবু কহিলেন, "রমেশ তাহার বিবাহের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিয়াছে!"

অক্ষয়। না না, আপনি বলেন কী। সে কি কখনো হইতে পারে? পরশু যে বিবাহ।

অন্নদা। হইতে তো না পারাই উচিত ছিল—সাধারণ লোকের তো এমনতরো হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাদের যে-রকম কাণ্ড দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

অক্ষয় অত্যন্ত মুখ গম্ভীর করিয়া আড়ম্বর-সহকারে চিন্তা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কহিল, "আপনারা যাহাকে এক বার সৎপাত্র বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুটি চক্ষু বুজিয়া থাকেন। মেয়েকে যাহার হাতে চিরদিনের মতো সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, ভালো করিয়া তাহার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা উচিত। হ'ক না কেন সে স্বর্গের দেবতা, তবু সাবধানের বিনাশ নাই।"

অন্নদা। রমেশের মতো ছেলেকেও যদি সন্দেহ করিয়া চলিতে হয়, তবে তো সংসারে কাহারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অক্ষয়। আচ্ছা, এই যে দিন পিছাইয়া দিতেছেন, রমেশবাবু তাহার কারণ কিছু বলিয়াছেন?

অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "না, কারণ তো কিছুই বলিল না—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বিশেষ দরকার আছে।"

অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পরে কহিল, "বোধ হয় আপনার মেয়ের কাছে রমেশবাবু একটা কারণ নিশ্চয় কী বলিয়াছেন।"

অন্নদা। সম্ভব বটে।

অক্ষয়। তাঁহাকে এক বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে ভালো হয় না?

"ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া অন্নদাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেমনলিনীকে ডাক দিলেন। হেমনলিনী ঘরে ঢুকিয়া অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার বাপের পাশে এমন করিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে অক্ষয় তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহের দিন যে হঠাৎ পিছাইয়া গেল, রমেশ তাহার কারণ তোমাকে কিছু বলিয়াছেন?"

হেমনলিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না।"

অন্নদা। তুমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই?

হেমনলিনী। না।

অন্নদা। আশ্চর্য ব্যাপার। যেমন রমেশ, তুমিও দেখি তেমনি। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'আমার বিবাহে ফুরসৎ হইতেছে না'—তুমিও বলিলে, 'বেশ ভালো, আর-এক দিন হইবে!' বাস্, আর কোনো কথাবার্তা নাই!

অক্ষয় হেমনলিনীর পক্ষ লইয়া কহিল, "এক জন লোক যখন স্পষ্টই কারণ গোপন করিতেছে, তখন সে-কথা লইয়া তাহাকে কি কোনো প্রশ্ন করা ভালো দেখায়? যদি বলিবার মতো কিছু হইত, তবে তো রমেশবাবু আপনিই বলিতেন।"

হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে কহিল, "এই বিষয় লইয়া আমি বাহিরের

লোকের কাছে কোনো কথাই শুনিতে চাই না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই।"

এই বলিয়া হেমনলিনী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অক্ষয় পাংশু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "সংসারে বন্ধুর কাজটাতেই সব চেয়ে লাঞ্ছনা বেশি। সেইজন্যই আমি বন্ধুত্বের গৌরব বেশি অনুভব করি। আপনারা আমাকে ঘৃণা করুন আর গালি দিন, রমেশকে সন্দেহ করাই আমি বন্ধুর কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের যেখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখি, সেখানে আমি অসংশয়ে থাকিতে পারি না—আমার এই একটা মস্ত দুর্বলতা আছে, এ-কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাই হ'ক, যোগেন তো কালই আসিতেছে, সে-ও যদি সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিজের বোনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, তবে এ-বিষয়ে আমি আর কোনো কথা কহিব না।"

রমেশের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে, অন্নদাবাবু এ-কথা একেবারে বোঝেন না, তাহা নহে—কিন্তু যাহা অগোচরে আছে, তাহাকে বলপূর্বক আলোড়িত করিয়া তাহার মধ্য হইতে হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝা আবিষ্কারের সম্ভাবনায় তিনি স্বভাবত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করেন না।

অক্ষয়ের উপর তাঁহার রাগ হইল। তিনি কহিলেন, "অক্ষয়, তোমার স্বভাবটা বড়ো সন্দিগ্ধ। প্রমাণ না পাইয়া কেন তুমি—"

অক্ষয় আপনাকে দমন করিতে জানে, কিন্তু উত্তরোত্তর আঘাতে আজ তাহার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "দেখুন অন্নদাবাবু, আমার অনেক দোষ আছে। আমি সৎপাত্রের প্রতি ঈর্ষা করি, আমি সাধুলোককে সন্দেহ করি। ভদ্রলোকের মেয়েদের ফিলজফি পড়াইবার মতো বিদ্যা আমার নাই এবং তাঁহাদের সহিত কাব্য আলোচনা করিবার স্পর্ধাও আমি রাখি না—আমি সাধারণ দশ জনের মধ্যেই গণ্য—কিন্তু চিরদিন আমি আপনাদের প্রতি অনুরক্ত, আপনাদের অনুগত। রমেশবাবুর সঙ্গে আর-কোনো বিষয়ে আমার তুলনা হইতে পারে না—কিন্তু এইটুকুমাত্র অহংকার আমার আছে, আপনাদের কাছে কোনোদিন আমার কিছু লুকাইবার নাই। আপনাদের কাছে আমার সমস্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া আমি ভিক্ষা চাহিতে পারি, কিন্তু সিঁদ কাটিয়া চুরি করা আমার স্বভাব নহে। এ-কথার কী অর্থ, তাহা কালই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।"

১৬

চিঠি বিলি করিয়া দিতে রাত হইয়া পড়িল। রমেশ শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনের ভিতরে গঙ্গাযমুনার মতো সাদা-কালো দুই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটার কল্লোল একসঙ্গে মিশিয়া তাহার বিশ্রামক্ষণকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

বারকয়েক পাশ ফিরিয়া সে উঠিয়া পড়িল। জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহাদের জনশূন্য গলির এক পাশে বাড়িগুলির ছায়া, আর-এক পাশে শুভ্র জ্যোৎস্নার রেখা।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা নিত্য, যাহা শান্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী, যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, রমেশের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি বিগলিত হইয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। যে শব্দবিহীন সীমাবিহীন মহালোকের নেপথ্য হইতে চিরকাল ধরিয়া জন্ম এবং মৃত্যু, কর্ম এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, কোন্ অশ্রুত সংগীতের অপরূপ তালে বিশ্বরঙ্গভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—রমেশ সেই আলো-অন্ধকারের অতীত দেশ হইতে নরনারীর যুগল প্রেমকে এই নক্ষত্রদীপালোকিত নিখিলের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিল।

রমেশ তখন ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠিল। অন্নদাবাবুর বাড়ির দিকে চাহিল। সমস্ত নিস্তব্ধ। বাড়ির দেয়ালের উপরে, কার্নিসের নিচে, জানলা-দরজার খাঁজের মধ্যে, চুনবালিখসা ভিতের গায়ে জ্যোৎস্না এবং ছায়া বিচিত্র আকারের রেখা ফেলিয়াছে।

এ কী বিস্ময়। এই জনপূর্ণ নগরের মধ্যে ওই সামান্য গৃহের ভিতরে একটি মানবীর বেশে এ কী বিস্ময়। এই রাজধানীতে কত ছাত্র, কত উকিল, কত প্রবাসী ও নিবাসী আছে, তাহার মধ্যে রমেশের মতো এক জন সাধারণ লোক কোথা হইতে এক দিন আশ্বিনের পীতাভ রৌদ্রে ওই বাতায়নে একটি বালিকার পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া জীবনকে ও জগৎকে এক অপরিসীম-আনন্দময় রহস্যের মাঝখানে ভাসমান দেখিল —এ কী বিস্ময়। হৃদয়ের ভিতরে আজ এ কী বিস্ময়, হৃদয়ের বাহিরে আজ এ কী বিস্ময়।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত রমেশ ছাদে বেড়াইল। ধীরে ধীরে কখন একসময়ে খণ্ড-চাঁদ সম্মুখের বাড়ির আড়ালে নামিয়া গেল। পৃথিবীতলে রাত্রির কালিমা ঘনীভূত হইল—আকাশ তখনো বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুবর্ণ।

রমেশের ক্লান্ত শরীর শীতে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ একটা আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল, জীবনের রণক্ষেত্রে কাল আবার সংগ্রাম করিতে বাহির হইতে হইবে। ওই আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চেষ্টার চাঞ্চল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তব্ধ শান্ত, বিশ্বপ্রকৃতি ওই অগণ্য নক্ষত্রলোকের চিরকর্মের মধ্যে চিরবিশ্রামে বিলীন—তবু মানুষের আনাগোনা-যোঝাযুঝির অন্ত নাই, সুখে-দুঃখে বাধায়-বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত। এক দিকে অনন্তের ঐ নিত্য শান্তি, আর-এক দিকে সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম—দুই একই কালে একসঙ্গে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, দুশ্চিন্তার মধ্যেও রমেশের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে রমেশ বিশ্বলোকের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রেমের যে একটি শাশ্বত সম্পূর্ণ শান্ত মূর্তি দেখিয়াছিল, সেই প্রেমকেই ক্ষণকাল পরে সংসারের সংঘর্ষে, জীবনের জটিলতায় পদে-পদে ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ দেখিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মায়া!

১৭

পরদিন সকালের গাড়িতে যোগেন্দ্র পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিল। আজ শনিবার, কাল রবিবারে হেমনলিনীর বিবাহের কথা। কিন্তু যোগেন্দ্র তাহাদের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া উৎসবের স্বাদগন্ধ কিছুই পাইল না। যোগেন্দ্র মনে করিয়া আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহাদের বাসার বারান্দার উপর দেবদারুপাতার মালা ঝোলানো শুরু হইয়াছে—কাছে আসিয়া দেখিল, শ্রীহীন মালিন্যে পাশের বাড়ির সঙ্গে তাহাদের বাড়ির কোনো প্রভেদ নাই।

ভয় হইল, পাছে কাহারও অসুখ-বিসুখ করিয়া থাকে। বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চায়ের টেবিলে তাহার জন্য আহারাদি প্রস্তুত রহিয়াছে এবং অন্নদাবাবু অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

যোগেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "হেম কেমন আছে?"

অন্নদা। ভালো।

যোগেন্দ্র। বিবাহের কী হইল?

অন্নদা। কাল রবিবারের পরের রবিবারে হইবে।

যোগেন্দ্র। কেন?

অন্নদা। কেন, তাহা তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো। রমেশ আমাদের কেবল

এইটুকু জানাইয়াছে যে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে,—এ রবিবারে বিবাহ বন্ধ রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র তাহার অক্ষম বাপের উপরে মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবা, আমি না থাকিলে তোমাদের নানান গলদ ঘটে। রমেশের আবার প্রয়োজন কিসের ? সে স্বাধীন। তাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই বলিলেই হয়। যদি তাহার বৈষয়িক বিশেষ কোনো গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সে-কথা খুলিয়া বলিবার কোনো বাধা দেখি না। রমেশকে তুমি এত সহজে ছাড়িয়া দিলে কেন ?"

অন্নদা। আচ্ছা বেশ তো, সে তো এখনো পালায় নাই—তুমিই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দেখো না।

যোগেন্দ্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক পেয়ালা গরম চা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "আহা, যোগেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের। তোমার যে খাওয়া হইল না।"

সে-কথা যোগেন্দ্রের কানে পৌঁছিল না। সে রমেশের বাসায় ঢুকিয়া সশব্দ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। "রমেশ, রমেশ।" রমেশের কোনো সাড়া নাই। ঘরে ঘরে খুঁজিয়া দেখিল, রমেশ শুইবার ঘরে নাই, বসিবার ঘরে নাই, ছাদে নাই, একতলায় নাই। অনেক ডাকাডাকির পর বেহারাটাকে সন্ধান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় ?"

বেহারা কহিল, "বাবু তো ভোরে বাহির হইয়া গেছেন।"

যোগেন্দ্র। কখন আসিবে ?

বেহারা জানাইল—বাবু তাঁহার কতক-কতক কাপড়চোপড় লইয়া চলিয়া গেছেন। বলিয়া গেছেন, ফিরিয়া আসিতে তাঁহার চার-পাঁচ দিন দেরি হইতে পারে। কোথায় গেছেন, তাহা বেহারা জানে না।

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল ?"

যোগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, "হইবে আর কী, যাহার সঙ্গে আজ-বাদে-কাল মেয়ের বিবাহ দিবে, তাহার কী কাজ পড়িয়াছে, সে কখন কোথায় থাকে, তাহার খোঁজখবর তোমরা কিছুই রাখ না। অথচ তোমার বাড়ির পাশেই তাহার বাসা।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কেন, কাল রাত্রেও তো রমেশ ওই বাসাতেই ছিল।"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমরা জান না সে কোথায় যাইবে, তাহার

বেহারা জানে না সে কোথায় গেছে, এ কী রকম লুকোচুরি ব্যাপার চলিতেছে? আমার কাছে এ তো কিছুই ভালো ঠেকিতেছে না। বাবা, তুমি এমন নিশ্চিন্ত আছ কী করিয়া?"

অন্নদাবাবু এই ভর্ৎসনায় হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইবার চেষ্টা করিলেন। গম্ভীর মুখ করিয়া কহিলেন, "তাই তো, এ-সব কী?"

কাণ্ডজ্ঞানহীন রমেশ অনায়াসে কাল রাত্রে অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে-কথা তাহার মনে উদয়ও হয় নাই। ওই যে সে "বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যেই তাহার সকল কথা বলা হইয়া গেছে, এইরূপ রমেশের ধারণা। ওই এক কথাতেই আপাতত সকল রকমের ছুটি পাইয়াছে জানিয়া সে তাহার উপস্থিত কর্তব্যসাধনে বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনী কোথায়?

অন্নদাবাবু। সে আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া উপরেই গেছে।

যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশের এই সমস্ত অদ্ভুত আচরণে বেচারা বোধ হয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আছে—সেইজন্য সে আমার সঙ্গে দেখা হইবার ভয়ে পালাইয়া রহিয়াছে।"

সংকুচিত ও ব্যথিত হেমনলিনীকে আশ্বাস দিবার জন্য যোগেন্দ্র উপরে গেল। হেমনলিনী তাহাদের বড়ো ঘরে চৌকির উপরে চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিল। যোগেন্দ্রের পদশব্দ শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার ভান করিল। যোগেন্দ্র ঘরে আসিতেই বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল, "এই যে, দাদা কখন এলে? তোমাকে তো তেমন বিশেষ ভালো দেখাইতেছে না।"

যোগেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া-পড়িয়া কহিল, "ভালো দেখাইবার তো কথা নয়। আমি সব কথা শুনিয়াছি হেম। কিন্তু এ-সম্বন্ধে তুমি কোনো চিন্তা করিয়ো না। আমি ছিলাম না বলিয়াই এই রকম গোলমাল ঘটিতে পারিয়াছে। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব। আচ্ছা হেম, রমেশ তোমাকে কোনো কারণ বলে নাই?"

হেমনলিনী মুশকিলে পড়িল। রমেশ সম্বন্ধে এই সকল সন্দিগ্ধ আলোচনা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ তাহাকে বিবাহদিন পিছাইবার কোনো কারণ বলে নাই, এ-কথা যোগেন্দ্রকে বলিতে তাহার ইচ্ছা নাই, অথচ মিথ্যা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। হেমনলিনী কহিল, "তিনি আমাকে কারণ বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, আমি শোনা দরকার মনে করি নাই।"

যোগেন্দ্র মনে করিল, ইহা গুরুতর অভিমানের কথা এবং এরূপ অভিমান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কহিল, "আচ্ছা, তুমি কিছুই ভয় করিয়ো না, 'কারণ' আমি আজই বাহির করিয়া আনিব।"

হেমনলিনী কোলের বইখানার পাতা অনাবশ্যক উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কহিল, "দাদা, আমি ভয় কিছুই করি না। 'কারণ' বাহির করিবার জন্য তুমি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কর, এমন আমার ইচ্ছা নয়।"

যোগেন্দ্র ভাবিল, ইহাও অভিমানের কথা। কহিল, "আচ্ছা, সে তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।" বলিয়া তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

হেমনলিনী তখনই চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল,—"না দাদা, এ-কথা লইয়া তুমি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে যাইতে পারিবে না। তোমরা তাঁহাকে যাহাই মনে কর না কেন, আমি তাঁহাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না।"

তখন যোগেন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, এ তো অভিমানের মতো শুনাইতেছে না। তখন স্নেহমিশ্রিত করুণায় তাহার মনে মনে হাসি পাইল। ভাবিল, "ইহাদের সংসারের জ্ঞান কিছুই নাই। এদিকে পড়াশুনা এত করিয়াছে, পৃথিবীর খোঁজখবরও অনেক রাখে; কিন্তু কোন্‌খানে সন্দেহ করিতে হইবে, সে-অভিজ্ঞতাটুকুও ইহার হয় নাই।" এই নিঃসংশয় নির্ভরের সহিত রমেশের ছদ্মব্যবহারের তুলনা করিয়া যোগেন্দ্র মনে মনে রমেশের উপর আরও চটিয়া উঠিল। 'কারণ' বাহির করিবার প্রতিজ্ঞা তাহার মনে আরও দৃঢ় হইল। যোগেন্দ্র দ্বিতীয় বার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেমনলিনী কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে, তাঁহার কাছে এ-সব কথা একেবারে উত্থাপনমাত্র করিবে না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "সে দেখা যাইবে।"

হেমনলিনী। না দাদা, দেখা যাইবে না। আমার কাছে কথা দিয়া যাও। আমি তোমাদের নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের কোনো চিন্তার বিষয় নাই। একটিবার আমার এই একটি কথা রাখো।"

হেমনলিনীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া যোগেন্দ্র ভাবিল, "তবে নিশ্চয় রমেশ হেমের কাছে সকল কথা বলিয়াছে। কিন্তু হেমকে যাহা-তাহা বলিয়া ভুলানো তো শক্ত নয়।" কহিল, "দেখো হেম, অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে তো। তোমার সঙ্গে তার যদি কিছু বোঝাপড়া হইয়া থাকে, সে তোমরাই জান, কিন্তু সেই হইলেই তো যথেষ্ট হইল না—আমাদের সঙ্গেও তাহার বোঝাপড়া করিবার আছে। সত্য কথা বলিতে কি হেম, এখন তোমার চেয়ে

আমাদেরই সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ার সম্পর্ক বেশি—বিবাহ হইয়া গেলে তখন আমাদের বেশি কথা বলিবার থাকিবে না।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ভালোবাসা যে আড়াল, যে আবরণ খোঁজে, সে আর রহিল না। হেমনলিনী ও রমেশের যে-সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ-ভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া দুই জনকে কেবল দুই জনেরই করিয়া দিবে, আজ তাহারই উপরে দশ জনের সন্দেহের কঠিন স্পর্শ আসিয়া বারাংবার আঘাত করিতেছে। চারিদিকের এই সকল আন্দোলনের অভিঘাতে হেমনলিনী এমনি ব্যথিত হইয়া আছে যে, আত্মীয়বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎমাত্রও তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে। যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে হেমনলিনী চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র বাহিরে যাইতেই অক্ষয় আসিয়া কহিল, "এই যে, যোগেন আসিয়াছ। সব কথা শুনিয়াছ তো? এখন তোমার কী মনে হইতেছে?"

যোগেন্দ্র। মনে তো অনেকরকম হইতেছে, সে-সমস্ত অনুমান লইয়া মিথ্যা বাদানুবাদ করিয়া কী হইবে? এখন কি চায়ের টেবিলে বসিয়া মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার সময়?

অক্ষয়। তুমি তো জানই সূক্ষ্ম আলোচনাটা আমার স্বভাব নয়, তা মনস্তত্ত্বই বল, দর্শনই বল, আর কাব্যই বল। আমি কাজের কথাই বুঝি ভালো—তোমার সঙ্গে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

অধীরস্বভাব যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, কাজের কথা হবে। এখন বলিতে পার, রমেশ কোথায় গেছে?"

অক্ষয় কহিল, "পারি।"

যোগেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

অক্ষয় কহিল, "এখন সে আমি তোমাকে বলিব না—আজ তিনটার সময় একে-বারে তোমাকে রমেশের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "কাণ্ডখানা কী বলো দেখি? তোমরা সবাই যে মূর্তিমান হেঁয়ালি হইয়া উঠিলে। আমি এই ক-দিন মাত্র বেড়াইতে গেছি, সেই সুযোগে পৃথিবীটা এমন ভয়ানক রহস্যময় হইয়া উঠিল! না না অক্ষয়, অমন ঢাকাঢাকি করিলে চলিবে না।"

অক্ষয়। শুনিয়া খুশি হইলাম। ঢাকাঢাকি করি নাই বলিয়া আমার পক্ষে এক-প্রকার অচল হইয়া উঠিয়াছে—তোমার বোন তো আমার মুখ-দেখা বন্ধ করিয়াছেন, তোমার বাবা আমাকে সন্দিগ্ধপ্রকৃতি বলিয়া গালি দেন, আর রমেশবাবুও আমার

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন না। এখন কেবল তুমিই বাকি আছ। তোমাকে আমি ভয় করি—তুমি সূক্ষ্ম আলোচনার লোক নও, মোটা কাজটাই তোমার সহজে আসে—আমি কাহিল মানুষ, তোমার ঘা আমার সহ্য হইবে না।

যোগেন্দ্র। দেখো অক্ষয়, তোমার ঐ সকল প্যাঁচালো চাল আমার ভালো লাগে না। বেশ বুঝিতেছি, একটা কী খবর তোমার বলিবার আছে, সেটাকে আড়াল করিয়া অমন দরবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? সরলভাবে বলিয়া ফেলো, চুকিয়া যাক।

অক্ষয়। আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে গোড়া হইতেই বলি—তুমি অনেক কথাই জান না।

১৮

রমেশ দরজিপাড়ায় যে বাসায় ছিল, সে বাসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহা আর কাহাকেও ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে রমেশ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। সে এই কয়েক মাস সংসারের বাহিরে উধাও হইয়া গিয়াছিল, লাভক্ষতিকে বিচারের মধ্যেই আনে নাই।

আজ সে প্রত্যুষে সেই বাসায় গিয়া ঘর-দুয়ার সাফ করাইয়া লইয়াছে, তক্তপোশের উপর বিছানা পাতাইয়াছে এবং আহারাদিরও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ ইস্কুলের ছুটির পর কমলাকে আনিতে হইবে।

সে এখনো দেরি আছে। ইতিমধ্যে রমেশ তক্তপোশের উপর চিত হইয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। এটোয়া সে কখনো দেখে নাই – কিন্তু পশ্চিমের দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন নহে। শহরের প্রান্তে তাহার বাড়ি—তরুশ্রেণীদ্বারা ছায়াখচিত বড়ো রাস্তা তাহার বাগানের ধার দিয়া চলিয়া গেছে—রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মাঝে-মাঝে কূপ, মাঝে-মাঝে পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্য মাচা বাঁধা। ক্ষেত্র-সেচনের জন্য গোরু দিয়া জল তোলা হইতেছে, সমস্ত মধ্যাহ্নে তাহার করুণ শব্দ শোনা যায়—রাস্তা দিয়া প্রচুর ধুলা উড়াইয়া মাঝে-মাঝে একাগাড়ি ছুটিয়াছে, তাহার ঝনঝন শব্দে রৌদ্রদগ্ধ আকাশ জাগিয়া উঠিতেছে। এই সুদূর প্রবাসের প্রখর তাপ, উদাস মধ্যাহ্ন ও শূন্য নির্জনতার মধ্যে সে তাহার রুদ্ধদ্বার বাংলাঘরে সমস্তদিন হেমনলিনীকে একা কল্পনা করিতে গেলে ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পাশে চির-সখীরূপে কমলাকে দেখিয়া সে আরামবোধ করিল।

রমেশ ঠিক করিয়াছে, এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না। বিবাহের পর হেমনলিনী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সুযোগ বুঝিয়া সকরুণ স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে,—যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব, কমলার জীবনের এই জটিল রহস্যজাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পরে সেই দূর বিদেশে তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে, কোনোপ্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।

তখন দ্বিপ্রহরে গলি নিস্তব্ধ ;—যাহারা আপিসে যাইবার, তাহারা আপিসে গেছে, যাহারা না যাইবার, তাহারা দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। অনতিতপ্ত আশ্বিনের মধ্যাহ্নটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে—আগামী ছুটির উল্লাস এখনি যেন আকাশকে আনন্দের আভাস দিয়া মাখাইয়া রাখিয়াছে। রমেশ তাহার নির্জন বাসায় নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সুখের ছবি উত্তরোত্তর ফলাও করিয়া আঁকিতে লাগিল।

এমন সময়ে খুব একটা ভারি গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সে-গাড়ি রমেশের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিল। রমেশ বুঝিল, ইস্কুলের গাড়ি কমলাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিতেছে। তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমলাকে কিরূপ দেখিবে, তাহার সঙ্গে কী ভাবে কথাবার্তা হইবে, কমলাই বা রমেশকে কী ভাবে গ্রহণ করিবে, হঠাৎ এই চিন্তা তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

নিচে তাহার দুই জন চাকর ছিল—প্রথমে তাহারা ধরাধরি করিয়া কমলার তোরঙ্গ লইয়া আসিয়া বারান্দায় রাখিল—তাহার পশ্চাতে কমলা ঘরের দ্বারের সম্মুখ পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে প্রবেশ করিল না।

রমেশ কহিল, "কমলা, ঘরে এস।"

কমলা একটা সংকোচের আক্রমণ কাটাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছুটির সময়ে রমেশ তাহাকে বিদ্যালয়ে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কান্নাকাটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই ঘটনায় এবং কয়েক মাসের বিচ্ছেদে রমেশের সঙ্গে তাহার যেন একটু মনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। তাই কমলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া একটুখানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা দরজার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

রমেশ কমলাকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল। যেন তাহাকে আর-এক বার নূতন করিয়া দেখিল। এই কয় মাসে তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনতি-পল্লবিতা লতার মত সে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির অপরিস্ফুট সর্বাঙ্গে প্রচুর স্বাস্থ্যের যে একটি পরিপুষ্টতা ছিল, সে কোথায় গেল? তাহার গোলগাল

মুখটি ঝরিয়া লম্বা হইয়া একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার গালদুটি পূর্বের শ্যামাভ চিক্কণতা ত্যাগ করিয়া কোমল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহার গতিবিধি-ভাবভঙ্গিতে কোনোপ্রকার জড়তা নাই। আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে ঋজুদেহে ঈষৎ-বঙ্কিম-মুখে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপরে শরৎ-মধ্যাহ্নের আলো আসিয়া পড়িল, তাহার মাথায় কাপড় নাই, অগ্রভাগে লাল ফিতার গ্রন্থিবাঁধা বেণীটি পিঠের উপরে পড়িয়াছে, ফিকে হলদে রঙের মেরিনোর শাড়ি তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আঁটিয়া বেষ্টন করিয়াছে—তখন রমেশ তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কমলার সৌন্দর্য এই কয় মাসে রমেশের মনে আবছায়ার মতো হইয়া আসিয়াছিল, আজ সেই সৌন্দর্য নবতর বিকাশ লাভ করিয়া হঠাৎ তাহাকে চমক লাগাইয়া দিল। সে যেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

রমেশ কহিল, "কমলা, বসো।"

কমলা একটা চৌকিতে বসিল। রমেশ কহিল, "ইস্কুলে তোমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে ?"

কমলা অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল, "বেশ।"

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "এইবার কী বলা যাইবে।" হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—কহিল, "বোধ হয় অনেকক্ষণ খাও নাই। তোমার খাবার তৈরি আছে। এইখানেই আনিতে বলি ?"

কমলা কহিল, "খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।"

রমেশ কহিল, "একটু কিছু খাইবে না ? মিষ্ট না খাও তো ফল আছে—আতা, আপেল, বেদানা—"

কমলা কোনো কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল।

রমেশ আর-এক বার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কমলা তখন ঈষৎ মুখ নত করিয়া তাহার ইংরেজিশিক্ষার বহি হইতে ছবি দেখিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মতো নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্যকে জাগাইয়া তোলে। শরতের আলোক হঠাৎ যেন প্রাণ পাইল, আশ্বিনের দিন যেন আকার ধারণ করিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে—তেমনি এই মেয়েটি আকাশকে, বাতাসকে, আলোককে আপনার চারিদিকে যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিল—অথচ সে নিজে ইহার কিছুই না জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাহার পড়িবার বইয়ের ছবি দেখিতেছিল।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া একটা থালায় কতকগুলি আপেল, নাসপাতি, বেদানা লইয়া উপস্থিত করিল। কহিল, "কমলা, তুমি তো খাবে না দেখিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমি তো আর সবুর করিতে পারি না।"

শুনিয়া কমলা একটুখানি হাসিল। এই অকস্মাৎ হাসির আলোকে উভয়ের ভিতরকার কুয়াশা যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল।

রমেশ ছুরি লইয়া আপেল কাটিতে লাগিল। কিন্তু কোনোপ্রকার হাতের কাজে রমেশের কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। তাহার একদিকে ক্ষুধার আগ্রহ, অন্যদিকে এলোমেলো কাটিবার ভঙ্গি দেখিয়া বালিকার ভারি হাসি পাইল—সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমেশ এই হাস্যোচ্ছ্বাসে খুশি হইয়া কহিল, "আমি বুঝি ভালো কাটিতে পারি না, তাই হাসিতেছ। আচ্ছা, তুমি কাটিয়া দাও দেখি, তোমার কিরূপ বিদ্যা।"

কমলা কহিল, "বঁটি হইলে আমি কাটিয়া দিতে পারি, ছুরিতে পারি না।"

রমেশ কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, বঁটি এখানে নাই?" চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বঁটি আছে?" সে কহিল, "আছে—রাত্রের আহারের জন্য সমস্ত আনা হইয়াছে।"

রমেশ কহিল, "ভালো করিয়া ধুইয়া একটা বঁটি লইয়া আয়।"

চাকর বঁটি লইয়া আসিল।

কমলা জুতা খুলিয়া বঁটি পাতিয়া নিচে বসিল এবং হাসিমুখে নিপুণহস্তে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফলের খোসা ছাড়াইয়া চাকলা চাকলা করিয়া কাটিতে লাগিল। রমেশ তাহার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া ফলের খণ্ডগুলি থালায় ধরিয়া লইল।

রমেশ কহিল, "তোমাকেও খাইতে হইবে।"

কমলা কহিল, "না।"

রমেশ কহিল, "তবে আমিও খাইব না।"

কমলা রমেশের মুখের উপরে দুই চোখ তুলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আগে খাও, তার পরে আমি খাইব।"

রমেশ কহিল, "দেখিয়ো, শেষকালে ফাঁকি দিয়ো না।"

কমলা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, সত্যি বলিতেছি, ফাঁকি দিব না।"

বালিকার এই সত্যপ্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইয়া রমেশ থালা হইতে এক টুকরা ফল লইয়া মুখে পুরিয়া দিল।

হঠাৎ তাহার চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ দেখিল, তাহার সম্মুখেই দ্বারের বাহিরে যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত।

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, মাপ করিবেন—আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানে বুঝি একলাই আছেন। যোগেন, খবর না দিয়া হঠাৎ এমন করিয়া আসিয়া পড়াটা ভালো হয় নাই। চলো, আমরা নিচে বসি গিয়া।"

বঁটি ফেলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ঘর হইতে পালাইবার পথেই দুজনে দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেন্দ্র একটুখানি সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু কমলার মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইল না—তাহাকে তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। কমলা সংকুচিত হইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

১৯

যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশ, এই মেয়েটি কে?"

রমেশ কহিল, "আমার একটি আত্মীয়।"

যোগেন্দ্র কহিল, "কী রকমের আত্মীয়? বোধ হয় গুরুজন কেহ হইবেন না, স্নেহের সম্পর্কও বোধ হইল না। তোমার সকল আত্মীয়ের কথাই তো তোমার কাছ হইতে শুনিয়াছি,—এ আত্মীয়ের তো কোনো বিবরণ শুনি নাই।"

অক্ষয় কহিল, "যোগেন, এ তোমার অন্যায়,—মানুষের কি এমন কোনো কথা থাকিতে পারে না, যাহা বন্ধুর কাছেও গোপনীয়?"

যোগেন্দ্র। কি রমেশ, অত্যন্ত গোপনীয় নাকি?

রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে কহিল, "হাঁ গোপনীয়। এই মেয়েটির সম্বন্ধে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।"

যোগেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছা করি। হেমের সহিত যদি তোমার বিবাহের প্রস্তাব না হইত, তবে কার সঙ্গে তোমার কতটা-দূর আত্মীয়তা গড়াইয়াছে, তাহা লইয়া এত তোলাপাড়া করিবার কোনো প্রয়োজন হইত না—যাহা গোপনীয়, তাহা গোপনেই থাকিত।

রমেশ কহিল, "এইটুকু পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, পৃথিবীতে কাহারও সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই, যাহাতে হেমনলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে আমার কোনো বাধা থাকিতে পারে।"

যোগেন্দ্র। তোমার হয়তো কিছুতেই বাধা না থাকিতে পারে—কিন্তু হেমনলিনীর আত্মীয়দের থাকিতে পারে। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যার সঙ্গে তোমার যেরূপ আত্মীয়তা থাক না কেন, তাহা গোপনে রাখিবার কী কারণ আছে?

রমেশ। সেই কারণটি যদি বলি, তবে গোপনে রাখা আর চলে না। তুমি

আমাকে ছেলেবেলা হইতে জান—কোনো কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া শুদ্ধ আমার কথার উপরে তোমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র। এই মেয়ের নাম কমলা কি না?

রমেশ। হাঁ।

যোগেন্দ্র। ইহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছ কি না?

রমেশ। হাঁ দিয়াছি।

যোগেন্দ্র। তবু তোমার উপরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে? তুমি আমাদিগকে জানাইতে চাও, এই মেয়েটি তোমার স্ত্রী নহে; অন্য সকলকে জানাইয়াছ, এই তোমার স্ত্রী—ইহা ঠিক সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত নহে।

অক্ষয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের নীতিবোধে এ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে না—কিন্তু ভাই যোগেন, সংসারে দুই পক্ষের কাছে দুইরকম কথা বলা হয়তো অবস্থাবিশেষে আবশ্যক হইতে পারে। অন্তত তাহার মধ্যে একটা সত্য হওয়াই সম্ভব। হয়তো রমেশবাবু তোমাদিগকে যেটা বলিতেছেন, সেইটেই সত্য।

রমেশ। আমি তোমাদিগকে কোনো কথাই বলিতেছি না। আমি কেবল এই কথা বলিতেছি, হেমনলিনীর সহিত বিবাহ আমার কর্তব্যবিরুদ্ধ নহে। কমলা সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিবার গুরুতর বাধা আছে—তোমরা আমাকে সন্দেহ করিলেও সে-অন্যায় আমি কিছুতে করিতে পারিব না। আমার নিজের সুখ-দুঃখ মান-অপমানের বিষয় হইলে আমি তোমাদের কাছে গোপন করিতাম না—কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় করিতে পারি না।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনীকে সকল কথা বলিয়াছ?

রমেশ। না। বিবাহের পরে তাঁহাকে বলিব, এইরূপ কথা আছে—যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এখনো তাঁহাকে বলিতে পারি।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, কমলাকে এ-সম্বন্ধে দুই-একটা প্রশ্ন করিতে পারি?

রমেশ। না, কোনোমতেই না। আমাকে যদি অপরাধী বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করিতে পার—কিন্তু তোমাদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য নির্দোষী কমলাকে দাঁড় করাইতে পারিব না।

যোগেন্দ্র। কাহাকেও প্রশ্নোত্তর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি। প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। এখন তোমাকে আমি স্পষ্টই বলিতেছি, ইহার পরে আমাদের বাড়িতে যদি প্রবেশের চেষ্টা কর, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।

রমেশ পাংশুবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "আর একটি কথা আছে,—হেমকে তুমি চিঠি লিখিতে পারিবে না—তাহার সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার সুদূর সম্পর্কও থাকিবে না। যদি চিঠি লেখ, তবে যে-কথা তুমি গোপন রাখিতে চাহিতেছ, সেই কথা আমি সমস্ত প্রমাণের সহিত সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিব। এখন যদি কেহ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমার সঙ্গে হেমের বিবাহ কেন ভাঙিয়া গেল, আমি বলিব, এ-বিবাহে আমার সম্মতি নাই বলিয়া ভাঙিয়া দিয়াছি—ভিতরকার কথাটা বলিব না। কিন্তু তুমি যদি সাবধান না হও, তবে সমস্ত কথা বাহির হইয়া যাইবে। তুমি এমন পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করিয়াছ, তবু যে আমি আপনাকে দমন করিয়া রাখিয়াছি, সে তোমার উপরে দয়া করিয়া নহে—ইহার মধ্যে আমার বোন হেমের সংস্রব আছে বলিয়াই তুমি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে। এখন তোমার কাছে আমার এই শেষ বক্তব্য যে, কোনোকালে হেমের সঙ্গে তোমার যে কোনো পরিচয় ছিল, তোমার কথায়-বার্তায় বা ব্যবহারে তাহার যেন কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে তোমাকে সত্য করাইয়া লইতে পারিলাম না, কারণ, এত মিথ্যার পরে সত্য তোমার মুখে মানাইবে না। তবে এখনো যদি লজ্জা থাকে,—অপমানের ভয় থাকে, তবে আমার এই কথাটা ভ্রমেও অবহেলা করিয়ো না।

অক্ষয়। আহা যোগেন, আর কেন? রমেশবাবু নিরুত্তর হইয়া আছেন, তবু তোমার মনে একটু দয়া হইতেছে না? এইবার চলো। রমেশবাবু, কিছু মনে করিবেন না, আমরা এখন আসি।

যোগেন্দ্র-অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ কাঠের মূর্তির মতো কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। হতবুদ্ধি-ভাবটা কাটিয়া গেলে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে করিতে সমস্ত অবস্থাটা এক বার ভাবিয়া লয়। কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল কমলা আছে, তাহাকে বাসায় একলা ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া যায় না।

রমেশ পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, কমলা রাস্তার দিকের জানলার একটা খড়খড়ি খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রমেশের পদশব্দ শুনিয়া সে খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেশ মেজের উপরে বসিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা দুজনে কে? আজ সকালে আমাদের ইস্কুলে গিয়াছিল।"

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, "ইস্কুলে গিয়াছিল?"

কমলা কহিল, "হাঁ। উহারা তোমাকে কী বলিতেছিল?"

রমেশ কহিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তুমি আমার কে হও?"

কমলা যদিও শ্বশুরবাড়ির অনুশাসনের অভাবে এখনো লজ্জা করিতে শেখে নাই, তবু আশৈশব-সংস্কারবশে রমেশের এই কথায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, "আমি উহাদিগকে উত্তর করিয়াছি, তুমি আমার কেউ হও না।"

কমলা ভাবিল, রমেশ তাহাকে অন্যায় লজ্জা দিয়া উৎপীড়ন করিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া তর্জনস্বরে কহিল, "যাও!"

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলার কাছে সকল কথা কেমন করিয়া খুলিয়া বলিব?"

কমলা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "ওই যা, তোমার ফল কাকে লইয়া যাইতেছে।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া কাক তাড়াইয়া ফলের থালা লইয়া আসিল।

রমেশের সম্মুখে থালা রাখিয়া কহিল, "তুমি খাইবে না?"

রমেশের আর আহারের উৎসাহ ছিল না—কিন্তু কমলার এই যত্নটুকু তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে কহিল, "কমলা, তুমি খাবে না?"

কমলা কহিল, "তুমি আগে খাও।"

এইটুকু ব্যাপার, বেশি-কিছু নয়, কিন্তু রমেশের বর্তমান অবস্থায় এই হৃদয়ের কোমল আভাসটুকু তাহার বক্ষের ভিতরকার অশ্রু-উৎসে গিয়া যেন ঘা দিল। রমেশ কোনো কথা না বলিয়া জোর করিয়া ফল খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পালা সাঙ্গ হইলে রমেশ কহিল, "কমলা, আজ রাত্রে আমরা দেশে যাইব।"

কমলা চোখ নিচু, মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিল, "সেখানে আমার ভালো লাগে না।"

রমেশ। ইস্কুলে থাকিতে তোমার ভালো লাগে?

কমলা। না, আমাকে ইস্কুলে পাঠাইয়ো না। আমার লজ্জা করে। মেয়েরা আমাকে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।

রমেশ। তুমি কী বল?

কমলা। আমি কিছুই বলিতে পারি না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কেন আমাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে রাখিতে চাহিয়াছ—আমি—

কমলা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

রমেশ। তুমি কেন বলিলে না, তিনি আমার কেহই হন না।

কমলা রাগ করিয়া রমেশের মুখের দিকে কুটিলকটাক্ষে চাহিল—কহিল, "যাও।"

আবার রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "কী করা যাইবে?" এদিকে রমেশের বুকের ভিতরে বরাবর একটা চাপা বেদনা কীটের মত যেন গহ্বর খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে কী বলিল, হেমনলিনী কী মনে করিতেছে, প্রকৃত অবস্থা কেমন করিয়া হেমনলিনীকে বুঝাইবে, হেমনলিনীর সহিত চিরকালের জন্য যদি তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তবে জীবন বহন করিবে কী করিয়া—এই সকল জ্বালাময় প্রশ্ন ভিতরে-ভিতরে জমা হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ভাল করিয়া তাহা আলোচনা করিবার অবসর রমেশ পাইতেছিল না। রমেশ এটুকু বুঝিয়াছিল যে, কমলার সহিত রমেশের সম্বন্ধ কলিকাতায় তাহার বন্ধু- ও শত্রু-মণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। রমেশ যে কমলার স্বামী, এই গোলমালে সেই জনশ্রুতি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। এ-সময়ে রমেশের পক্ষে কমলাকে লইয়া আর এক দিনও কলিকাতায় থাকা সংগত হইবে না।

অন্যমনস্ক রমেশের এই চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ কমলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি কী ভাবিতেছ? তুমি যদি দেশে থাকিতে চাও, আমি সেইখানেই থাকিব।"

বালিকার মুখে এই আত্মসংযমের কথা শুনিয়া রমেশের বুকে আবার ঘা লাগিল—আবার সে ভাবিল, "কী করা যাইবে?" পুনর্বার সে অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিরুত্তরে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা মুখ গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি ছুটির সময়ে ইস্কুলে থাকিতে চাহি নাই বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ?—সত্য করিয়া বলো।"

রমেশ কহিল "সত্য করিয়াই বলিতেছি, তোমার উপরে রাগ করি নাই, আমি নিজের উপরেই রাগ করিয়াছি।"

রমেশ ভাবনার জাল হইতে নিজেকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কমলার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কমলা, ইস্কুলে এতদিন কী শিখিলে বলো দেখি।"

কমলা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিজের শিক্ষার হিসাব দিতে লাগিল। সম্প্রতি পৃথিবীর গোলাকৃতির কথা তাহার অগোচর নাই জানাইয়া যখন সে রমেশকে চমৎকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, রমেশ গম্ভীরমুখে ভূমণ্ডলের গোলত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিল। কহিল, "এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে?"

কমলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বাঃ আমাদের বইয়ে লেখা আছে—আমরা পড়িয়াছি।"

রমেশ আশ্চর্য জানাইয়া কহিল, "বল কী। বইয়ে লেখা আছে? কতবড়ো বই?"

এই প্রশ্নে কমলা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "বেশি বড়ো বই নয়—কিন্তু ছাপার বই। তাহাতে ছবিও দেওয়া আছে।"

এত-বড়ো প্রমাণের পর রমেশকে হার মানিতে হইল। তার পরে কমলা শিক্ষার বিবরণ শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা, সেখানকার দৈনিক কার্যধারা লইয়া বকিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া গেল। কখনো বা কথার শেষ সূত্র ধরিয়া এক-আধটা প্রশ্নও করিল। একসময়ে কমলা বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার কথা কিছুই শুনিতেছ না।" বলিয়া সে রাগ করিয়া তখনি উঠিয়া পড়িল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না কমলা, রাগ করিয়ো না—আমি আজ ভালো নাই।"

ভালো নাই শুনিয়া তখনি কমলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমার অসুখ করিয়াছে? কী হইয়াছে?"

রমেশ কহিল, "ঠিক অসুখ নয়—ও কিছুই নয়—আমার মাঝে মাঝে অমন হইয়া থাকে—আবার এখনি চলিয়া যাইবে।"

কমলা রমেশকে শিক্ষার সহিত আমোদ দিবার জন্য কহিল, "আমার ভূগোল-প্রবেশে পৃথিবীর যে ছবি আছে, দেখিবে?"

রমেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দেখিতে চাহিল। কমলা তাড়াতাড়ি তাহার বই আনিয়া রমেশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। কহিল, "এই যে দুটো গোল দেখিতেছ, ইহা আসলে একটা। গোল জিনিসের দুটো পিঠ কি কখনো একসঙ্গে দেখা যায়?"

রমেশ কিঞ্চিৎ ভাবিবার ভান করিয়া কহিল, "চ্যাপটা জিনিসেরও দেখা যায় না।"

কমলা কহিল, "সেইজন্য এই ছবিতে পৃথিবীর দুই পিঠ আলাদা করিয়া আঁকিয়াছে।"

এম্‌নি করিয়া সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

২০

অন্নদাবাবু একান্তমনে আশা করিতেছিলেন, যোগেন্দ্র ভালো খবর লইয়া আসিবে, সমস্ত গোলমাল অতি সহজে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যোগেন্দ্র ও অক্ষয় যখন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, অন্নদাবাবু ভীতভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি যে রমেশকে এতদূর পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতে দিবে, তাহা কে জানিত। এমন জানিলে আমি তোমাদের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতাম না।"

অন্নদা। রমেশের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহ তোমার অভিপ্রেত, এ-কথা তুমি তো আমাকে অনেক বার বলিয়াছ। বাধা দিবার ইচ্ছা যদি তোমার ছিল, তবে আমাকে—

যোগেন্দ্র। অবশ্য একেবারে বাধা দিবার কথা আমার মনে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া—

অন্নদা। ওই দেখো, ওর মধ্যে "তাই বলিয়া" কোথায় থাকিতে পারে। হয় অগ্রসর হইতে দিবে, নয় বাধা দিবে, এর মাঝখানে আর কী আছে?

যোগেন্দ্র। তাই বলিয়া একেবারে এতটা-দূর অগ্রসর—

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "কতকগুলি জিনিস আছে, যা আপনার ঝোঁকেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে হয় না—বাড়িতে বাড়িতে আপনিই বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু যা হইয়া গেছে, তা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ কী? এখন যা করা কর্তব্য, তাই আলোচনা করো।"

অন্নদাবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে?"

যোগেন্দ্র। খুব দেখা হইয়াছে—এত দেখা আশা করি নাই। এমন কি, তার স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হইল?"

যোগেন্দ্র। রমেশের স্ত্রী।

অন্নদা। তুমি কী বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্ রমেশের স্ত্রী?

যোগেন্দ্র। আমাদের রমেশের। পাঁচ-ছয় মাস আগে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন সে বিবাহ করিতেই গিয়াছিল।

অন্নদা। কিন্তু তার পিতার মৃত্যু হইল বলিয়া বিবাহ ঘটিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্র। মৃত্যুর পূর্বেই বিবাহ হইয়া গেছে।

অন্নদাবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "তবে তো আমাদের হেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না।"

যোগেন্দ্র। আমরা তো তাই বলিতেছি—

অন্নদা। তোমরা তো তাই বলিলে, এদিকে যে বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়া গেছে—এ রবিবারে হইল না বলিয়া পরের রবিবারে দিন স্থির করিয়া চিঠি বিলি হইয়া গেছে—আবার সেটা বন্ধ করিয়া ফের চিঠি লিখিতে হইবে?

যোগেন্দ্র কহিল, "একেবারে বন্ধ করিবার দরকার কী—কিছু পরিবর্তন করিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে।"

অন্নদাবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "ওর মধ্যে পরিবর্তন কোন্‌খানটায় করিবে ?"

যোগেন্দ্র। যেখানে পরিবর্তন করা সম্ভব, সেইখানেই করিতে হইবে। রমেশের বদলে আর কোনো পাত্র স্থির করিয়া আসছে রবিবারেই যেমন করিয়া হউক কর্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। নহিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।

বলিয়া যোগেন্দ্র এক বার অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল। অক্ষয় বিনয়ে মুখ নত করিল।

অন্নদা। পাত্র এত শীঘ্র পাওয়া যাইবে ?

যোগেন্দ্র। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

অন্নদা। কিন্তু হেমকে তো রাজি করাইতে হইবে।

যোগেন্দ্র। রমেশের সমস্ত ব্যাপার শুনিলে সে নিশ্চয় রাজি হইবে।

অন্নদা। তবে যা তুমি ভালো বিবেচনা হয়, তাই করো। কিন্তু রমেশের বেশ সংগতিও ছিল, আবার উপার্জনের মতো বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল। এই পরশু আমার সঙ্গে কথা ঠিক হইয়া গেল, সে এটোয়ায় গিয়া প্র্যাকটিস করিবে এর মধ্যে দেখো দেখি কী কাণ্ড।

যোগেন্দ্র। সে-জন্য কেন চিন্তা করিতেছ বাবা, এটোয়াতে রমেশ এখনো প্র্যাকটিস করিতে পারিবে। এক বার হেমকে ডাকিয়া আনি, আর তো বেশি সময় নাই।

কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় ঘরের এক কোণে বইয়ের আলমারির আড়ালে বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "হেম, বসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া চৌকিতে বসিল। সে জানিত, তাহার একটা পরীক্ষা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র ভূমিকাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশের ব্যবহারে সন্দেহের কারণ তুমি কিছুই দেখিতে পাও না ?"

হেমনলিনী কোনো কথা না বলিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্র। সে যে বিবাহের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিল, তাহার এমন কী কারণ থাকিতে পারে, যাহা আমাদের কারও কাছে বলা চলে না।

হেমনলিনী চোখ নিচু করিয়া কহিল, "কারণ অবশ্যই কিছু আছে।"

যোগেন্দ্র। সে তো ঠিক কথা। কারণ তো আছেই—কিন্তু সে কি সন্দেহজনক না ?

হেমনলিনী আবার নীরবে নাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

তাহাদের সকলের চেয়ে রমেশের উপরেই এমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে যোগেন্দ্র রাগ করিল। সাবধানে ভূমিকা করিয়া কথা পাড়া আর চলিল না।

যোগেন্দ্র কঠিনভাবে বলিতে লাগিল, "তোমার তো মনে আছে, রমেশ মাস-ছয়েক আগে তাহার বাপের সঙ্গে দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে অনেক দিন তাহার কোনো চিঠিপত্র না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। ইহাও তুমি জান যে, যে-রমেশ দুই বেলা আমাদের এখানে আসিত, যে বরাবর আমাদের পাশের বাড়িতে বাসা লইয়া ছিল, সে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একবারও দেখাও করিল না, অন্য বাসায় গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল—ইহা সত্ত্বেও তোমরা সকলে পূর্বের মতো বিশ্বাসেই তাহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিলে? আমি থাকিলে এমন কি কখনো ঘটিতে পারিত?"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র। রমেশের এইরূপ ব্যবহারের কোনো অর্থ তোমরা খুঁজিয়া পাইয়াছ? এ-সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও কি তোমাদের মনে উদয় হয় নাই? রমেশের 'পরে এত গভীর বিশ্বাস?

হেমনলিনী নিরুত্তর।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা বেশ কথা—তোমরা সরলস্বভাব, কাহাকেও সন্দেহ কর না—আশা করি, আমার উপরেও তোমার কতকটা বিশ্বাস আছে। আমি নিজে ইস্কুলে গিয়া খবর লইয়াছি, রমেশ তাহার স্ত্রী কমলাকে সেখানে বোর্ডার রাখিয়া পড়াইতেছিল। ছুটির সময়েও তাহাকে সেখানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই-তিন দিন হইল, ইস্কুলের কর্ত্রীর নিকট হইতে রমেশ চিঠি পাইয়াছে যে, ছুটির সময়ে কমলাকে ইস্কুলে রাখা হইবে না। আজ তাহাদের ছুটি ফুরাইয়াছে—কমলাকে ইস্কুলের গাড়ি দরজিপাড়ায় তাহাদের সাবেক বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। সেই বাসায় আমি নিজে গিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, কমলা বঁটিতে আপেলের খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া দিতেছে, রমেশ তাহার সুমুখে মাটিতে বসিয়া এক-এক টুকরা লইয়া মুখে পুরিতেছে। রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপারখানা কী?' রমেশ বলিল, সে এখন আমাদের কাছে কিছুই বলিবে না। যদি রমেশ একটা কথাও বলিত যে, কমলা তাহার স্ত্রী নয়, তা হলেও না হয় সেই কথাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া কোনোমতে সন্দেহকে শান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সে হাঁ-না কিছুই বলিতে চায় না। এখন, ইহার পরেও কি রমেশের উপর বিশ্বাস রাখিতে চাও?

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেছে, এবং তাহার যতটা জোর আছে,

দুই হাতে চৌকির হাতা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্তকাল পরেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মূর্ছিত হইয়া চৌকি হইতে সে নিচে পড়িয়া গেল।

অন্নদাবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভূলুণ্ঠিতা হেমনলিনীর মাথা দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "মা, কী হইল মা। ওদের কথা তুমি কিছুই বিশ্বাস করিয়ো না,—সব মিথ্যা।"

যোগেন্দ্র তাহার পিতাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি হেমনলিনীকে একটা সোফার উপর তুলিল—নিকটে কুঁজায় জল ছিল, সেই জল লইয়া তাহার মুখে-চোখে বারংবার ছিটাইয়া দিল—এবং অক্ষয় একখানা হাতপাখা লইয়া তাহাকে বেগে বাতাস করিতে লাগিল।

হেমনলিনী অনতিকাল পরে চোখ খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল—অন্নদাবাবুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, বাবা, অক্ষয়বাবুকে এখান হইতে সরিয়া যাইতে বলো।"

অক্ষয় পাখা রাখিয়া ঘরের বাহিরে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাবাবু সোফার উপরে হেমনলিনীর পাশে বসিয়া তাহার মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন—এবং গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল একবার বলিলেন, "মা।"

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল—পিতার জানুর উপর বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার অসহ্য রোদনের বেগ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল। অন্নদাবাবু অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা। রমেশকে আমি খুব জানি—সে কখনোই অবিশ্বাসী নয়—যোগেন নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে।"

যোগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না—কহিল, "বাবা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ো না। এখনকার মতো কষ্ট বাঁচাইতে গিয়া উহাকে দ্বিগুণ কষ্টে ফেলা হইবে। বাবা, হেমকে এখন কিছুক্ষণ ভাবিবার সময় দাও।"

হেমনলিনী তখনি পিতার জানু ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার যাহা ভাবিবার, সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিলেন—কহিলেন, "পড়িয়া যাইবে।"

হেমনলিনী অন্নদাবাবুর হাত ধরিয়া তাহার শোবার ঘরে গেল। বিছানায় শুইয়া কহিল, "বাবা, আমাকে একটুখানি একলা রাখিয়া যাও, আমি ঘুমাইব।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হরির মাকে ডাকিয়া দিব? বাতাস করিবে?"

হেমনলিনী কহিল, "বাতাসের দরকার নাই বাবা।

অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। এই কন্যাটিকে তিন বৎসরের শিশু-অবস্থায় রাখিয়া ইহার মা মারা যায়, সেই হেমের মার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সেবা, সেই ধৈর্য, সেই চিরপ্রসন্নতা মনে পড়িল। সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মতো যে মেয়েটি এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিষ্ট-আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে বসিয়া বসিয়া তিনি মনে মনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক, চিরদিন তুমি সুখে থাকো—তোমাকে সুখী দেখিয়া, সুস্থ দেখিয়া, যাহাকে ভালোবাস তাহার ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর মতো প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমি যেন তোমার মার কাছে যাইতে পারি।" এই বলিয়া জামার প্রান্তে আর্দ্র চক্ষু মুছিলেন।

মেয়েদের বুদ্ধির প্রতি যোগেন্দ্রের পূর্ব হইতেই যথেষ্ট অবজ্ঞা ছিল, আজ তাহা আরও দৃঢ় হইল। ইহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিশ্বাস করে না—ইহাদিগকে লইয়া কী করা যাইবে? দুইয়ে দুইয়ে যে চার হইবেই, তাহাতে মানুষের সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহা ইহারা স্থলবিশেষে অনায়াসেই অস্বীকার করিতে পারে। যুক্তি যদি কালোকে কালোই বলে, আর ইহাদের ভালোবাসা তাহাকে বলে সাদা, তবে যুক্তি-বেচারার উপরেই ইহারা ভারি খাপা হইয়া উঠিবে। ইহাদিগকে লইয়া যে কী করিয়া সংসার চলে, তাহা যোগেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

যোগেন্দ্র ডাকিল, "অক্ষয়।"

অক্ষয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্র কহিল, "সব তো শুনিয়াছ, এখন ইহার উপায় কী?"

অক্ষয় কহিল, "আমাকে এ-সব কথার মধ্যে কেন মিছামিছি টান ভাই। আমি এতদিন কোনো কথাই বলি নাই—তুমি আসিয়াই আমাকে এই মুশকিলে ফেলিয়াছ।"

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, সে-সব নালিশের কথা পরে হইবে। এখন হেমনলিনীর কাছে রমেশকে নিজের মুখে সকল কথা কবুল না করাইলে উপায় দেখি না।

অক্ষয়। পাগল হইয়াছ! মানুষ নিজের মুখে—

যোগেন্দ্র। কিংবা যদি একটা চিঠি লেখে, তাহা হইলে আরও ভালো হয়। তোমাকে এই ভার লইতেই হইবে। কিন্তু আর দেরি করিলে চলিবে না।

অক্ষয় কহিল, "দেখি, কতদূর কী করিতে পারি।"

২১

রাত্রি নয়টার সময় রমেশ কমলাকে লইয়া শেয়ালদহ-স্টেশনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় একটু ঘুরপথ দিয়া গেল। গাড়োয়ানকে অনাবশ্যক গোটাকতক গলি ঘুরাইয়া লইল। কলুটোলায় একটা বাড়ির কাছে আসিয়া আগ্রহসহকারে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। পরিচিত বাড়ির তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

রমেশ এমন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস্ ফেলিল যে, নিদ্রাবিষ্ট কমলা চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী হইয়াছে ?"

রমেশ উত্তর করিল, "কিছুই না।" আর কিছুই বলিল না—গাড়ির অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া কমলা আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য কমলার অস্তিত্বকে রমেশের যেন অসহ্য বোধ হইল।

গাড়ি যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছিল। একটি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ি পূর্ব হইতেই রিজার্ভ করা ছিল—রমেশ ও কমলা তাহাতে উঠিল। একদিকের বেঞ্চিতে কমলার জন্য বিছানা পাতিয়া গাড়ির বাতির নিচে পর্দা টানিয়া অন্ধকার করিয়া দিয়া রমেশ কমলাকে কহিল, "অনেকক্ষণ তোমার শোবার সময় হইয়া গেছে, এইখানে তুমি ঘুমাও।"

কমলা কহিল, "গাড়ি ছাড়িলে আমি ঘুমাইব, ততক্ষণ আমি এই জানলার ধারে বসিয়া একটু দেখিব ?"

রমেশ রাজি হইল। কমলা মাথায় কাপড় টানিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকের আসনপ্রান্তে বসিয়া লোকজনের আনাগোনা দেখিতে লাগিল। রমেশ মাঝের আসনে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। গাড়ি যখন সবে ছাড়িয়াছে, এমন সময় রমেশ চমকিয়া উঠিল—হঠাৎ মনে হইল, তাহার এক জন চেনা লোক গাড়ির অভিমুখে ছুটিয়াছে।

পরক্ষণেই কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেশ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—রেলওয়ে-কর্মচারীর বাধা কাটাইয়া এক জন লোক কোনোক্রমে চলন্ত গাড়িতে উঠিয়াছে এবং টানাটানিতে তাহার চাদর কর্মচারীর হাতেই রহিয়া গেছে। চাদর লইবার জন্য সে-ব্যক্তি যখন জানলা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইল, তখন রমেশ স্পষ্ট চিনিতে পারিল, সে আর কেহ নয়, অক্ষয়।

এই চাদর-কাড়াকাড়ির দৃশ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমলার হাসি থামিতে চাহিল না।

রমেশ কহিল, "সাড়ে দশটা বাজিয়া গেছে—গাড়ি ছাড়িয়াছে, এই বার তুমি ঘুমাও।"

বালিকা বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিল, মাঝে মাঝে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে রমেশের বিশেষ কৌতুকবোধ হইল না।

রমেশ জানিত, কোনো পল্লিগ্রামের সহিত অক্ষয়ের কোনো সম্বন্ধ ছিল না—সে পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী—আজ রাত্রে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে? রমেশ নিশ্চয় বুঝিল, অক্ষয় তাহারই অনুসরণে চলিয়াছে।

অক্ষয় যদি তাহাদের গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং সেখানে রমেশের স্বপক্ষবিপক্ষমণ্ডলীর মধ্যে এই কথা লইয়া একটা ঘাঁটাঘাঁটি হইতে থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা কিরূপ জঘন্য হইয়া উঠিবে, তাহাই কল্পনা করিয়া রমেশের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের পাড়ায় কে কী বলিবে, কিরূপ ঘোঁট চলিবে, তাহা রমেশ যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিল। কলিকাতার মতো শহরে সকল অবস্থাতেই অন্তরাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়—কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর গভীরতা কম বলিয়াই অল্প আঘাতেই তাহার আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠে। সেই কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, রমেশের মন ততই সংকুচিত হইতে লাগিল।

বারাকপুরে যখন গাড়ি থামিল, রমেশ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় নামিল না। নৈহাটিতে অনেক লোক উঠানামা করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে অক্ষয়কে দেখা গেল না। এক বার বৃথা আশায় বগুলা স্টেশনেও রমেশ ব্যগ্র হইয়া মুখ বাড়াইল—অবরোহীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই। তাহার পরের আর কোনো স্টেশনে অক্ষয়ের নামিবার কোনো সম্ভাবনা সে কল্পনা করিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে শ্রান্ত হইয়া রমেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে গোয়ালন্দে গাড়ি পৌঁছিলে রমেশ দেখিল, অক্ষয় মাথায় মুখে চাদর জড়াইয়া একটা হাতব্যাগ লইয়া তাড়াতাড়ি স্টীমারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে-স্টীমারে রমেশের উঠিবার কথা, সে-স্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব আছে। কিন্তু অন্য ঘাটে আর-একটা স্টীমার গমনোন্মুখ অবস্থায় ঘন ঘন বাঁশি বাজাইতেছে। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এ স্টীমার কোথায় যাইবে?" উত্তর পাইল, "পশ্চিমে।"

"কতদূর পর্যন্ত যাইবে?"

"জল না কমিলে কাশী পর্যন্ত যায়।"

শুনিয়া রমেশ তৎক্ষণাৎ সেই স্টীমারে উঠিয়া কমলাকে একটা কামরায় বসাইয়া আসিল, এবং তাড়াতাড়ি কিছু দুধ, চাল-ডাল এবং এক ছড়া কলা কিনিয়া লইল।

এদিকে অক্ষয় অন্য স্টীমারে সকল আরোহীর আগে উঠিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া এমন

একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেখান হইতে অন্যান্য যাত্রীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। যাত্রিগণের বিশেষ তাড়া ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার দেরি আছে—তাহারা এই অবকাশে মুখহাত ধুইয়া, স্নান করিয়া, কেহ কেহ বা তীরে রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া লইতে লাগিল। অক্ষয়ের কাছে গোয়ালন্দ পরিচিত নহে। সে মনে করিল, নিকটে কোথাও হোটেল বা কিছু আছে, সেইখানে রমেশ কমলাকে খাওয়াইয়া লইতেছে।

অবশেষে স্টীমারে বাঁশি দিতে লাগিল। তখনো রমেশের দেখা নাই; কম্পমান তক্তার উপর দিয়া যাত্রীর দল জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘনঘন বাঁশির ফুৎকারে লোকের তাড়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আগত ও আগন্তুকদের মধ্যে রমেশের কোনো চিহ্ন নাই। যখন আরোহীর সংখ্যা শেষ হইয়া আসিল, তক্তা টানিয়া লইল এবং সারেং নোঙর তুলিবার হুকুম করিল, তখন অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আমি নামিয়া যাইব"—কিন্তু খালাসিরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ডাঙা দূরে ছিল না, অক্ষয় স্টীমার হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

তীরে উঠিয়া রমেশের কোনো খবর পাওয়া গেল না। অল্পক্ষণ হইল, গোয়ালন্দ হইতে সকালবেলাকার প্যাসেঞ্জার-ট্রেন কলিকাতা-অভিমুখে চলিয়া গেছে। অক্ষয় মনে মনে ভাবিল, কাল রাত্রে গাড়িতে উঠিবার সময়কার টানাটানিতে নিশ্চয় সে রমেশের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং রমেশ তাহার কোন বিরুদ্ধ অভিসন্ধি অনুমান করিয়া দেশে না গিয়া আবার সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেছে। কলিকাতায় যদি কোনো লোক লুকাইবার চেষ্টা করে, তবে তো তাহাকে বাহির করাই কঠিন হইবে।

২২

অক্ষয় সমস্তদিন গোয়ালন্দে ছটফট করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার ডাকগাড়িতে উঠিয়া পড়িল। পরদিন ভোরে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই সে রমেশের দরজিপাড়ার বাসায় আসিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ—খবর লইয়া জানিল, সেখানে কেহই আসে নাই।

কলুটোলায় আসিয়া দেখিল, রমেশের বাসা শূন্য। অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া যোগেন্দ্রকে কহিল, "পালাইয়াছে—ধরিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "সে কী কথা?"

অক্ষয় তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল।

অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া রমেশ কমলাকে শুদ্ধ লইয়া পালাইয়াছে, এই খবরে রমেশের বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হইল।

যোগেন্দ্র কহিল, "কিন্তু অক্ষয়, এ-সমস্ত যুক্তি কোনো কাজেই লাগিবে না। শুধু হেমনলিনী কেন, বাবাসুদ্ধ ওই এক বুলি ধরিয়াছেন—তিনি বলেন, রমেশের নিজের মুখে শেষ কথা না শুনিয়া তিনি রমেশকে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এমন কি, রমেশ আজও আসিয়া যদি বলে, 'আমি এখন কিছুই বলিব না', তবু নিশ্চয় বাবা তাহার সঙ্গে হেমের বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাদের লইয়া আমি এমনি মুশকিলে পড়িয়াছি। বাবা হেমনলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না—হেম যদি আজ আবদার করিয়া বসে, 'রমেশের অন্য স্ত্রী থাক, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব', তবে বাবা বোধ হয় তাহাতেই রাজি হন। যেমন করিয়া হউক এবং যত শীঘ্র হউক, রমেশকে দিয়া কবুল করাইতেই হইবে। তোমার হতাশ হইলে চলিবে না। আমিই এ-কাজে লাগিতে পারিতাম, কিন্তু কোনোপ্রকার ফন্দি আমার মাথায় আসে না—আমি হয়তো রমেশের সঙ্গে একটা মারামারি বাধাইয়া দিব। এখনো বুঝি তোমার মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া হয় নাই।"

অক্ষয় মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে অন্নদাবাবু হেমনলিনীর হাত ধরিয়া চা খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয়কে দেখিবামাত্র হেমনলিনী ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া কহিল, "হেমের এ ভারি অন্যায়। বাবা, তুমি উহার এই সকল অভদ্রতায় প্রশ্রয় দিয়ো না! উহাকে জোর করিয়া এখানে আনা উচিত। হেম, হেম।"

হেমনলিনী তখন উপরে চলিয়া গেছে। অক্ষয় কহিল, "যোগেন, তুমি আমার কেস আরও খারাপ করিয়া দিবে দেখিতেছি। উহার কাছে আমার সম্বন্ধে কোনো কথাটি কহিয়ো না। সময়ে ইহার প্রতিকার হইবে—জবরদস্তি করিতে গেলে সব মাটি হইয়া যাইবে।"

এই বলিয়া অক্ষয় চা খাইয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়ের ধৈর্যের অভাব ছিল না। যখন সমস্ত লক্ষণ তাহার প্রতিকূলে, তখনো সে লাগিয়া থাকিতে জানে। তাহার ভাবেরও কোনো বিকার হয় না। অভিমান করিয়া সে মুখ গম্ভীর করে না বা দূরে চলিয়া যায় না। অনাদর-অবমাননায় সে অবিচলিত থাকে। লোকটা টেঁকসই। তাহার প্রতি যাহার ব্যবহার যেমনি হউক, সে টিঁকিয়া থাকে।

অক্ষয় চলিয়া গেলে আবার অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত

করিলেন। আজ তাহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ—তাহার চোখের নিচে কালি পড়িয়া গেছে। ঘরে ঢুকিয়া সে চোখ নিচু করিল, যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে জানিত, যোগেন্দ্র তাহার ও রমেশের উপর রাগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিচার করিতেছে। এইজন্য যোগেন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি-চোখোচোখি হওয়া তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

ভালোবাসায় যদিও হেমনলিনীর বিশ্বাসকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল, তবু যুক্তিকে একেবারেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যোগেন্দ্রের সম্মুখে হেমনলিনী কাল আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে শয়নঘরের মধ্যে একলা সেই বল সম্পূর্ণ থাকে না। বস্তুতই প্রথম হইতে রমেশের ব্যবহারের কোন অর্থ পাওয়া যায় না। সন্দেহের কারণগুলিকে হেমনলিনী যত প্রাণপণ বলে তাহার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে দেয় না—তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ততই সবলে আঘাত করিতে থাকে। সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেমনি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁকড়িয়া রাখিল। কিন্তু হায়, জোর কি সকল সময় সমান থাকে।

হেমনলিনীর পাশের ঘরেই রাত্রে অন্নদাবাবু শুইয়াছিলেন। হেম যে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। এক-এক বার তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে বলিতেছিলেন, "মা, তোমার ঘুম হইতেছে না?" হেমনলিনী উত্তর দিতেছিল, "বাবা, তুমি কেন জাগিয়া আছ? আমার ঘুম আসিতেছে—আমি এখনি ঘুমাইয়া পড়িব।"

পরের দিন ভোরে উঠিয়া হেমনলিনী ছাদের উপর বেড়াইতেছিল। রমেশের বাসার একটি দরজা একটি জানলাও খোলা নাই।

সূর্য ক্রমে পূর্বদিকের সৌধশিখরমালার উপরে উঠিয়া পড়িল। হেমনলিনীর কাছে আজিকার এই নূতন-অভ্যুদিত দিনটি এমনি শুষ্ক শূন্য, এমনি আশাহীন আনন্দহীন ঠেকিল যে, সে সেই ছাদের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আজ সমস্তদিন কেহই আসিবে না, চায়ের সময় কাহাকেও আশা করিবার নাই, পাশের বাড়িতে কেহ এক জন আছে, এই কল্পনা করিবার সুখটুকু পর্যন্ত ঘুচিয়া গেছে।

"হেম, হেম।"

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সাড়া দিল, "কী বাবা।"

অন্নদাবাবু ছাদে উঠিয়া আসিয়া হেমনলিনীর পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমার আজ উঠিতে দেরি হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই—ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আলো চোখে লাগিতেই উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া হেমনলিনীর খবর লইতে গেলেন। দেখিলেন, ঘরে কেহ নাই। সকালে তাহাকে একলা বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগিল। কহিলেন, "চলো মা, চা খাইবে চলো।"

চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া চা খাইবার ইচ্ছা হেমনলিনীর ছিল না। কিন্তু সে জানিত, কোনোরূপ নিয়মের অন্যথা তাহার বাপকে পীড়া দেয়। তা ছাড়া, প্রত্যহ সে নিজের হাতে তাহার বাপের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দেয়, এই সেবাটুকু হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিল না।

নিচে গিয়া ঘরে পৌঁছিবার পূর্বে যখন সে বাহির হইতে শুনিল, যোগেন্দ্র কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে—তখন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল—হঠাৎ মনে হইল, বুঝি রমেশ আসিয়াছে। এত সকালে আর কে আসিবে?

কম্পিতপদে ঘরে ঢুকিয়া যেই দেখিল অক্ষয়, অমনি সে আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না—তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দ্বিতীয়বার অন্নদাবাবু যখন তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন, তখন সে তাহার পিতার চৌকির পাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে তাঁহার চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র হেমনলিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। হেম যে রমেশের জন্য এমন করিয়া শোক অনুভব করিবে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাহার পরে যখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাহার এই শোকের সঙ্গী হইয়াছেন এবং সেও যেন সংসারের আর সকলের নিকট হইতে অন্নদাবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার অধৈর্য আরও বাড়িয়া উঠিল।—আমরা যেন সবাই অন্যায়কারী—আমরা যে স্নেহের খাতিরেই কর্তব্যপালনে চেষ্টা করিতেছি, আমরাই যে যথার্থভাবে উহার মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত—তাহার জন্য লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা দূরে থাক, মনে মনে আমাদের দোষী করিতেছে। বাবার তো কোনো বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান নাই। এখন সান্ত্বনা দিবার সময় নহে—এখন আঘাত দিবারই সময়। তাহা না করিয়া তিনি ক্রমাগতই অপ্রিয় সত্যকে উহার নিকট হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিতেছেন।

যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "জান বাবা, কী হইয়াছে?"

অন্নদাবাবু ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না—কী হইয়াছে ?"

যোগেন্দ্র। রমেশ কাল তাহার স্ত্রীকে লইয়া গোয়ালন্দ মেলে দেশে যাইতেছিল—অক্ষয়কে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া দেশে না গিয়া আবার সে কলিকাতায় পালাইয়া আসিয়াছে।

হেমনলিনীর হাত কাঁপিয়া উঠিল—চা ঢালিতে চা পড়িয়া গেল। সে চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে এক বার কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল, "পালাইবার কী দরকার ছিল, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। অক্ষয়ের কাছে তো পূর্বেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। একে তো তাহার পূর্বের ব্যবহার যথেষ্ট হেয়—তাহার পরে এই ভীরুতা, এই চোরের মতো ক্রমাগত পালাইয়া বেড়ানো আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়। জানি না, হেম কী মনে করে—কিন্তু এইরূপ পলায়নেই তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে।"

হেমনলিনী কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কহিল, "দাদা, আমি প্রমাণের কোনো অপেক্ষা রাখি না। তোমরা তাঁহার বিচার করিতে চাও করো—আমি তাঁহার বিচারক নই।"

যোগেন্দ্র। তোমার সঙ্গে যাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সে কি আমাদের নিঃসম্পর্ক ?

হেমনলিনী। বিবাহের কথা কে বলিতেছে ? তোমরা ভাঙিয়া দিতে চাও, ভাঙিয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙাইবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।

বলিতে বলিতে হেমনলিনী স্বরবদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "চলো হেম, আমরা উপরে যাই।"

২৩

স্টীমার ছাড়িয়া দিল। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কেহই ছিল না। রমেশ একটি কামরা বাছিয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া দিল। সকালবেলায় দুধ খাইয়া সেই কামরার দরজা খুলিয়া কমলা নদী ও নদীতীর দেখিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, "জান কমলা, আমরা কোথায় যাইতেছি ?"

কমলা কহিল, "দেশে যাইতেছি।"

রমেশ। দেশ তো তোমার ভালো লাগে না—আমরা দেশে যাইব না।

কমলা। আমার জন্যে তুমি দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছ?

রমেশ। হাঁ, তোমারই জন্যে।

কমলা মুখ ভার করিয়া কহিল, "কেন তা করিলে? আমি একদিন কথায় কথায় কী বলিয়াছিলাম, সেটা বুঝি এমন করিয়া মনে লইতে আছে? তুমি কিন্তু ভারি অল্পেতেই রাগ কর।"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। দেশে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই।"

কমলা তখন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমরা কোথায় যাইতেছি?"

রমেশ। পশ্চিমে।

'পশ্চিমে' শুনিয়া কমলার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পশ্চিম! যে-লোক চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়াছে, এক 'পশ্চিম' বলিতে তাহার কাছে কতখানি বোঝায়। পশ্চিমে তীর্থ, পশ্চিমে স্বাস্থ্য, পশ্চিমে নব নব দেশ, নব নব দৃশ্য, কত রাজা ও সম্রাটের পুরাতন কীর্তি, কত কারুখচিত দেবালয়, কত প্রাচীন কাহিনী, কত বীরত্বের ইতিহাস।

কমলা পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পশ্চিমে আমরা কোথায় যাইতেছি?"

রমেশ কহিল, "কিছুই ঠিক নাই। মুঙ্গের, পাটনা, দানাপুর, বকসার, গাজিপুর, কাশী, যেখানে হউক, এক জায়গায় গিয়া উঠা যাইবে।"

এই সকল কতক-জানা এবং না-জানা শহরের নাম শুনিয়া কমলার কল্পনাবৃত্তি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে হাততালি দিয়া কহিল, "ভারি মজা হইবে।"

রমেশ কহিল, "মজা তো পরে হইবে, কিন্তু এ কয়দিন খাওয়াদাওয়ার কী করা যাইবে? তুমি খালাসিদের হাতের রান্না খাইতে পারিবে?"

কমলা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "মাগো! সে আমি পারিব না।"

রমেশ। তাহা হইলে কী উপায় করিবে?

কমলা। কেন, আমি নিজে রাঁধিয়া লইব।

রমেশ। তুমি রাঁধিতে পার?

কমল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি আমাকে কী যে ভাব, জানি না। রাঁধিতে পারি না তো কী? আমি কি কচি খুকী? মামার বাড়িতে আমি তো বরাবর রাঁধিয়া আসিয়াছি।"

রমেশ তৎক্ষণাৎ অনুতাপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তাই তো, তোমাকে এই

প্রশ্নটা করা ঠিক সংগত হয় নাই। তাহা হইলে এখন হইতে রাঁধিবার জোগাড় করা যাক—কী বল ?”

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল এবং সন্ধান করিয়া এক লোহার উনুন সংগ্রহ করিল। শুধু তাই নয়, কাশী পৌঁছাইয়া দিবার খরচ ও বেতনের প্রলোভনে উমেশ বলিয়া এক কায়স্থবালককে জলতোলা, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নিযুক্ত করিল।

রমেশ কহিল, “কমলা, আজ কী রান্না হইবে ?”

কমলা কহিল, “তোমার তো ভারি জোগাড় আছে ! এক ডাল আর চাল—আজ খিচুড়ি হইবে।”

রমেশ খালাসিদের নিকট হইতে কমলার নির্দেশমতো মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

রমেশের অনভিজ্ঞতায় কমলা হাসিয়া উঠিল, কহিল, “শুধু মসলা লইয়া কী করিব ? শিল-নোড়া নহিলে বাটিব কী করিয়া ? তুমি তো বেশ !”

বালিকার এই অবজ্ঞা বহন করিয়া রমেশ শিল-নোড়ার সন্ধানে ছুটিল। শিল-নোড়া না পাইয়া খালাসিদের কাছ হইতে এক লোহার হামানদিস্তা ধার করিয়া আনিল।

হামানদিস্তায় মসলা কোটা কমলার অভ্যাস ছিল না। অগত্যা তাহাই লইয়া বসিতে হইল। রমেশ কহিল, “মসলা না হয় আর কাহাকেও দিয়া পিষাইয়া আনিতেছি।”

কমলার তাহা মনঃপূত হইল না। সে নিজেই উৎসাহসহকারে কাজ আরম্ভ করিল। এই অনভ্যস্ত প্রণালীর অসুবিধাতে তাহার কৌতুকবোধ হইল। মসলা লাফাইয়া উঠিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে, আর সে হাসি রাখিতে পারে না। তাহার এই হাসি দেখিয়া রমেশেরও হাসি পায়।

এইরূপে মসলা কোটার অধ্যায় শেষ করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া একটা দরমা-ঘেরা জায়গায় কমলা রান্না চড়াইয়া দিল। কলিকাতা হইতে একটা হাঁড়িতে করিয়া সন্দেশ আনা হইয়াছিল, সেই হাঁড়িতেই কাজ চালাইয়া লইতে হইল।

রান্না চড়াইয়া দিয়া কমলা রমেশকে কহিল, “তুমি যাও, শীঘ্র স্নান করিয়া লও— আমার রান্না হইতে বেশি দেরি হইবে না।”

রান্নাও হইল, রমেশও স্নান করিয়া আসিল। এখন প্রশ্ন উঠিল, থাল তো নাই, কিসে খাওয়া যায় ?

রমেশ অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, “খালাসিদের কাছ হইতে সানকি ধার করিয়া আনা যাইতে পারে।”

কমলা কহিল, "ছি !"

রমেশ মৃদুস্বরে জানাইল, এরূপ অনাচার পূর্বেও তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কমলা কহিল, "পূর্বে যা হইয়াছে, তা হইয়াছে, এখন হইতে হইবে না—আমি ও দেখিতে পারিব না।"

এই বলিয়া সে সেই সন্দেশের মুখে যে সরা ছিল, তাহাই ভালো করিয়া ধুইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। কহিল, "আজকের মতো তুমি ইহাতেই খাও, পরে দেখা যাইবে।"

জল দিয়া ধুইয়া আহারস্থান প্রস্তুত হইলে রমেশ শুদ্ধভাবে খাইতে বসিয়া গেল। দুই-এক গ্রাস মুখে তুলিয়া কহিল, "বাঃ, চমৎকার হইয়াছে।"

কমলা লজ্জিত হইয়া কহিল, "যাও, ঠাট্টা করিতে হইবে না।"

রমেশ কহিল, "ঠাট্টা নয়, তাহা এখনি দেখিতে পাইবে।" বলিয়া পাতের অন্ন দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ করিয়া আবার চাহিল। কমলা এবারে অনেক বেশি করিয়া দিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ও কী করিতেছ ? তোমার নিজের জন্য কিছু আছে তো ?"

"ঢের আছে—সে-জন্যে তোমার ভাবিতে হইবে না।"

রমেশের তৃপ্তিপূর্বক আহারে কমলা ভারি খুশি হইল। রমেশ কহিল, "তুমি কিসে খাইবে ?"

কমলা কহিল, "কেন, ওই সরাতেই হইবে।"

রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "না, সে হইতেই পারে না।"

কমলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কেন, হইবে না কেন ?"

রমেশ কহিল, "না না, সে কি হয়।"

কমলা কহিল, "খুব হইবে—আমি সব ঠিক করিয়া লইতেছি। উমেশ, তুই কিসে খাইবি ?"

উমেশ কহিল "মাঠাকরুন, নিচে ময়রা খাবার বেচিতেছে, তাহার কাছ হইতে শালপাতা চাহিয়া আনিতেছি।"

রমেশ কহিল, "তুমি যদি ওই সরাতেই খাইবে তো আমাকে দাও, আমি ভালো করিয়া ধুইয়া আনিতেছি।"

কমলা কেবল সংক্ষেপে কহিল, "পাগল হইয়াছ।" ক্ষণকাল পরে সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু পান তৈরি করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে পান আনাইয়া দাও নাই।"

রমেশ কহিল, "নিচে পানওয়ালা পান বেচিতেছে।"

এমনি করিয়া অতি সহজেই ঘরকন্না শুরু হইল। রমেশ মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, "দাম্পত্যের ভাবকে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়?"

গৃহিণীর পদ অধিকার করিয়া লইবার জন্য কমলা বাহিরের কোনো সহায়তা বা শিক্ষার প্রত্যাশা রাখে না। সে যতদিন তাহার মামার বাড়িতে ছিল, রাঁধিয়াছে-বাড়িয়াছে, ছেলে মানুষ করিয়াছে, ঘরের কাজ চালাইয়াছে। তাহার নৈপুণ্য, তৎপরতা ও কর্মের আনন্দ দেখিয়া রমেশের ভারি সুন্দর লাগিল—কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সে ভাবিতে লাগিল,—ভবিষ্যতে ইহাকে লইয়া কী ভাবে চলা যাইবে? ইহাকে কেমন করিয়া কাছে রাখিব, অথচ দূরে রাখিয়া দিব? দুই জনের মাঝখানে গণ্ডির রেখাটা কোন্‌খানে টানা উচিত? উভয়ের মধ্যে যদি হেমনলিনী থাকিত, তাহা হইলে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিত। কিন্তু সে-আশা যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে একলা কমলাকে লইয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা যে কী করিয়া হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। রমেশ স্থির করিল, আসল কথাটা কমলাকে খুলিয়া বলাই উচিত, ইহার পর আর চাপিয়া রাখা চলে না।

২৪

তখনো বেলা হয় নাই, এমন সময় স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেল। সেদিন অনেক ঠেলাঠেলিতেও স্টীমার ভাসিল না। উঁচু পাড়ের নিচে জলচর পাখিদের পদাঙ্কখচিত এক স্তর বালুকাময় নিম্নতট কিছুদূর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া নদীতে আসিয়া নামিয়াছে। সেইখানে গ্রামবধূরা তখন দিনান্তের শেষ জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য ঘট লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রগল্‌ভা বিনা অবগুণ্ঠনে এবং কোনো কোনো ভীরু ঘোমটার অন্তরাল হইতে স্টীমারের দিকে চাহিয়া কৌতূহল মিটাইতেছিল। ঊর্ধ্বনাসিক স্পর্ধিত জলযানটার দুর্বিপাকে গ্রামের ছেলেগুলা পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিল।

ওপারের জনশূন্য চরের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। রমেশ জাহাজের রেলিং ধরিয়া সন্ধ্যার আভায় দীপ্যমান পশ্চিম-দিগন্তের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। কমলা তাহার বেড়া-দেওয়া রাঁধিবার জায়গা হইতে আসিয়া কামরার দরজার পাশে দাঁড়াইল। রমেশ শীঘ্র পশ্চাতে মুখ ফিরাইবে, এমন সম্ভাবনা না দেখিয়া সে মৃদুভাবে একটু-

আধটু কাসিল—তাহাতেও কোনো ফল হইল না—অবশেষে তাহার চাবির গোছা দিয়া দরজায় ঠকঠক করিতে লাগিল। শব্দ যখন প্রবলতর হইল, তখন রমেশ মুখ ফিরাইল। কমলাকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া কহিল, "এ তোমার কী-রকম ডাকিবার প্রণালী ?"

কমলা কহিল, "তা, কী রকম করিয়া ডাকিব ?"

রমেশ কহিল, "কেন, বাপমায়ে আমার নামকরণ করিয়াছিলেন কিসের জন্য,—যদি কোনো ব্যবহারেই না লাগিবে ? প্রয়োজনের সময় আমাকে রমেশবাবু বলিয়া ডাকিলে ক্ষতি কী ?"

আবার সেই একই রকম ঠাট্টা ! কমলার কপোলে এবং কর্ণমূলে সন্ধ্যার আভার উপরে আরও একটুখানি রক্তিম আভা যোগ দিল ;—সে মাথা বাঁকাইয়া কহিল, "তুমি কী যে বল, তাহার ঠিক নাই। শোনো, তোমার খাবার তৈরি ; একটু সকাল-সকাল খাইয়া লও। আজ ও-বেলায় ভালো করিয়া খাওয়া হয় নাই।"

নদীর বাতাসে রমেশের ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। আয়োজনের অভাবে পাছে কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেইজন্য কিছুই বলে নাই—এমন সময়ে অযাচিত আহারের সংবাদে তাহার মনে যে একটা সুখের আন্দোলন তুলিল, তাহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল। কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির আসন্ন সম্ভাবনার সুখ নহে—কিন্তু সে যখন জানিতেছে না, তখনো যে তাহার জন্য একটি চিন্তা জাগ্রত আছে, একটি চেষ্টা ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটি কল্যাণের বিধান স্বতই কাজ করিয়া চলিয়াছে, ইহার গৌরব সে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু ইহা তাহার প্রাপ্য নহে, এত বড়ো জিনিসটা কেবল ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—এই চিন্তার নিষ্ঠুর আঘাতও সে এড়াইতে পারিল না—সে শির নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কমলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার বুঝি খাইতে ইচ্ছা নাই ? ক্ষুধা পায় নাই ? আমি কি তোমাকে জোর করিয়া খাইতে বলিতেছি ?"

রমেশ তাড়াতাড়ি প্রফুল্লতার ভান করিয়া কহিল, "তোমাকে জোর করিতে হইবে কেন, আমার পেটের মধ্যেই জোর করিতেছে। এখন তো খুব চাবি ঠকঠক করিয়া ডাকিয়া আনিলে, শেষকালে পরিবেষণের সময় যেন দর্পহারী মধুসূদন দেখা না দেন।"

এই বলিয়া রমেশ চারিদিকে চাহিয়া কহিল, "কই, খাদ্যদ্রব্য তো কিছু দেখি না। খুব ক্ষুধার জোর থাকিলেও এই আসবাবগুলা আমার হজম হইবে না—ছেলেবেলা

হইতে আমার অন্যরকম অভ্যাস।" রমেশ কামরার বিছানা প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ থামিলে কহিল, "এখন বুঝি আর সবুর সহিতেছে না? যখন আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিলে, তখন বুঝি ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না? আর যেমনি আমি ডাকিলাম, অমনি মনে পড়িয়া গেল ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে। আচ্ছা, তুমি এক মিনিট বসো, আমি আনিয়া দিতেছি।"

রমেশ কহিল, "কিন্তু দেরি হইলে এই বিছানাপত্র কিছুই দেখিতে পাইবে না— তখন আমার দোষ দিয়ো না।"

রসিকতার এই পুনরুক্তিতে কমলার কম আমোদবোধ হইল না। তাহার আবার ভারি হাসি পাইল। সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে ঘরকে সুধাময় করিয়া দিয়া কমলা দ্রুতপদে খাবার আনিতে গেল। রমেশের কাষ্ঠপ্রফুল্লতার ছদ্মদীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাপ্ত হইল।

উপরে-শালপাত-ঢাকা একটা চাঙারি লইয়া অনতিকাল পরেই কমলা কামরায় প্রবেশ করিল। বিছানার উপরে চাঙারি রাখিয়া আঁচল দিয়া ঘরের মেজে মুছিতে লাগিল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ও কী করিতেছ?"

কমলা কহিল, "আমি তো এখনি কাপড় ছাড়িয়া ফেলিব।" এই বলিয়া শালপাতা তুলিয়া পাতিল ও তাহার উপরে লুচি ও তরকারি নিপুণহস্তে সাজাইয়া দিল।

রমেশ কহিল, "কী আশ্চর্য। লুচির জোগাড় করিলে কী করিয়া?"

কমলা সহজে রহস্য ফাঁস না করিয়া অত্যন্ত নিগূঢ়ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "কেমন করিয়া বলো দেখি?"

রমেশ কঠিন চিন্তার ভান করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই খালাসিদের জলখাবার হইতে ভাগ বসাইয়াছ।"

কমলা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কক্‌খনো না। রাম বলো!"

রমেশ খাইতে খাইতে লুচির আদিকারণ সম্বন্ধে যত-রাজ্যের অসম্ভব কল্পনা দ্বারা কমলাকে রাগাইয়া তুলিল। যখন বলিল, "আরব্য উপন্যাসের প্রদীপওয়ালা আলাদীন বেলুচিস্থান হইতে গরম-গরম ভাজাইয়া তাহার দৈত্যকে দিয়া সওগাদ পাঠাইয়াছে," তখন কমলার আর ধৈর্য কিছুতেই রহিল না—সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "তবে যাও— আমি বলিব না।"

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, আমি হার মানিতেছি। মাঝদরিয়ায় লুচি—

এ যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আমি তো ভাবিয়া পাইতেছি না—কিন্তু তবু খাইতে চমৎকার লাগিতেছে।"

এই বলিয়া রমেশ তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা ক্ষুধানিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সবেগে সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেলে, শূন্যভাণ্ডারপূরণের চেষ্টায় কমলা উমেশকে গ্রামে পাঠাইয়াছিল। স্কুলে থাকিতে জলপানিস্বরূপে রমেশ কমলাকে যে কয়টি টাকা দিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে অল্প কিছু বাঁচিয়াছিল, তাহাই দিয়া কিছু ঘি-ময়দা সংগ্রহ হইল। উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কী খাবি বল্ দেখি।"

উমেশ কহিল, "মাঠাকরুন, দয়া কর যদি, গ্রামে গোয়ালার বাড়িতে বড়ো সরেস দই দেখিয়া আসিলাম কলা তো ঘরেই আছে, আর পয়সা-দুয়েকের চিঁড়ে-মুড়কি হইলেই পেট ভরিয়া আজ ফলার করিয়া লই।"

লুব্ধ বালকের ফলারের উৎসাহে কমলাও উৎসাহিত হইয়া উঠিল—কহিল, "পয়সা কিছু বাঁচিয়াছে উমেশ ?"

উমেশ কহিল, "কিছু না মা।"

কমলা মুশকিলে পড়িয়া গেল। রমেশের কাছে কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া টাকা চাহিবে, তাই ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বলিল, "তোর ভাগ্যে আজ যদি ফলার না-ই জোটে, তবে লুচি আছে—তোর ভাবনা নাই। চল্, ময়দা মাখবি চল্।"

উমেশ কহিল, "কিন্তু মা, দই যা দেখিয়া আসিলাম, সে আর কী বলিব।"

কমলা কহিল, "দেখ্ উমেশ, বাবু যখন খাইতে বসিবেন, তখন তুই তোর বাজারের পয়সা চাহিতে আসিস।"

রমেশের আহার কতকটা অগ্রসর হইলে, উমেশ আসিয়া দাঁড়াইয়া সসংকোচে মাথা চুলকাইতে লাগিল। রমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে অর্ধোক্তিতে কহিল, "মা, বাজারের পয়সা—"

তখন রমেশের হঠাৎ চেতনা হইল যে, আহারের আয়োজন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা করিলে চলে না। ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কমলা, তোমার কাছে তো টাকা কিছুই নাই। আমাকে মনে করাইয়া দাও নাই কেন ?"

কমলা নীরবে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আহারান্তে রমেশ কমলার হাতে একটি ছোটো ক্যাশবাক্স দিয়া কহিল, "এখনকার মতো তোমার ধনরত্ন সব এইটেতেই রহিল।"

এইরূপে গৃহিণীপনার সমস্ত ভারই আপনা হইতেই কমলার হাতে গিয়া পড়িতেছে, রমেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আবার এক বার জাহাজের রেলিং ধরিয়া পশ্চিম-আকাশের দিকে চাহিল। পশ্চিম-আকাশ দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের উপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া আসিল;

উমেশ আজ পেট ভরিয়া চিঁড়ে দই কলা মাখিয়া ফলার করিল। কমলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে আয়ত্ত করিয়া লইল।

বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ কাশীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল—সে কহিল, "মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ, তবে আমি আর কোথাও যাই না।"

মাতৃহীন বালকের মুখে মা-সম্ভাষণ শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয়ের কোন্-এক গভীরদেশ হইতে জননী সাড়া দিল—কমলা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "বেশ তো উমেশ, তুই আমাদের সঙ্গেই চল্।"

২৫

তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের মধ্যে সমস্তদিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না;—একটিমাত্র বড়ো ডিঙি গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল।

রমেশ জাহাজের ছাদের সম্মুখভাগে নবোদিত শুক্লপক্ষের তরুণ চাঁদের আলোকে বেতের কেদারা টানিয়া লইয়া বসিয়া ছিল।

পশ্চিম-আকাশ হইতে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া গেল; চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে কঠিন জগৎ যেন বিগলিত হইয়া আসিল। রমেশ আপনা-আপনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "হেম, হেম।" সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন সুমধুর-স্পর্শরূপে তাহার সমস্ত হৃদয়কে বারংবার বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল—সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন অপরিমেয়-করুণারসার্দ্র দুইটি ছায়াময় চক্ষুরূপে তাহার মুখের উপরে বেদনা বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল। রমেশের সর্বশরীর পুলকিত এবং দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তাহার গত দুই বৎসরের জীবনের সমস্ত ইতিহাস তাহার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল ;—হেমনলিনীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের দিন মনে পড়িয়া গেল। সেদিনকে রমেশ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যোগেন্দ্র যখন তাহাকে তাহাদের চায়ের টেবিলে লইয়া গেল, সেখানে হেমনলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লাজুক রমেশ আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। অল্পে অল্পে লজ্জা ভাঙিয়া গেল, হেমনলিনীর সঙ্গ অভ্যস্ত হইয়া আসিল, ক্রমে সেই অভ্যাসের বন্ধন রমেশকে বন্দী করিয়া তুলিল। কাব্যসাহিত্যে রমেশ প্রেমের কথা যাহা-কিছু পড়িয়াছিল, সমস্তই সে হেমনলিনীর প্রতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিল। আমি ভালোবাসিতেছি মনে করিয়া সে মনে মনে একটা অহংকার অনুভব করিল। তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভালোবাসার কবিতার অর্থ মুখস্থ করিয়া মরে—আর রমেশ সত্যসত্যই ভালোবাসে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্য ছাত্রদিগকে সে কৃপাপাত্র মনে করিত। রমেশ আজ আলোচনা করিয়া দেখিল, সেদিনও সে ভালোবাসার বহির্দ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবন-সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল, তখনি নানা বিরুদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া জীবন গ্রহণ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহার দুই করতলের উপরে শির নত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্মুখে সমস্ত জীবনই তো পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার ক্ষুধিত উপবাসী জীবন, দুশ্ছেদ্য সংকটজালে বিজড়িত। এ-জাল কি সে সবলে দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবে না ?

এই বলিয়া সে দৃঢ়সংকল্পের আবেগে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, অদূরে আর-একটা বেতের চৌকির পিঠের উপরে হাত রাখিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে। কমলা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, আমি বুঝি তোমাকে জাগাইয়া দিলাম ?"

অনুতপ্ত কমলাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না কমলা, আমি ঘুমাই নাই—তুমি বসো, তোমাকে একটা গল্প বলি।"

গল্পের কথা শুনিয়া কমলা পুলকিত হইয়া চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। রমেশ স্থির করিয়াছিল, কমলাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এত বড়ো একটা আঘাত হঠাৎ সে দিতে পারিল না—তাই বলিল, "বসো, তোমাকে একটা গল্প বলি।"

রমেশ কহিল, "সেকালে এক জাতি ক্ষত্রিয় ছিল, তাহারা—"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কবেকার কালে ? অনে—ক কাল আগে ?"

রমেশ কহিল, "হাঁ, সে অনেক কাল আগে। তখন তোমার জন্ম হয় নাই।"

কমলা। তোমারই নাকি জন্ম হইয়াছিল! তুমি নাকি ও-কালের সাক্ষী! তার পরে?

রমেশ। সেই ক্ষত্রিয়দের নিয়ম ছিল, তাহারা নিজে বিবাহ করিতে না গিয়া তলোয়ার পাঠাইয়া দিত। সেই তলোয়ারের সহিত বধূর বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে বাড়িতে আনিয়া আবার বিবাহ করিত।

কমলা। না না, ছিঃ! ও কী রকম বিবাহ!

রমেশ। আমিও ও-রকম বিবাহ পছন্দ করি না—কিন্তু কী করিব—যে ক্ষত্রিয়দের কথা বলিতেছি, তাহারা শ্বশুরবাড়ি নিজে গিয়া বিবাহ করিতে অপমান বোধ করিত। আমি যে-রাজার গল্প বলিতেছি, সে ওই জাতের ক্ষত্রিয় ছিল। এক দিন সে—

কমলা। তুমি তো বলিলে না, সে কোথাকার রাজা?

রমেশ বলিয়া দিল, "মদ্রদেশের রাজা। এক দিন সেই রাজা—"

কমলা। রাজার নাম কী আগে বলো।

কমলা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লইতে চায়—তাহার কাছে কিছুই উহ্য রাখিলে চলিবে না। রমেশ এতটা জানিলে আগে হইতে আরও বেশি প্রস্তুত হইয়া থাকিত—এখন দেখিল, কমলার গল্প শুনিতে যতই আগ্রহ থাক, গল্পের কোনো জায়গায় তাহার ফাঁকি সহ্য হয় না।

রমেশ হঠাৎ প্রশ্নে একটু থমকিয়া বলিল, "রাজার নাম রণজিৎ সিং।"

কমলা এক বার আবৃত্তি করিয়া লইল, "রণজিৎ সিং, মদ্রদেশের রাজা। তার পরে?"

রমেশ। তার পরে এক দিন রাজা ভাটের মুখে শুনিলেন, তাঁহারই জাতের আর এক রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে।

কমলা। সে আবার কোথাকার রাজা?

রমেশ। মনে করো, সে কাঞ্চীর রাজা।

কমলা। মনে করিব কী। তবে সত্য কি সে কাঞ্চীর রাজা নয়?

রমেশ। কাঞ্চীরই রাজা বটে। তুমি তার নাম জানিতে চাও? তার নাম অমরসিং।

কমলা। সেই মেয়ের নাম তো বলিলে না? সেই পরমাসুন্দরী কন্যা।

রমেশ। হাঁ হাঁ, ভুল হইয়াছে বটে। সেই মেয়ের নাম—তাহার নাম—ওঃ, তাহার নাম চন্দ্রা—

কমলা। আশ্চর্য! তুমি এমন ভুলিয়া যাও! তুমি তো আমারই নাম ভুলিয়াছিলে।

রমেশ। কোশলের রাজা ভাটের মুখে এই কথা শুনিয়া—

কমলা। কোশলের রাজা কোথা হইতে আসিল? তুমি যে বলিলে মদ্র-দেশের রাজা—

রমেশ। সে কি এক জায়গার রাজা ছিল মনে কর? সে কোশলেরও রাজা, মদ্রেরও রাজা।

কমলা। দুই রাজ্য বুঝি পাশাপাশি?

রমেশ। একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও।

এইরূপে বারংবার ভুল করিতে করিতে ও সতর্ক কমলার প্রশ্নের সাহায্যে সেই সকল ভুল কোনোমতে সংশোধন করিতে করিতে রমেশ এইরূপ ভাবে গল্পটি বলিয়া গেল—

> "মদ্ররাজ রণজিৎ সিং কাঞ্চীরাজের নিকট রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানাইয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। কাঞ্চীর রাজা অমরসিং খুশি হইয়া সম্মত হইলেন।
>
> "তখন রণজিৎ সিংহের ছোটো ভাই ইন্দ্রজিৎ সিং সৈন্যসামন্ত লইয়া নিশান উড়াইয়া কাড়া-নাকাড়া দুন্দুভি-দামামা বাজাইয়া কাঞ্চীর রাজোদ্যানে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন। কাঞ্চীনগরে উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল।
>
> "রাজার দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া শুভ দিনক্ষণ স্থির করিয়া দিল। কৃষ্ণা দ্বাদশীতিথিতে রাত্রি আড়াই প্রহরের পর লগ্ন। রাত্রে নগরের ঘরে ঘরে ফুলের মালা দুলিল এবং দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। আজ রাত্রে রাজকুমারী চন্দ্রার বিবাহ।
>
> "কিন্তু কাহার সহিত বিবাহ, রাজকন্যা চন্দ্রা সে-কথা জানেন না। তাঁহার জন্মকালে পরমহংস পরমানন্দস্বামী রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার এই কন্যার প্রতি অশুভগ্রহের দৃষ্টি আছে, বিবাহকালে পাত্রের নাম যেন এ কন্যা জানিতে না পাবে।'
>
> "যথাকালে তরবারির সহিত রাজকন্যার গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ সিং যৌতুক আনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে প্রণাম করিলেন। মদ্ররাজ্যের রণজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ যেন দ্বিতীয় রামলক্ষ্মণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ

আর্য চন্দ্রার অবগুণ্ঠিত লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকাইলেন না—তিনি কেবল তাঁহার নূপুরবেষ্টিত সুকুমার চরণযুগলের অলক্ত-রেখাটুকুমাত্র দেখিয়াছিলেন।

"যথারীতি বিবাহের পরদিনেই মুক্তামালার ঝালর-দেওয়া পালঙ্কে বধূকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ স্বদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। অশুভগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কাঞ্চীরাজ কন্যার মস্তকের উপরে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন—মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না—দেবমন্দিরে সহস্র গ্রহবিপ্র স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইল।

"কাঞ্চী হইতে মদ্র বহুদূর—প্রায় এক মাসের পথ। দ্বিতীয় রাত্রে যখন বেতসা-নদীর তীরে শিবির রাখিয়া ইন্দ্রজিতের দলবল বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বনের মধ্যে মশালের আলো দেখা গেল। ব্যাপারখানা কী, জানিবার জন্য ইন্দ্রজিৎ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

"সৈনিক আসিয়া কহিল, 'কুমার, ইহারাও আর-একটি বিবাহের যাত্রিদল। ইহারাও আমাদের স্বশ্রেণীয় ক্ষত্রিয়—অম্বোদ্বাহ সমাধা করিয়া বধূকে পতিগৃহে লইয়া চলিয়াছে। পথে নানা বিঘ্নভয় আছে, তাই ইহারা কুমারের শরণ প্রার্থনা করিতেছে—আদেশ পাইলে কিছুদূর পথ ইহারা আমাদের আশ্রয়ে যাত্রা করে।'

"কুমার ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, 'শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম। যত্ন করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।'

"এইরূপে দুই শিবির একত্র মিলিত হইল।

"তৃতীয় রাত্রি অমাবস্যা। সম্মুখে ছোটো ছোটো পাহাড়, পশ্চাতে অরণ্য। শ্রান্ত সৈনিকেরা ঝিল্লীর শব্দে ও অদূরবর্তী ঝরনার কলধ্বনিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

"এমন সময়ে হঠাৎ কলরবে সকলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মদ্র-শিবিরের ঘোড়াগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে—কে তাহাদের রজ্জু কাটিয়া দিয়াছে—এবং মাঝে মাঝে এক একটা তাঁবুতে আগুন লাগিয়াছে ও তাহার দীপ্তিতে অমারাত্রি রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"বুঝা গেল, দস্যু আক্রমণ করিয়াছে। মারামারি-কাটাকাটি বাধিয়া গেল—অন্ধকারে শত্রু-মিত্র ভেদ করা কঠিন। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল—দস্যুরা সেই সুযোগে লুটপাট করিয়া অরণ্যে-পর্বতে অন্তর্ধান করিল।

"যুদ্ধ-অন্তে রাজকুমারীকে আর দেখা গেল না। তিনি ভয়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এক দল পলায়নপর লোককে স্বপক্ষ মনে করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন।

"তাহারা অন্য বিবাহের দল। গোলেমালে তাহাদের বধূকে দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া গেছে। রাজকন্যা চন্দ্রাকেই তাহারা নিজেদের বধূ জ্ঞান করিয়া দ্রুতবেগে স্বদেশে যাত্রা করিল।

"তাহারা দরিদ্র ক্ষত্রিয়; কলিঙ্গে সমুদ্রতীরে তাহাদের বাস। সেখানে রাজকন্যার সহিত অন্যপক্ষের বরের মিলন হইল। বরের নাম চেৎসিং।

"চেৎসিংহের মা আসিয়া বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। আত্মীয়স্বজন সকলে আসিয়া কহিল, 'আহা, এমন রূপ তো দেখা যায় না।'

"মুগ্ধ চেৎসিং নববধূকে ঘরের কল্যাণলক্ষ্মী বলিয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিল। রাজকন্যাও সতীধর্মের মর্যাদা বুঝিতেন—তিনি চেৎসিংকে আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

"নবপরিণয়ের লজ্জা ভাঙিতে কিছুদিন গেল। যখন লজ্জা ভাঙিল, তখন কথায় কথায় চেৎসিং জানিতে পারিল যে, যাহাকে সে বধূ বলিয়া ঘরে লইয়াছে, সে রাজকন্যা চন্দ্রা।"

২৬

কমলা রুদ্ধনিশ্বাসে একান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে?"

রমেশ কহিল, "এই পর্যন্তই জানি, তার পরে আর জানি না। তুমিই বলো দেখি, তার পরে কী।"

কমলা। না না, সে হইবে না, তার পরে কী আমাকে বলো।

রমেশ। সত্য বলিতেছি, যে-গ্রন্থ হইতে এই গল্প পাইয়াছি, তাহা এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই—শেষের অধ্যায়গুলি কবে বাহির হইবে, কে জানে।

কমলা অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "যাও, তুমি ভারি দুষ্ট। তোমার ভারি অন্যায়।"

রমেশ। যিনি বই লিখিতেছেন, তাঁর সঙ্গে রাগারাগি করো। তোমাকে আমি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, চন্দ্রাকে লইয়া চেৎসিং কী করিবে?

কমলা তখন নদীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—অনেকক্ষণ পরে কহিল, "আমি জানি না, সে কী করিবে—আমি তো ভাবিয়া উঠিতে পারি না।"

রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল—কহিল, "চেংসিং কি সকল কথা চন্দ্রাকে প্রকাশ করিয়া বলিবে ?"

কমলা কহিল, "তুমি বেশ যা হ'ক, না বলিয়া বুঝি সমস্ত গোলমাল করিয়া রাখিবে ? সে যে বড়ো বিশ্রী। সমস্ত স্পষ্ট হওয়া চাই তো।"

রমেশ যন্ত্রের মতো কহিল, "তা তো চাই।"

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, "আচ্ছা কমল, যদি—"

কমলা। যদি কী ?

রমেশ। মনে করো, আমিই যদি সত্য চেংসিং হই, আর তুমি যদি চন্দ্রা হও—

কমলা বলিয়া উঠিল, "তুমি অমন কথা আমাকে বলিয়ো না ; সত্য বলিতেছি, আমার ভালো লাগে না।"

রমেশ। না, তোমাকে বলিতেই হইবে।—তাহা হইলে আমারই বা কী কর্তব্য, আর তোমারই বা কর্তব্য কী ?

কমলা এ-কথার কোনো উত্তর না করিয়া চৌকি ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দেখিল, উমেশ তাহাদের কামরার বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কখনো ভূত দেখিয়াছিস ?"

উমেশ কহিল, "দেখিয়াছি মা।"

শুনিয়া কমলা অনতিদূর হইতে একটা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিল—কহিল, "কী রকম ভূত দেখিয়াছিলি বল্।"

কমলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে রমেশ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল না। চন্দ্রখণ্ড তাহার চোখের সম্মুখে ঘন বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ডেকের উপরকার আলো নিবাইয়া দিয়া তখন সারেং-খালাসিরা জাহাজের নিচের তলায় আহার ও বিশ্রামের চেষ্টায় গেছে। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রী কেহই ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে জল ভাঙিয়া ডাঙায় নামিয়া গেছে। তীরে তিমিরাচ্ছন্ন ঝোপঝাপ-গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অদূরবর্তী বাজারের আলো দেখা যাইতেছে। পরিপূর্ণ নদীর খরস্রোত নোঙরের লোহার শিকলে ঝংকার দিয়া চলিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া জাহ্নবীর স্ফীত নাড়ির কম্পবেগ স্টীমারকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে।

এই অপরিস্ফুট বিপুলতা, এই অন্ধকারের নিবিড়তা, এই অপরিচিত দৃশ্যের প্রকাণ্ড

অপূর্বতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রমেশ তাহার কর্তব্য সমস্যা উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিল। রমেশ বুঝিল যে, হেমনলিনী কিংবা কমলা, উভয়ের মধ্যে এক জনকে বিসর্জন দিতেই হইবে। উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিবার কোনো মধ্যপথ নাই। তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে—এখনো হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কমলাকে ত্যাগ করিলে এ-জীবনে তাহার আর কোনো উপায় নাই।

মানুষের স্বার্থপরতার অন্ত নাই। হেমনলিনীর যে রমেশকে ভুলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার রক্ষার উপায় আছে—রমেশের সম্বন্ধে সে যে অনন্যগতি নহে, ইহাতে রমেশ কোনো সান্ত্বনা পাইল না, তাহার আগ্রহের অধীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি হেমনলিনী তাহার সম্মুখ দিয়া যেন স্খলিত হইয়া, চিরদিনের মতো অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, এখনো যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারা যায়।

দুই করতলের উপরে সে মুখ রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। দূরে শৃগাল ডাকিল, গ্রামে দুই-একটা অসহিষ্ণু কুকুর খেউ-খেউ করিয়া উঠিল। রমেশ তখন করতল হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা জনশূন্য অন্ধকার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া কহিল, "কমল, তুমি এখনো শুইতে যাও নাই? রাত তো কম হয় নাই।"

কমলা কহিল, "তুমি শুইতে যাইবে না?"

রমেশ কহিল, "আমি এখনি যাইব, পুবদিকের কামরায় আমার বিছানা হইয়াছে। তুমি আর দেরি করিয়ো না।"

কমলা আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল। সে আর রমেশকে বলিতে পারিল না যে, কিছুক্ষণ আগেই সে ভূতের গল্প শুনিয়াছে এবং তাহার কামরা নির্জন।

রমেশ কমলার অনিচ্ছুক মন্দপদবিক্ষেপে অন্তঃকরণে আঘাত পাইল—কহিল, "ভয় করিয়ো না কমল—তোমার কামরার পাশেই আমার কামরা—মাঝের দরজা খুলিয়া রাখিব।"

কমলা স্পর্ধাভরে তাহার শির একটুখানি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কহিল, "আমি ভয় করিব কিসের?"

রমেশ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া বাতি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল—মনে মনে কহিল, "কমলাকে পরিত্যাগ করিবার কোনো পথ নাই, অতএব হেমনলিনীকে বিদায়। আজ ইহাই স্থির হইল, আর দ্বিধা করা চলে না।"

হেমনলিনীকে বিদায় বলিতে যে জীবন হইতে কতখানি বিদায়, তাহা অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া রমেশ অনুভব করিতে লাগিল। রমেশ আর বিছানায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিয়া বাহিরে আসিল—নিশীথিনীর অন্ধকারে এক বার অনুভব করিয়া লইল যে, তাহারই লজ্জা, তাহারই বেদনা অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চিরকালের জ্যোতির্লোকসকল স্তব্ধ হইয়া আছে—রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না—এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নিষুপ্ত গ্রামগুলির বনপ্রান্তচ্ছায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে,—যখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিক্‌কার শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চিরধৈর্যময়ী ধরণীতে মিশাইয়া চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গেছে।

২৭

পরদিন কমলা যখন ঘুম হইতে জাগিল, তখন ভোর-রাত্রি। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। মনে পড়িয়া গেল, সে জাহাজে আছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিল, নিস্তব্ধ জলের উপর সূক্ষ্ম একটুখানি শুভ্র কুয়াশার আচ্ছাদন পড়িয়াছে—অন্ধকার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্বদিকে তরুশ্রেণীর পশ্চাতের আকাশে স্বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীর পাণ্ডুর নীল-ধারা জেলে-ডিঙির সাদা-সাদা পালগুলিতে খচিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কী-একটা গূঢ় বেদনা পীড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশিরবাষ্পাম্বরা উষা কেন আজ তাহার আনন্দ-মূর্তি উদ্‌ঘাটন করিতেছে না? কেন একটা অশ্রুজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠ বাহিয়া চোখের কাছে বার বার আকুল হইয়া উঠিতেছে? তাহার শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, সঙ্গিনী নাই, স্বজন-পরিজন কেহই নাই, এ-কথা কাল তো তাহার মনে ছিল না—ইতিমধ্যে কী ঘটিয়াছে, যাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশমাত্র তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র?

কমলা অনেকক্ষণ দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নদীর জলপ্রবাহ তরল স্বর্ণস্রোতের মতো জ্বলিতে লাগিল। খালাসিরা তখন কাজে লাগিয়াছে, এঞ্জিন ধক ধক করিতে আরম্ভ করিয়াছে—নোঙর-তোলা ও জাহাজ-ঠেলাঠেলির শব্দে অকাল-জাগ্রত শিশুর দল নদীর তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় রমেশ এই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া কমলার খবর লইবার জন্য তাহার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা চকিত হইয়া, আঁচল যথাস্থানে থাকা-সত্ত্বেও তাহা আর একটু টানিয়া আপনাকে যেন বিশেষভাবে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিল।

রমেশ কহিল, "কমলা, তোমার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়াছে ?"

এই প্রশ্নে কেন যে কমলার রাগ হইতে পারে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না। কিন্তু হঠাৎ রাগ হইল। সে অন্য দিকে মুখ করিয়া কেবল মাথা নাড়িল মাত্র।

রমেশ কহিল, "বেলা হইলে লোকজন উঠিয়া পড়িবে—এইবেলা তৈরি হইয়া লও না!"

কমলা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া একখানি কোঁচানো শাড়ি, গামছা ও একটি জামা চৌকির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে রমেশের পাশ দিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

রমেশ যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কমলাকে এই যত্নটুকু করিতে আসিল, ইহা কমলার কাছে কেবল যে অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হইল, তাহা নহে, ইহা যেন তাহাকে অপমান করিল। রমেশের আত্মীয়তার সীমা যে কেবল খানিকটা দূর পর্যন্ত, এক জায়গায় আসিয়া তাহা যে বাধিয়া যায়, ইহা সহসা কমলা অনুভব করিতে পারিয়াছে। শ্বশুর-বাড়ি কোনো গুরুজন তাহাকে লজ্জা করিতে শেখায় নাই—মাথায় কোন্ অবস্থায় ঘোমটার পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত, তাহাও তাহার অভ্যস্ত হয় নাই—কিন্তু রমেশ সম্মুখে আসিতেই আজ কেন অকারণে তাহার বুকের ভিতরটা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

স্নান সারিয়া কমলা যখন তাহার কামরায় আসিয়া বসিল, তখন তাহার দিনের কর্ম তাহার সম্মুখবর্তী হইল। কাঁধের উপর হইতে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা লইয়া কাপড়ের পোর্টম্যাণ্টো খুলিতেই তাহার মধ্যে ছোটো ক্যাশবাক্সটি নজরে পড়িল। এই ক্যাশবাক্সটি পাইয়া কাল কমলা একটি নূতন গৌরব লাভ করিয়াছিল। তাহার হাতে একটি স্বাধীন শক্তি আসিয়াছিল। তাই সে বহু যত্ন করিয়া বাক্সটি তাহার কাপড়ের তোরঙ্গের মধ্যে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কমলা সে-বাক্স হাতে তুলিয়া লইয়া উল্লাসবোধ করিল না। আজ এ-বাক্সকে ঠিক নিজের বাক্স মনে হইল না—ইহা রমেশেরই বাক্স। এ-বাক্সের মধ্যে কমলার পূর্ণস্বাধীনতা নাই। সুতরাং এ টাকার বাক্স কমলার পক্ষে একটা ভারমাত্র।

রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "খোলা বাক্সের মধ্যে কি হেঁয়ালির সন্ধান পাইয়াছ? চুপচাপ বসিয়া যে?"

কমলা ক্যাশবাক্স তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "এই তোমার বাক্স।"

রমেশ কহিল, "ও আমি লইয়া কী করিব।"

কমলা কহিল, "তোমার যেমন দরকার, সেই বুঝিয়া আমাকে জিনিসপত্র আনাইয়া দাও।"

রমেশ। তোমার বুঝি কিছুই দরকার নাই?

কমলা ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া কহিল, "টাকায় আমার কিসের দরকার।"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "এত বড়ো কথাটা কয়জন লোক বলিতে পারে। যা হ'ক, যেটা তোমার এত অনাদরের জিনিস, সেইটেই কি পরকে দিতে হয়? আমি ও লইব কেন?"

কমলা কোনো উত্তর না করিয়া মেজের উপর ক্যাশবাক্স রাখিয়া দিল।

রমেশ কহিল, "আচ্ছা কমলা, সত্য করিয়া বলো, আমি আমার গল্প শেষ করি নাই বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

কমলা মুখ নিচু করিয়া কহিল, "রাগ কে করিয়াছে?"

রমেশ। রাগ যে না করিয়াছে, সে ওই ক্যাশবাক্সটি রাখুক—তাহা হইলেই বুঝিব, তাহার কথা সত্য।

কমলা। রাগ না করিলেই বুঝি ক্যাশবাক্স রাখিতে হইবে? তোমার জিনিস তুমি রাখ না কেন?

রমেশ। আমার জিনিস তো নয়—দিয়া কাড়িয়া লইলে যে মরিয়া ব্রহ্মদৈত্য হইতে হইবে। আমার বুঝি সে-ভয় নাই?

রমেশের ব্রহ্মদৈত্য হইবার আশঙ্কায় কমলার হঠাৎ হাসি পাইয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "ককখনো না। দিয়া কাড়িয়া লইলে বুঝি ব্রহ্মদৈত্য হইতে হয়? আমি তো কখনো শুনি নাই।"

এই অকস্মাৎ হাসি হইতে সন্ধির সূত্রপাত হইল। রমেশ কহিল, "অন্যের কাছে কেমন করিয়া শুনিবে? যদি কখনো কোনো ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাও, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্যমিথ্যা জানিতে পারিবে।"

কমলা হঠাৎ কুতূহলী হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ঠাট্টা নয়—তুমি কখনো সত্যকার ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ?"

রমেশ কহিল, "সত্যকার নয়, এমন অনেক ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছি। ঠিক খাঁটি জিনিসটি সংসারে দুর্লভ।"

কমলা। কেন, উমেশ যে বলে—

রমেশ। উমেশ? উমেশ ব্যক্তিটি কে?

কমলা। আঃ, ওই যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে যাইতেছে, ও নিজে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছে।

রমেশ। এ-সমস্ত বিষয়ে আমি উমেশের সমকক্ষ নহি, এ-কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ইতিমধ্যে বহুচেষ্টায় খালাসির দল জাহাজ ভাসাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অল্প দূর গেছে, এমন সময়ে মাথায় একটা চাঙারি লইয়া একটা লোক তীর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাত তুলিয়া জাহাজ থামাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। সারেং তাহার ব্যাকুলতায় দৃক্‌পাত করিল না। তখন সে-লোকটা রমেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "বাবু বাবু" করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। রমেশ কহিল, "আমাকে লোকটা স্টীমারের টিকিটবাবু বলিয়া মনে করিয়াছে।" রমেশ তাহাকে দুই হাত ঘুরাইয়া জানাইয়া দিল, স্টীমার থামাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

হঠাৎ কমলা বলিয়া উঠিল, "ওই তো উমেশ। না না, ওকে ফেলিয়া যাইয়ো না—ওকে তুলিয়া লও।"

রমেশ কহিল, "আমার কথায় স্টীমার থামাইবে কেন?"

কমলা কাতর হইয়া কহিল, "না, তুমি থামাইতে বলো—বলো না তুমি—ডাঙা তো বেশি দূর নয়।"

রমেশ তখন সারেংকে গিয়া স্টীমার থামাইতে অনুরোধ করিল—সারেং কহিল, "বাবু, কোম্পানির নিয়ম নাই।"

কমলা বাহির হইয়া গিয়া কহিল, "উহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না—একটু থামাও। ও আমাদের উমেশ।"

রমেশ তখন নিয়মলঙ্ঘন ও আপত্তিভঞ্জনের সহজ উপায় অবলম্বন করিল। পুরস্কারের আশ্বাসে সারেং জাহাজ থামাইয়া উমেশকে তুলিয়া লইয়া তাহার প্রতি বহুতর ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কমলার পায়ের কাছে ঝুড়িটা নামাইয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে হাসিতে লাগিল।

কমলার তখনো বক্ষের ক্ষোভ দূর হয় নাই। সে কহিল, "হাসছিস যে! জাহাজ যদি না থামিত, তবে তোর কী হইত?"

উমেশ তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া ঝুড়িটা উজাড় করিয়া দিল। এক কাঁদি কাঁচকলা, কয়েক রকম শাক, কুমড়ার ফুল ও বেগুন বাহির হইয়া পড়িল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ-সমস্ত কোথা হইতে আনিলি?"

উমেশ, সংগ্রহের যাহা ইতিহাস দিল, তাহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক নহে। গতকল্য বাজার হইতে দধি প্রভৃতি কিনিতে যাইবার সময় সে গ্রামস্থ কাহারও বা চালে, কাহারও বা খেতে এই সমস্ত ভোজ্যপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছিল। আজ ভোরে জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে তীরে নামিয়া এইগুলি যথাস্থান হইতে চয়ন-নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কাহারও সম্মতির অপেক্ষা রাখে নাই।

রমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "পরের খেত হইতে তুই এই সমস্ত চুরি করিয়া আনিয়াছিস?"

উমেশ কহিল, "চুরি করিব কেন? খেতে কত ছিল, আমি অল্প এই কটি আনিয়াছি বই তো নয়, ইহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে?"

রমেশ। অল্প আনিলে চুরি হয় না? লক্ষীছাড়া। যা, এ-সমস্ত এখান থেকে লইয়া যা।

উমেশ করুণনেত্রে এক বার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, এইগুলিকে আমাদের দেশে পিড়িং শাক বলে, ইহার চচ্চড়ি বড়ো সরেস হয়। আর এইগুলো বেতো শাক—"

রমেশ দ্বিগুণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "নিয়ে যা তোর পিড়িং শাক। নহিলে আমি সমস্ত নদীর জলে ফেলিয়া দিব।"

এ-সম্বন্ধে কর্তব্যনিরূপণের জন্য সে কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা লইয়া যাইবার জন্য সংকেত করিল। সেই সংকেতের মধ্যে করুণামিশ্রিত গোপন প্রসন্নতা দেখিয়া উমেশ শাকসবজিগুলি কুড়াইয়া চুপড়ির মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রমেশ কহিল, "এ ভারি অন্যায়। ছেলেটাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ো না।"

রমেশ চিঠিপত্র লিখিবার জন্য তাহার কামরায় চলিয়া গেল। কমলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেকেণ্ড ক্লাসের ডেক পারাইয়া জাহাজের হালের দিকে যেখানে তাহাদের দরমা-ঢাকা রান্নার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেইখানে উমেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সেকেণ্ড ক্লাসে যাত্রী কেহ ছিল না। কমলা মাথায় গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া উমেশের কাছে গিয়া কহিল, "সেগুলো সব ফেলিয়া দিয়াছিস নাকি?"

উমেশ কহিল, "ফেলিতে যাইব কেন? এই ঘরের মধ্যেই সব রাখিয়াছি।"

কমলা রাগিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিন্তু তুই ভারি অন্যায় করিয়াছিস। আর কখনো এমন কাজ করিস নে। দেখ্ দেখি, স্টীমার যদি চলিয়া যাইত।"

এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, "আন্, বঁটি আন্।"

উমেশ বঁটি আনিয়া দিল। কমলা সবেগে উমেশের আহৃত তরকারি কুটিতে প্রবৃত্ত হইল।

উমেশ। মা, এই শাকগুলার সঙ্গে সরষেবাটা খুব চমৎকার হয়।

কমলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "আচ্ছা, তবে সরষে বাট্‌।"

এমনি করিয়া উমেশ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, কমলা সেই সতর্কতা অবলম্বন করিল। বিশেষ গম্ভীরমুখে তাহার শাক, তাহার তরকারি, তাহার বেগুন কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

হায়, এই গৃহচ্যুত ছেলেটাকে প্রশ্রয় না দিয়াই বা কমলা থাকে কী করিয়া? শাকচুরির গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা কমলা ঠিক বোঝে না—কিন্তু নিরাশ্রয় ছেলের নির্ভরলালসা যে কত একান্ত, তাহা তো সে বোঝে। ওই যে কমলাকে একটুখানি খুশি করিবার জন্য এই লক্ষ্মীছাড়া বালক, কাল হইতে এই কয়েকটা শাক সংগ্রহের অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, আর একটু হইলেই স্টীমার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইহার করুণা কি কমলাকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে?

কমলা কহিল, "উমেশ, তোর জন্যে কালকের সেই দই কিছু বাকি আছে, তোকে আজ আবার দই খাওয়াইব, কিন্তু খবরদার, এমন কাজ আর কখনো করিস নে।"

উমেশ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিল, "মা, তবে সে-দই তুমি কাল খাও নাই?"

কমলা কহিল, "তোর মতো দইয়ের উপর আমার অত লোভ নাই। কিন্তু উমেশ, সব তো হইল, মাছের জোগাড় কি হইবে? মাছ না পাইলে বাবুকে খাইতে দিব কী?"

উমেশ। মাছের জোগাড় করিতে পারি মা, কিন্তু সেটা তো মিনি পয়সায় হইবার জো নাই।

কমলা পুনরায় শাসনকার্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সুন্দর দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "উমেশ, তোর মতো নির্বোধ আমি তো দেখি নাই। আমি কি তোকে মিনি পয়সায় জিনিস সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি?"

গতকল্য উমেশের মনে কী করিয়া একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, কমলা রমেশের কাছ হইতে টাকা আদায় করাটা সহজ মনে করে না। তা ছাড়া, সবসুদ্ধ জড়াইয়া রমেশকে তাহার ভালো লাগে নাই। এই জন্য রমেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবল সে এবং কমলা, এই দুই নিরুপায়ে মিলিয়া কী উপায়ে সংসার চালাইতে পারে, তাহার গুটিকতক সহজ কৌশল সে মনে মনে উদ্‌ভাবন করিতেছিল। শাক-বেগুন-কাঁচকলা সম্বন্ধে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কিন্তু মাছটার বিষয়ে এখনো সে যুক্তি স্থির করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে সামান্য দই-মাছ পর্যন্ত

জোটানো যায় না, পয়সা চাই—সুতরাং কমলার এই অকিঞ্চন ভক্ত-বালকটার পক্ষে পৃথিবী সহজ জায়গা নহে।

উমেশ কিছু কাতর হইয়া কহিল, "মা, যদি বাবুকে বলিয়া কোনোমতে গণ্ডা-পাঁচেক পয়সা জোগাড় করিতে পার, তবে একটা বড়ো রুই আনিতে পারি।"

কমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "না না, তোকে আর স্টীমার হইতে নামিতে দিব না, এবার তুই ডাঙায় পড়িয়া থাকিলে তোকে কেহ আর তুলিয়া লইবে না।"

উমেশ কহিল, "ডাঙায় নামিব কেন? আজ ভোরে খালাসিদের জালে খুব বড়ো মাছ পড়িয়াছে—এক-আধটা বেচিতেও পারে।"

শুনিয়া দ্রুতবেগে কমলা একটা টাকা আনিয়া উমেশের হাতে দিল—কহিল, "যাহা লাগে দিয়া বাকি ফিরাইয়া আনিস।"

উমেশ মাছ আনিল, কিন্তু কিছু ফিরাইয়া আনিল না, বলিল, "এক টাকার কমে কিছুতেই দিল না।"

কথাটা যে খাঁটি সত্য নহে, তাহা কমলা বুঝিল—একটু হাসিয়া কহিল, "এবার স্টীমার থামিলে টাকা ভাঙাইয়া রাখিতে হইবে।"

উমেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "সেটা খুব দরকার। আস্ত টাকা এক বার বাহির হইলে ফেরানো শক্ত।"

আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রমেশ কহিল, "বড়ো চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত জোটাইলে কোথা হইতে? এ যে রুইমাছের মুড়ো!" বলিয়া মুড়োটা সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়—এ যে সত্যই মুড়ো—যাহাকে বলে রোহিত মৎস্য, তাহারই উত্তমাঙ্গ।"

এইরূপে সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজন বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। রমেশ ডেকে আরাম-কেদারায় গিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় মনোযোগ দিল। কমলা তখন উমেশকে খাওয়াইতে বসিল। মাছের চচ্চড়িটা উমেশের এত ভালো লাগিল যে, ভোজনের উৎসাহটা কৌতুকাবহ না হইয়া ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত কমলা কহিল "উমেশ, আর খাস নে। তোর জন্য চচ্চড়িটা রাখিয়া দিলাম, আবার রাত্রে খাইবি।"

এইরূপে দিবসের কর্মে ও হাস্যকৌতুকে প্রাতঃকালের হৃদয়ভারটা কখন যে দূর হইয়া গেল, তাহা কমলা জানিতে পারিল না।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল। সূর্যের আলো বাঁকা হইয়া দীর্ঘতরচ্ছটায় পশ্চিম-দিক হইতে জাহাজের ছাদ অধিকার করিয়া লইল। স্পন্দমান জলের উপর বৈকালের

মন্দীভূত রৌদ্র ঝিকমিক করিতেছে। নদীর দুই তীরে নবীনশ্যাম শারদশস্যক্ষেত্রের মাঝখানকার সংকীর্ণ পথ দিয়া গ্রামরমণীরা গা ধুইবার জন্য ঘট কক্ষে করিয়া চলিয়া আসিতেছে।

কমলা পানসাজা শেষ করিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া লইল, সূর্য তখন গ্রামের বাঁশবনগুলির পশ্চাতে অস্ত গিয়াছে। জাহাজ সেদিনকার মতো স্টেশন-ঘাটে নোঙর ফেলিয়াছে।

আজ কমলার রাত্রের রন্ধনব্যাপার তেমন বেশি নহে। সকালের অনেক তরকারি এ-বেলা কাজে লাগিবে। এমন সময় রমেশ আসিয়া কহিল—মধ্যাহ্নে আজ গুরু-ভোজন হইয়াছে, এ-বেলা সে আহার করিবে না।

কমলা বিমর্ষ হইয়া কহিল, "কিছু খাইবে না? শুধু কেবল মাছভাজা দিয়া—"

রমেশ সংক্ষেপে কহিল, "না, মাছভাজা থাক।" বলিয়া চলিয়া গেল।

কমলা তখন উমেশের পাতে সমস্ত মাছভাজা ও চচ্চড়ি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। উমেশ কহিল, "তোমার জন্য কিছু রাখিলে না?"

সে কহিল, "আমার খাওয়া হইয়া গেছে।"

এইরূপে কমলার এই ভাসমান ক্ষুদ্র সংসারের একদিনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

জ্যোৎস্না তখন জলে-স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীরে গ্রাম নাই—ধানের খেতের ঘন-কোমল সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ শুভ্ররাত্রি বিরহিণীর মতো জাগিয়া রহিয়াছে।

তীরে টিনের ছাদ দেওয়া যে ক্ষুদ্র কুটিরে স্টীমার-আপিস, সেইখানে একটি শীর্ণদেহ কেরানি টুলের উপরে বসিয়া ডেস্কের উপর ছোটো কেরোসিনের বাতি লইয়া খাতা লিখিতেছিল। খোলা দরজার ভিতর দিয়া রমেশ সেই কেরানিটিকে দেখিতে পাইতে-ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ ভাবিতেছিল,—আমার ভাগ্য যদি আমাকে ওই কেরানিটির মতো একটি সংকীর্ণ অথচ সুস্পষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত—হিসাব লিখিতাম, কাজ করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম—তবে আমি বাঁচিতাম—আমি বাঁচিতাম।

ক্রমে আপিসঘরের আলো নিবিয়া গেল। কেরানি ঘরে তালা বন্ধ করিয়া হিমের ভয়ে মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নির্জন শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না।

কমলা যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া জাহাজের রেল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া

ছিল; রমেশ তাহা জানিতে পারে নাই। কমলা মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যাবেলায় রমেশ তাহাকে ডাকিয়া লইবে। এই জন্য কাজকর্ম সারিয়া যখন দেখিল, রমেশ তাহার খোঁজ লইতে আসিল না, তখন সে আপনি ধীরপদে জাহাজের ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাকে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল, সে রমেশের কাছে যাইতে পারিল না। চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপরে পড়িয়াছিল—সে মুখ যেন দূরে,—বহুদূরে; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

রমেশ যখন দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপরে মুখ রাখিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে তাহার কামরার দিকে গেল। পায়ের শব্দ করিল না, পাছে রমেশ টের পায় যে, কমলা তাহার সন্ধান লইতে আসিয়াছিল।

কিন্তু তাহার শুইবার কামরা নির্জন, অন্ধকার—প্রবেশ করিয়া তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, নিজেকে একান্তই পরিত্যক্ত এবং একাকিনী বলিয়া মনে হইল—সেই ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটা একটা কোনো নিষ্ঠুর অপরিচিত জন্তুর হাঁ-করা মুখের মতো তাহার কাছে আপনার অন্ধকার মেলিয়া দিল। কোথায় সে যাইবে? কোন্‌খানে আপনার ক্ষুদ্র শরীরটি পাতিয়া দিয়া সে চোখ বুজিয়া বলিতে পারিবে,—এই আমার আপনার স্থান?

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই কমলা আবার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিবার সময় রমেশের ছাতাটা টিনের তোরঙ্গের উপর পড়িয়া গিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া রমেশ মুখ তুলিল এবং চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দেখিল, কমলা তাহার শুইবার কামরার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কহিল, "এ কী কমলা। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি এতক্ষণে শুইয়াছ। তোমার কি ভয় করিতেছে নাকি? আচ্ছা, আমি আর বাহিরে বসিব না—আমি এই পাশের ঘরেই শুইতে গেলাম—মাঝের দরজাটি বরঞ্চ খুলিয়া রাখিতেছি।"

কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, "ভয় আমি করি না।" বলিয়া সবেগে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং যে-দরজা রমেশ খোলা রাখিয়াছিল, তাহা সে বন্ধ করিয়া দিল। বিছানার উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া মুখের উপরে একটা চাদর ঢাকিল—সে যেন জগতে আর-কাহাকেও না পাইয়া কেবল আপনাকে দিয়া আপনাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিল। তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যেখানে নির্ভরতাও নাই, স্বাধীনতাও নাই, সেখানে প্রাণ বাঁচে কী করিয়া?

রাত্রি আর কাটে না। পাশের ঘরে রমেশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিছানার মধ্যে কমলা আর থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া আসিল। জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—চাঁদ পশ্চিমের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। দুই ধারের শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সংকীর্ণ পথ অদৃশ্য হইয়া গেছে, সেই দিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল,—এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়। ঘর! ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর – কিন্তু সে-ঘর কোথায়। শূন্য তীর ধুধু করিতেছে—প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ—অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক--কেবল তাহার একটিমাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।

এমন সময় হঠাৎ কমলা চমকিয়া উঠিল—কে এক জন তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

"ভয় নাই মা, আমি উমেশ। রাত যে অনেক হইয়াছে, ঘুম নাই কেন।"

এতক্ষণ যে-অশ্রু পড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু দিয়া সেই অশ্রু উছলিয়া পড়িল। বড়ো বড়ো ফোঁটা কিছুতে বাধা মানিল না, কেবলই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘাড় বাঁকাইয়া কমলা উমেশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। জলভার বহিয়া মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে,—যেমনি তাহারি মতো আর-একটা গৃহহারা হাওয়ার স্পর্শ লাগে, অমনি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়ে;—এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা যত্নের কথা শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুকভরা অশ্রুর ভার আর রাখিতে পারিল না। একটা-কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

পীড়িতচিত্ত উমেশ কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে সেই টাকাটা দিয়াছিলে, তার থেকে সাত আনা বাঁচিয়াছে।"

তখন কমলার অশ্রুর ভার লঘু হইয়াছে। উমেশের এই খাপছাড়া সংবাদে সে একটুখানি স্নেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, বেশ, সে তোর কাছে রাখিয়া দে। যা, এখন শুতে যা।"

চাঁদ গাছের আড়ালে নামিয়া পড়িল। এবার কমলা বিছানায় আসিয়া যেমন শুইল, অমনি তাহার দুই শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে বুজিয়া আসিল—প্রভাতের রৌদ্র যখন তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল, তখনো সে নিদ্রায় মগ্ন।

২৮

শ্রান্তির মধ্যে পরের দিন কমলার দিবসারম্ভ হইল। সেদিন তাহার চক্ষে সূর্যের আলোক ক্লান্ত, নদীর ধারা ক্লান্ত, তীরের তরুগুলি বহুদূরপথের পথিকের মতো ক্লান্ত।

উমেশ যখন তাহার কাজে সহায়তা করিতে আসিল, কমলা শ্রান্তকণ্ঠে কহিল, "যা উমেশ, আমাকে আজ আর বিরক্ত করিস নে।"

উমেশ অল্পে ক্ষান্ত হইবার ছেলে নহে। সে কহিল, "বিরক্ত করিব কেন মা, বাটনা বাটিতে আসিয়াছি।"

সকাল বেলা রমেশ কমলার চোখমুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কমলা তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

এরূপ প্রশ্ন যে কতখানি অনাবশ্যক ও অসংগত, কমলা কেবল তাহা একবার প্রবল গ্রীবা-আন্দোলনের দ্বারা নিরুত্তরে প্রকাশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রমেশ বুঝিল, সমস্যা ক্রমশ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে। অতিশীঘ্রই ইহার একটা শেষ মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। হেমনলিনীর সঙ্গে এক বার স্পষ্ট বোঝা-পড়া হইয়া গেলে কর্তব্যনির্ধারণ সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল।

অনেক চিন্তার পর হেমকে চিঠি লিখিতে বসিল। একবার লিখিতেছে, একবার কাটিতেছে, এমন সময় "মহাশয়, আপনার নাম?" শুনিয়া চমকিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, পাকা গোঁফ, ও মাথার সামনের দিকটায় পাতলা চুলে টাকের আভাস লইয়া সম্মুখে উপস্থিত। রমেশের একান্তনিবিষ্ট চিত্তের মনোযোগ চিঠির চিন্তা হইতে অকস্মাৎ উৎপাটিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

"আপনি ব্রাহ্মণ? নমস্কার। আপনার নাম রমেশবাবু—সে আমি পূর্বেই খবর লইয়াছি—তবু দেখুন, আমাদের দেশে নাম-জিজ্ঞাসাটা পরিচয়ের একটা প্রণালী। ওটা ভদ্রতা। আজ কাল কেহ কেহ ইহাতে রাগ করেন। আপনি যদি রাগ করিয়া থাকেন তো শোধ তুলুন। আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি নিজের নাম বলিব, বাপের নাম বলিব, পিতামহের নাম বলিতে আপত্তি করিব না।"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "আমার রাগ এত বেশি ভয়ংকর নয়, আপনার একলার নাম পাইলেই আমি খুশি হইব।"

"আমার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। পশ্চিমে সকলেই আমাকে 'খুড়ো' বলিয়া জানে। আপনি তো হিস্ট্রি পড়িয়াছেন? ভারতবর্ষে ভরত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা— আমি তেমনি সমস্ত পশ্চিম-মুল্লুকের চক্রবর্তী-খুড়ো। যখন পশ্চিমে যাইতেছেন, তখন আমার পরিচয় আপনার অগোচর থাকিবে না। কিন্তু মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হইতেছে?"

রমেশ কহিল, "এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

ত্রৈলোক্য। আপনার ঠিক করিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু জাহাজে উঠিতে তো দেরি সহে নাই।

রমেশ কহিল, "এক দিন গোয়ালন্দে নামিয়া, দেখিলাম, জাহাজে বাঁশি দিয়াছে। তখন এটা বেশ বোঝা গেল, আমার মন স্থির করিতে যদি বা দেরি থাকে, কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরি নাই। সুতরাং যেটা তাড়াতাড়ির কাজ, সেইটেই তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিলাম।"

ত্রৈলোক্য। নমস্কার মহাশয়। আপনার প্রতি আমার ভক্তি হইতেছে। আমাদের সঙ্গে আপনার অনেক প্রভেদ। আমরা আগে মতি স্থির করি, তাহার পরে জাহাজে চড়ি—কারণ আমরা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। আপনি যাইবেন, এটা স্থির করিয়াছেন, অথচ কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করেন নাই, এ কি কম কথা! পরিবার সঙ্গেই আছেন?

'হাঁ' বলিয়া এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে রমেশের মুহূর্তকালের জন্য খটকা বাধিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, "আমাকে মাপ করিবেন—পরিবার সঙ্গে আছেন, সে খবরটা আমি বিশ্বস্তসূত্রে পূর্বেই জানিয়াছি। বউমা ওই ঘরটাতে রাঁধিতেছেন, আমিও পেটের দায়ে রান্নাঘরের সন্ধানে সেইখানে গিয়া উপস্থিত। বউমাকে বলিলাম, 'মা, আমাকে দেখিয়া সংকোচ করিয়ো না—আমি পশ্চিমমুল্লুকের একমাত্র চক্রবর্তী-খুড়ো।' আহা মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আমি আবার কহিলাম, 'মা, রান্নাঘরটি যখন দখল করিয়াছ, তখন অন্ন হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে না, আমি নিরুপায়।' মা একটুখানি মধুর হাসিলেন, বুঝিলাম প্রসন্ন হইয়াছেন, আজ আর আমার ভাবনা নাই। পাঁজিতে শুভক্ষণ দেখিয়া প্রতিবারই তো বাহির হই, কিন্তু এমন সৌভাগ্য ফি বারে ঘটে না। আপনি কাজে আছেন, আপনাকে আর বিরক্ত করিব না—যদি অনুমতি করেন তো বউমাকে একটু সাহায্য করি। আমরা উপস্থিত থাকিতে তিনি পদ্মহস্তে বেড়ি ধরিবেন কেন? না না, আপনি লিখুন—আপনাকে উঠিতে হইবে না—আমি পরিচয় করিয়া লইতে জানি।"

এই বলিয়া চক্রবর্তী-খুড়া বিদায় হইয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গিয়াই কহিলেন, "চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে—ঘণ্টটা যা হইবে, তা মুখে তুলিবার পূর্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অম্বলটা আমি রাঁধিব মা—পশ্চিমের গরমে যাহারা বাস না করে, অম্বলটা তাহারা ঠিক দরদ দিয়া রাঁধিতে পারে না। তুমি ভাবিতেছ—বুড়াটা বলে কী—তেঁতুল নাই, অম্বল রাঁধিব কী দিয়া ? কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে তেঁতুলের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। একটু সবুর করো, আমি সমস্ত জোগাড় করিয়া আনিতেছি।"

বলিয়া চক্রবর্তী কাগজে-মোড়া একটা ভাঁড়ে কাসুন্দি আমিয়া উপস্থিত করিলেন। কহিলেন, "আমি অম্বল যা রাঁধিব, তা আজকের মতো খাইয়া বাকিটা তুলিয়া রাখিতে হইবে, মজিতে ঠিক চার দিন লাগিবে। তার পরে একটুখানি মুখে তুলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে, চক্রবর্তী-খুড়ো দেমাকও করে বটে, কিন্তু অম্বলও রাঁধে। যাও মা, এবার যাও, মুখ-হাত ধুইয়া লও গে। বেলা অনেক হইয়াছে। রান্না বাকি যা আছে, আমি শেষ করিয়া দিতেছি। কিছু সংকোচ করিয়ো না—আমার এ-সমস্ত অভ্যাস আছে মা—আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল—তাঁহারই অরুচি সারাইবার জন্য অম্বল রাঁধিয়া আমার হাত পাকিয়া গেছে। বুড়ার কথা শুনিয়া হাসিতেছ—কিন্তু ঠাট্টা নয় মা, এ সত্য কথা।"

কমলা হাসিমুখে কহিল, "আমি আপনার কাছ থেকে অম্বল-রাঁধা শিখিব।"

চক্রবর্তী। ওরে বাসরে! বিদ্যা কি এত সহজে দেওয়া যায়। এক দিনেই শিখাইয়া বিদ্যার গুমর যদি নষ্ট করি, তবে বীণাপাণি অপ্রসন্ন হইবেন। দু-চার দিন এ-বৃদ্ধকে খোশামোদ করিতে হইবে। আমাকে কী করিয়া খুশি করিতে হয়, সে তোমাকে ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে না—আমি নিজে সমস্ত বিস্তারিত বলিয়া দিব। প্রথম দফায়, আমি পানটা কিছু বেশি খাই, কিন্তু সুপারি গোটা-গোটা থাকিলে চলিবে না। আমাকে বশীভূত করা সহজ ব্যাপার না—কিন্তু মার ওই হাসি-মুখখানিতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ওরে, তোর নাম কী রে!"

উমেশ উত্তর দিল না। সে রাগিয়াছিল—তাহার মনে হইতেছিল, কমলার স্নেহ-রাজ্যে বৃদ্ধ তাহার শরিক হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা তাহাকে মৌন দেখিয়া কহিল, "ওর নাম উমেশ।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "এ ছোকরাটি বেশ ভালো। একদমে ইহার মন পাওয়া যায় না, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু দেখো মা, এর সঙ্গে আমার বনিবে। কিন্তু আর বেলা করিয়ো না, আমার রান্না হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।"

কমলা যে একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিল, এই বৃদ্ধকে পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেল।

রমেশও এই বৃদ্ধের আগমনে এখনকার মতো কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। প্রথম কয় মাস যখন রমেশ কমলাকে আপনার স্ত্রী বলিয়াই জানিত, তখন তাহার আচরণ, তখন পরস্পরের বাধাবিহীন নিকটবর্তিতা এখনকার হইতে এতই তফাত যে, এই হঠাৎ প্রভেদ বালিকার মনকে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। এমন সময়ে এই চক্রবর্তী আসিয়া রমেশের দিক হইতে কমলার চিন্তাকে যদি খানিকটা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে, তবে রমেশ আপনার হৃদয়ের ক্ষতবেদনায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়া বাঁচে।

অদূরে তাহার কামরার দ্বারের কাছে আসিয়া কমলা দাঁড়াইল। তাহার মনের ইচ্ছা, কর্মহীন দীর্ঘমধ্যাহ্নটা সে চক্রবর্তীকে একাকী দখল করিয়া বসে। চক্রবর্তী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না মা, এটা ভালো হইল না। এটা কিছুতেই চলিবে না।"

কমলা, কী ভালো হইল না, কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "ওই যে ওই জুতোটা। রমেশবাবু, এটা আপনা কর্তৃকই হইয়াছে। যা বলেন, এটা আপনারা অধর্ম করিতেছেন—দেশের মাটিকে এই সকল চরণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, তাহা হইলে দেশ মাটি হইবে। রামচন্দ্র যদি সীতাকে ডসনের বুট পরাইতেন, তবে লক্ষ্মণ কি চোদ্দ বৎসর বনে ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতেন মনে করেন? কখনোই না। আমার কথা শুনিয়া রমেশবাবু হাসিতেছেন—মনে মনে ঠিক পছন্দ করিতেছেন না। না করিবারই কথা। আপনারা জাহাজের বাঁশি শুনিলেই আর থাকিতে পারেন না, একেবারেই চড়িয়া বসেন, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছেন, তাহা এক বারও ভাবেন না।"

রমেশ কহিল, "খুড়ো, আপনিই না হয় আমাদের গম্যস্থানটা ঠিক করিয়া দিন না। জাহাজের বাঁশিটার চেয়ে আপনার পরামর্শ পাকা হইবে।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "এই দেখুন, আপনার বিবেচনাশক্তি এরই মধ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে—অথচ অল্পক্ষণের পরিচয়। তবে আসুন, গাজিপুরে আসুন।—যাবে মা গাজিপুরে? সেখানে গোলাপের খেত আছে, আর সেখানে তোমার এ বৃদ্ধ ভক্তটাও থাকে।"

রমেশও কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ইহার পরে উমেশ এবং চক্রবর্তীতে মিলিয়া লজ্জিত কমলার কামরায় সভাস্থাপন করিল। রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরেই রহিয়া গেল। মধ্যাহ্নে জাহাজ ধক ধক করিয়া চলিয়াছে। শারদরৌদ্ররঞ্জিত দুই তীরের শান্তিময় বৈচিত্র্য স্বপ্নের মতো চোখের উপর দিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ধানের খেত, কোথাও বা নৌকা-লাগানো ঘাট, কোথাও বা বালুর তীর, কোথাও বা গ্রামের গোয়াল, কোথাও বা গঞ্জের টিনের ছাদ, কোথাও বা প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দুটি-চারটি পারের যাত্রী। এই শরৎমধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে কামরার ভিতর হইতে যখন ক্ষণে ক্ষণে কমলার স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্য রমেশের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। সমস্তই কী সুন্দর, অথচ কী সুদূর। রমেশের আর্ত জীবনের সহিত কি নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন।

২৯

কমলার এখনো অল্প বয়স—কোনো সংশয়, আশঙ্কা বা বেদনা স্থায়ী হইয়া তাহার মনের মধ্যে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।

রমেশের ব্যবহার সম্বন্ধে এ কয়দিন সে আর কোনো চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। স্রোত যেখানে বাধা পায়, সেইখানে যত আবর্জনা আসিয়া জমে—কমলার চিত্তস্রোতের সহজ প্রবাহ রমেশের আচরণে হঠাৎ একটা জায়গায় বাধা পাইয়াছিল, সেইখানে আবর্ত রচিত হইয়া নানা কথা বারবার একই জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্তীকে লইয়া হাসিয়া, বকিয়া, রাঁধিয়া, খাওয়াইয়া কমলার হৃদয়স্রোত আবার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল—আবর্ত কাটিয়া গেল, যাহা-কিছু জমিতেছিল এবং ঘুরিতেছিল, তাহা সমস্ত ভাসিয়া গেল। সে আপনার কথা আর কিছুই ভাবিল না।

আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারই মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহিণীপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে এক-একটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মতো উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

কর্মের উৎসাহে দিন আরম্ভ হইত। উমেশ আজকাল আর স্টীমার ফেল করে না—কিন্তু তাহার ঝুড়ি ভরতি হইয়া আসে। ক্ষুদ্র ঘরকন্নার মধ্যে উমেশের এই সকাল বেলাকার ঝুড়িটা পরম কৌতূহলের বিষয়। "এ কী রে, এ যে লাউডগা!

ওমা, শজনের খাড়া তুই কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিলি ? এই দেখো দেখো, খুড়োমশায়, টক্‌-পালং যে এই খোট্টার দেশে পাওয়া যায়, তাহা তো আমি জানিতাম না !" ঝুড়ি লইয়া রোজ সকালে এইরূপ একটা কলরব উঠে। যেদিন রমেশ উপস্থিত থাকে, সেদিন ইহার মধ্যে একটু বেসুর লাগে—সে চৌর্য সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা উত্তেজিত হইয়া বলে, "বাঃ, আমি নিজের হাতে উহাকে পয়সা গনিয়া দিয়াছি।"

রমেশ বলে, "তাহাতে উহার চুরির সুবিধা ঠিক দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। পয়সাটাও চুরি করে, শাকও চুরি করে।"

এই বলিয়া রমেশ উমেশকে ডাকিয়া বলে, "আচ্ছা, হিসাব দে দেখি।"

তাহাতে তাহার এক বারের হিসাবের সঙ্গে আর-এক বারের হিসাব মেলে না। ঠিক দিতে গেলে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক বেশি হইয়া উঠে। ইহাতে উমেশ লেশমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সে বলে, "আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব, তবে আমার এমন দশা হইবে কেন ? আমি তো গোমস্তা হইতে পারিতাম, কী বলেন দাদাঠাকুর ?"

চক্রবর্তী বলেন, "রমেশবাবু, আহারের পর আপনি উহার বিচার করিবেন, তাহা হইলে সুবিচার করিতে পারিবেন—আপাতত আমি এই ছোঁড়াটাকে উৎসাহ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। উমেশ, বাবা, সংগ্রহ করার বিদ্যা কম বিদ্যা নয়—অল্প লোকেই পারে। চেষ্টা সকলেই করে—কৃতকার্য কয়জনে হয় ? রমেশবাবু, গুণীর মর্যাদা আমি বুঝি। শজনে-খাড়ার সময় এ নয়, তবু এত ভোরে বিদেশে শজনের খাড়া কয় জন ছেলে জোগাড় করিয়া আনিতে পারে বলুন দেখি। মশায়, সন্দেহ করিতে অনেকেই পারে—কিন্তু সংগ্রহ করিতে হাজারে এক জন পারে।"

রমেশ। খুড়ো, এটা ভালো হইতেছে না, উৎসাহ দিয়া অন্যায় করিতেছেন।

চক্রবর্তী। ছেলেটার বিদ্যে বেশি নেই, যেটাও আছে, সেটাও যদি উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তো বড়ো আক্ষেপের বিষয় হইবে—অন্তত যে কয়দিন আমরা স্টীমারে আছি। ওরে উমেশ, কাল কিছু নিমপাতা জোগাড় করিয়া আনিস—যদি উচ্ছে পাস, আরও ভাল হয়—মা, সুক্তুনিটা নিতান্তই চাই—আমাদের আয়ুর্বেদে বলে—থাক, আয়ুর্বেদের কথা থাক, এদিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। উমেশ, শাক-গুলো বেশ করে ধুয়ে নিয়ে আয়।

রমেশ এইরূপে উমেশকে লইয়া যতই সন্দেহ করে, খিটখিট করে, উমেশ ততই যেন কমলার বেশি করিয়া আপনার হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী

তাহার পক্ষ লওয়াতে রমেশের সহিত কমলার দলটি যেন বেশ একটু স্বতন্ত্র হইয়া আসিল। রমেশ তাহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লইয়া এক দিকে একা, অন্য দিকে কমলা, উমেশ এবং চক্রবর্তী তাহাদের কর্মসূত্রে, স্নেহসূত্রে, আমোদ-আহ্লাদের সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে এক। চক্রবর্তী আসিয়া অবধি তাঁহার উৎসাহের সংক্রামক উত্তাপে রমেশ কমলাকে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছে, কিন্তু তবু দলে মিশিতে পারিতেছে না। বড়ো জাহাজ যেমন ডাঙায় ভিড়িতে চায়, কিন্তু জল কম বলিয়া তাহাকে তফাতে নোঙর ফেলিয়া দূর হইতে তাকাইয়া থাকিতে হয়, এদিকে ছোটো ছোটো ডিঙি-পানসিগুলো অনায়াসেই তীরে গিয়া ভিড়ে, রমেশের সেই দশা হইয়াছে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি এক দিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, রাশি রাশি কালো মেঘ দলে দলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস এলোমেলো বহিতেছে। বৃষ্টি এক-এক বার আসিতেছে, আবার এক-এক বার ধরিয়া গিয়া রৌদ্রের আভাসও দেখা যাইতেছে। মাঝগঙ্গায় আজ আর নৌকা নাই, দু-একখানা যা দেখা যাইতেছে, তাহাদের উৎকণ্ঠিত ভাব স্পষ্টই বুঝা যায়। জলার্থিনী মেয়েরা আজ ঘাটে অধিক বিলম্ব করিতেছে না। জলের উপরে মেঘবিচ্ছুরিত একটা রুদ্র আলোক পড়িয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে নদী-নীর এক তীর হইতে আর-এক তীর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেছে।

স্টীমার যথানিয়মে চলিয়াছে। দুর্যোগের নানা অসুবিধার মধ্যে কোনোমতে কমলার রাঁধাবাড়া চলিতে লাগিল। চক্রবর্তী আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, ও-বেলা যাহাতে রাঁধিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি খিচুড়ি চড়াইয়া দাও, আমি ইতিমধ্যে রুটি গড়িয়া রাখি।"

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে আজ অনেক বেলা হইল। দমকা হাওয়ার জোর ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। নদী ফেনাইয়া ফেনাইয়া ফুলিতে লাগিল। সূর্য অস্ত গেছে কি না, বুঝা গেল না। সকাল-সকাল স্টীমার নোঙর ফেলিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্য হইতে বিকারের পাংশুবর্ণ হাসির মতো এক বার জ্যোৎস্নার আলো বাহির হইতে লাগিল। তুমুলবেগে বাতাস এবং মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

কমলা এক বার জলে ডুবিয়াছে—ঝড়ের ঝাপটাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। রমেশ আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল, "স্টীমারে কোনো ভয় নাই কমলা। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পার, আমি পাশের ঘরেই জাগিয়া আছি।"

দ্বারের কাছে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, "মা লক্ষ্মী, ভয় নাই, ঝড়ের বাপের সাধ্য কী, তোমাকে স্পর্শ করে।"

ঝড়ের বাপের সাধ্য কতদূর, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন, কিন্তু ঝড়ের সাধ্য যে কী তাহা কমলার অগোচর নাই—সে তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, "খুড়োমশায়, তুমি ঘরে আসিয়া বসো।"

চক্রবর্তী সসংকোচে কহিলেন, "তোমাদের যে এখন শোবার সময় হইল মা, আমি এখন—"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমেশ সেখানে নাই—আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "রমেশবাবু এই ঝড়ে গেলেন কোথায়? শাকচুরি তো তাঁহার অভ্যাস নাই।"

"কে ও, খুড়ো নাকি? এই যে আমি পাশের ঘরেই আছি।"

পাশের ঘরে চক্রবর্তী উঁকি মারিয়া দেখিলেন, রমেশ বিছানায় অর্ধশয়ান অবস্থায় আলো জ্বালিয়া বই পড়িতেছে।

চক্রবর্তী কহিলেন, "বউমা যে একলা ভয়ে সারা হইলেন। আপনার বই তো ঝড়কে ডরায় না, ওটা এখন রাখিয়া দিলে অন্যায় হয় না। আসুন এ-ঘরে।"

কমলা একটা দুর্নিবার আবেগবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীর হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না, না খুড়োমশায়! না, না।" ঝড়ের কল্লোলে কমলার এ-কথা রমেশের কানে গেল না, কিন্তু চক্রবর্তী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রমেশ বই রাখিয়া এ ঘরে উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কী চক্রবর্তী-খুড়ো, ব্যাপার কী? কমলা বুঝি আপনাকে—"

কমলা রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি উঁহাকে কেবল গল্প বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম।"

কিসের প্রতিবাদে যে কমলা "না না" বলিল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এই "না"র অর্থ এই যে, যদি মনে কর আমার ভয় ভাঙাইবার দরকার আছে—না, দরকার নাই। যদি মনে কর আমাকে সঙ্গ দিবার প্রয়োজন—না, প্রয়োজন নাই!

পরক্ষণেই কমলা কহিল, "খুড়োমশায়, রাত হইয়া যাইতেছে, আপনি শুইতে যান, এক বার উমেশের খবর লইবেন, সে হয়তো ভয় পাইতেছে।"

দরজার কাছ হইতে একটা আওয়াজ আসিল, "মা, আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

উমেশ মুড়িসুড়ি দিয়া কমলার দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। কমলার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল—সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া কহিল, "হাঁ রে উমেশ, তুই ঝড়-জলে ভিজিতেছিস কেন? লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, যা, খুড়োমশায়ের সঙ্গে শুইতে যা।"

কমলার মুখে লক্ষ্মীছাড়া-সম্বোধনে উমেশ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া চক্রবর্তী-খুড়ার সঙ্গে শুইতে গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "যতক্ষণ না ঘুম আসে, আমি বসিয়া গল্প করিব কি?"

কমলা কহিল, "না, আমার ভারি ঘুম পাইয়াছে।"

রমেশ কমলার মনের ভাব যে না বুঝিল, তাহা নয়; কিন্তু সে আর দ্বিরুক্তি করিল না—কমলার অভিমানক্ষুণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিছানার মধ্যে স্থির হইয়া ঘুমের অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পারে, এমন শান্তি কমলার মনে ছিল না। তবু সে জোর করিয়া শুইল। ঝড়ের বেগের সঙ্গে জলের কল্লোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। খালাসিদের গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে এঞ্জিনঘরে সারেঙের আদেশসূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রবল বায়ুবেগের বিরুদ্ধে জাহাজকে স্থির রাখিবার জন্য নোঙর-বাঁধা অবস্থাতেও এঞ্জিন ধীরে ধীরে চলিতে থাকিল।

কমলা বিছানা ছাড়িয়া কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চীৎকার করিয়া দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মেঘসত্ত্বেও শুক্লচতুর্দশীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্তি অপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতেছে। তীর স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না, নদী ঝাপসা দেখা যাইতেছে, কিন্তু ঊর্ধ্বে নিম্নে, দূরে নিকটে, দৃশ্যে অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যতশৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা-ঝাঁকা দিয়া দিয়া উঠিতেছে।

এই পাগল রাত্রি, এই আকুল আকাশের দিকে চাহিয়া কমলার বুকের ভিতরটা যে দুলিতে লাগিল, তাহা ভয়ে কি আনন্দে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে, তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকে বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগেরই মতো অব্যক্ত। একটা কোন্ অনির্দিষ্ট, অমূর্ত মিথ্যার, স্বপ্নের,

অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশপাতালে এই মাতামাতি, এই রোষগর্জিত ক্রন্দন। পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল "না না" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথরাত্রে ছুটিয়া আসিতেছে— একটা কেবল প্রচণ্ড অস্বীকার।—কিসের অস্বীকার? তাহা নিশ্চয় বলা যায় না— কিন্তু না, কিছুতেই না, না, না, না।

৩০

পরদিন প্রাতে ঝড়ের বেগ কিছু কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে থামে নাই—নোঙর তুলিবে কি না, এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই, উদ্বিগ্নমুখে আকাশের দিকে তাকাইতেছে।

সকালেই চক্রবর্তী রমেশের সন্ধানে কমলার পাশের কামরায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রমেশ তখনো বিছানায় পড়িয়া আছে, চক্রবর্তীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ঘরে রমেশের শয়নাবস্থা দেখিয়া চক্রবর্তী গতরাত্রির ঘটনার সঙ্গে মনে মনে সমস্তটা মিলাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে বুঝি এই ঘরেই শোওয়া হইয়াছিল?"

রমেশ এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া কহিল, "এ কী দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। কাল রাত্রে খুড়োর ঘুম কেমন হইল?"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আমাকে নির্বোধের মতো দেখিতে, আমার কথাবার্তাও সেই প্রকারের, তবু এই বয়সে আমাকে অনেক দুরূহ বিষয়ের চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলার মীমাংসাও পাইয়াছি—কিন্তু আপনাকে সব চেয়ে দুরূহ বলিয়া ঠেকিতেছে।"

মুহূর্তের জন্য রমেশের মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, "দুরূহ হওয়াটাই যে সব সময়ে অপরাধের, তা নয় খুড়ো। তেলেগু ভাষার শিশুপাঠও দুরূহ, কিন্তু তৈলঙ্গের বালকের কাছে তাহা জলের মতো সহজ—যাহাকে না বুঝিবেন, তাহাকে তাড়াতাড়ি দোষ দিবেন না এবং যে-অক্ষর না বোঝেন, কেবলমাত্র তাহার উপরে অনিমেষ চক্ষু রাখিলেই যে তাহা কোনোকালেই বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা করিবেন না।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "আমাকে মাপ করিবেন রমেশবাবু। আমার সঙ্গে যাহার বোঝাপড়ার কোনো সম্পর্ক নাই, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা। কিন্তু পৃথিবীতে দৈবাৎ এমন এক-একটি মানুষ মেলে, দৃষ্টিপাতমাত্রই যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ

স্থির হইয়া যায়—তার সাক্ষী, আপনি ঐ দেড়ে সারেংটাকে জিজ্ঞাসা করুন,—বউমার সঙ্গে ওর আত্মীয়সম্বন্ধ ওকে এখনি স্বীকার করিতে হইবে—ওর ঘাড় করিবে—না করে তো ওকে আমি মুসলমান বলিব না। এমন অবস্থায় হঠাৎ মাঝখানে তেলেগু ভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুশকিলে পড়িতে হয়। শুধু শুধু রাগ করিলে চলিবে না রমেশবাবু, কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।"

রমেশ কহিল, "ভাবিয়া দেখিতেছি বলিয়াই তো রাগ করিতে পারিতেছি না—কিন্তু আমি রাগ করি আর না করি, আপনি দুঃখ পান আর না পান, তেলেগু ভাষা তেলেগুই থাকিয়া যাইবে—প্রকৃতির এইরূপ নিষ্ঠুর নিয়ম।" এই বলিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ইতিমধ্যে রমেশ চিন্তা করিতে লাগিল, গাজিপুরে যাওয়া উচিত কি না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, অপরিচিত স্থানে বাস স্থাপন করার পক্ষে বৃদ্ধের সহিত পরিচয় তাহার কাজে লাগিবে। কিন্তু এখন মনে হইল, পরিচয়ের অসুবিধাও আছে। কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া উঠিলে এক দিন তাহা কমলার পক্ষে নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। তার চেয়ে যেখানে সকলেই অপরিচিত, যেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই, সেইখানে আশ্রয় লওয়াই ভালো।

গাজিপুরে পৌছিবার আগের দিনে রমেশ চক্রবর্তীকে কহিল, "খুড়ো, গাজিপুর আমার প্র্যাকটিসের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছি না, আপাতত কাশীতে যাওয়াই আমি স্থির করিয়াছি।"

রমেশের কথার মধ্যে নিঃসংশয়ের সুর শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "বার বার ভিন্ন ভিন্ন রকম স্থির করাকে স্থির করা বলে না—সে তো অস্থির করা। যা হউক, এই কাশী যাওয়াটা এখনকার মতো আপনার শেষ স্থির ?"

রমেশ সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ।"

বৃদ্ধ কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং জিনিসপত্র বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলা আসিয়া কহিল, "খুড়োমশায়, আজ কি আমার সঙ্গে আড়ি ?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ঝগড়া তো দুই বেলাই হয়, কিন্তু এক দিনও তো জিতিতে পারিলাম না।"

কমলা। আজ যে সকাল হইতে তুমি পালাইয়া বেড়াইতেছ ?

চক্রবর্তী। তোমরা যে মা আমার চেয়ে বড়ো রকমের পলায়নের চেষ্টায় আছ, আর আমাকে পলাতক বলিয়া অপবাদ দিতেছ ?

কমলা কথাটা না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "রমেশবাবু তবে কি এখনো বলেন নাই? তোমাদের যে কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

শুনিয়া কমলা হাঁ-না কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "খুড়োমশায়, তুমি পারিবে না, দাও, তোমার বাক্স আমি সাজাইয়া দিই।"

কাশী যাওয়া সম্বন্ধে কমলার এই ঔদাসীন্যে চক্রবর্তী হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর আঘাত পাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—ভালোই হইতেছে, আমার মতো বয়সে আবার নূতন জাল জড়ানো কেন।

ইতিমধ্যে কাশী যাওয়ার কথা কমলাকে জানাইবার জন্য রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম।"

কমলা চক্রবর্তীর কাপড়চোপড় ভাঁজ করিয়া গুছাইতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কমলা, এবার আমাদের গাজিপুরে যাওয়া হইল না—আমি স্থির করিয়াছি, কাশীতে গিয়া প্র্যাকটিস করিব। তুমি কী বল?"

কমলা চক্রবর্তীর বাক্স হইতে চোখ না তুলিয়া কহিল, "না, আমি গাজিপুরেই যাইব। আমি সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছি।"

কমলার এই দ্বিধাহীন উত্তরে রমেশ কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল—কহিল, "তুমি কি একলাই যাইবে না কি?"

কমলা চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাহার স্নিগ্ধ চক্ষু তুলিয়া কহিল, "কেন, সেখানে তো খুড়োমশায় আছেন।"

কমলার এই কথায় চক্রবর্তী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—কহিলেন, "মা, তুমি যদি সন্তানের প্রতি এতদূর পক্ষপাত দেখাও, তাহা হইলে রমেশবাবু আমাকে দু-চক্ষে দেখিতে পারিবেন না।"

ইহার উত্তরে কমলা কেবল কহিল, "আমি গাজিপুরে যাইব।"

এ-সম্বন্ধে যে কাহারও কোনো সম্মতির অপেক্ষা আছে, কমলার কণ্ঠস্বরে এরূপ প্রকাশ পাইল না।

রমেশ কহিল, "খুড়ো, তবে গাজিপুরই স্থির।"

ঝড়জলের পর সেদিন রাত্রে জ্যোৎস্না পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। রমেশ ডেকের কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরত্বরক্ষা করা দুরূহ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলাই আমার স্ত্রী—আমি তো উহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্র পড়া হয় নাই বলিয়াই

কোনো সংকোচ করা অন্যায়। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধূরূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া দিয়া সেই নির্জন সৈকতদ্বীপে স্বয়ং গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার মতো এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে।

হেমনলিনী এবং রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাধা-অপমান-অবিশ্বাস কাটিয়া যদি রমেশ জয়ী হইতে পারে, তবেই সে মাথা তুলিয়া হেমনলিনীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয়—জিতিবার কোনো আশা থাকে না। কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে? এবং প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা লোকসাধারণের কাছে এমন কদর্য এবং কমলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক আঘাতকর হইয়া উঠিবে যে, সে-সংকল্প মনে স্থান দেওয়া কঠিন।

অতএব দুর্বলের মতো আর দ্বিধা না করিয়া কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিকে শ্রেয় হইবে। হেমনলিনী তো রমেশকে ঘৃণা করিতেছে—এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সংপাত্রে চিত্তসমর্পণ করিতে আনুকূল্য করিবে। এই ভাবিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা সেইদিককার আশাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

৩১

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কী রে, তুই কোথায় চলিয়াছিস?"

উমেশ কহিল, "আমি মাঠাকরুনের সঙ্গে যাইতেছি।"

রমেশ। আমি যে তোর কাশী পর্যন্ত টিকিট করিয়া দিয়াছি। এ যে গাজিপুরের ঘাট। আমরা তো কাশী যাইব না।

উমেশ। আমিও যাইব না।

উমেশ যে তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা রমেশের মনে ছিল না—কিন্তু ছোঁড়াটার অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইল। কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, উমেশকেও লইতে হইবে নাকি?"

কমলা কহিল, "না লইলে ও কোথায় যাইবে?"

রমেশ। কেন, কাশীতে ওর আত্মীয় আছে।

কমলা। না, ও আমাদেরই সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে। উমেশ, দেখিস, তুই খুড়োমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস, নহিলে বিদেশে ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইবি।

কোন্ দেশে যাইতে হইবে, কাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, এ-সমস্ত মীমাংসার ভার কমলা একলাই লইয়াছে। রমেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন পূর্বে কমলা নম্রভাবে স্বীকার করিত, হঠাৎ এই শেষ কয়দিনের মধ্যে তাহা যেন সে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

অতএব উমেশও তাহার ক্ষুদ্র একটি কাপড়ের পুঁটুলি কক্ষে লইয়া চলিল, এ-সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

শহর এবং সাহেবপাড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গায় খুড়োমশায়ের একটি ছোটো বাংলা। তাহার পশ্চাতে আমবাগান, সম্মুখে বাঁধানো কূপ—সামনের দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন—কূপের সিঞ্চিত জলে কপি-কড়াইশুঁটির খেত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রথমদিনে কমলা ও রমেশ এই বাংলাতে গিয়াই উঠিল।

চক্রবর্তী-খুড়ার স্ত্রী হরিভাবিনীর শরীর কাহিল বলিয়া খুড়া লোকসমাজে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার দৌর্বল্যের বাহ্যলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্তসমর্থ চেহারা। সামনের কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁচার অংশই বেশি। তাঁহার সম্বন্ধে জরা যেন কেবলমাত্র ডিক্রী পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

আসল কথা, এই দম্পতিটি যখন তরুণ ছিলেন, তখন হরিভাবিনীকে ম্যালেরিয়ায় খুব শক্ত করিয়া ধরে। বায়ুপরিবর্তন ছাড়া আর-কোনো উপায় না দেখিয়া চক্রবর্তী গাজিপুর ইস্কুলের মাস্টারি জোগাড় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি চক্রবর্তীর কিছুমাত্র আস্থা জন্মে নাই।

অতিথিদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া চক্রবর্তী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "সেজবউ।"

সেজবউ তখন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে রামকৌলিকে দিয়া গম ভাঙাইতেছিলেন এবং ছোটোবড়ো নানাপ্রকার ভাঁড়ে ও হাঁড়িতে নানাজাতীয় চাটনি রৌদ্রে সাজাইতেছিলেন।

চক্রবর্তী আসিয়াই কহিলেন, "এই বুঝি! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে—গায়ে একখানা র‍্যাপার দিতে নাই?"

হরিভাবিনী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। ঠাণ্ডা আবার কোথায়—রৌদ্রে পিঠ পুড়িতেছে।

চক্রবর্তী। সেটাই কি ভালো? ছায়া জিনিসটা তো দুর্মূল্য নয়।

হরিভাবিনী। আচ্ছা সে হবে—তুমি আসিতে এত দেরি করিলে কেন?

চক্রবর্তী। সে অনেক কথা। আপাতত ঘরে অতিথি উপস্থিত। সেবার আয়োজন করিতে হইবে।

এই বলিয়া চক্রবর্তী অভ্যাগতদের পরিচয় দিলেন। চক্রবর্তীর ঘরে হঠাৎ এরূপ বিদেশী অতিথির সমাগম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সস্ত্রীক অতিথির জন্য হরিভাবিনী প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি কহিলেন, "ওমা, তোমার এখানে ঘর কোথায় ?"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আগে তো পরিচয় হউক, তার পরে ঘরের কথা পরে হইবে। আমাদের শৈল কোথায় ?"

হরিভাবিনী। সে তাহার ছেলেকে স্নান করাইতেছে।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি কমলাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিলেন। কমলা হরিভাবিনীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি দক্ষিণ করপুটে কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন এবং স্বামীকে কহিলেন, "দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মতো।"

বিধু ইঁহাদের বড়ো মেয়ে—কানপুরে স্বামিগৃহে থাকে। চক্রবর্তী মনে মনে হাসিলেন, তিনি জানিতেন,কমলার সহিত বিধুর কোনো সাদৃশ্য নাই, কিন্তু হরিভাবিনী রূপগুণে বাহিরের মেয়ের জয় স্বীকার করিতে পারেন না। শৈলজা তাঁহার ঘরেই থাকে, পাছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ তুলনায় বিচারে হার হয়, এইজন্য অনুপস্থিতকে উপমাস্থলে রাখিয়া জয়পতাকা গৃহিণী আপন গৃহের মধ্যেই অচল করিলেন।

হরিভাবিনী। ইঁহারা আসিয়াছেন, তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নতুন বাড়ির তো মেরামত শেষ হয় নাই—এখানে আমরা কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া আছি—ইঁহাদের যে কষ্ট হইবে।

বাজারে চক্রবর্তীর একটা ছোটো বাড়ি মেরামত হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা একটা দোকান—সেখানে বাস করিবার কোনো সুবিধাও নাই, সংকল্পও নাই।

চক্রবর্তী এই মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা যদি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তবে কি উঁহাকে এ-ঘরে আনি। (স্ত্রীর প্রতি) যাই হউক, তুমি আর বাহিরে দাঁড়াইয়ো না—শরৎকালের রৌদ্রটা বড়ো খারাপ।"

এই বলিয়া চক্রবর্তী রমেশের নিকট বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিভাবিনী কমলার বিস্তারিত পরিচয় লইতে লাগিলেন। "তোমার স্বামী বুঝি উকিল ? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন ? তিনি কত রোজগার করেন ? এখনো বুঝি ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই ? তবে চলে কী করিয়া ? তোমার শ্বশুরের বুঝি সম্পত্তি আছে ? জান না ? ও মা কেমন মেয়ে গো ? শ্বশুরবাড়ির

খবর রাখ না? সংসার-খরচের জন্য স্বামী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন? শাশুড়ী যখন নাই, তখন তো সংসারের ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে। তুমি তো নেহাত কচি মেয়েটি নও—আমার বড়ো জামাই যা-কিছু রোজগার করে, সমস্তই বিধুর হাতে গনিয়া দেয়" ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই কমলাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। কমলাও যে রমেশের অবস্থা ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত অল্প জানে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অল্পজ্ঞান যে কত অসংগত ও লোকসমাজে লজ্জাকর, হরিভাবিনীর প্রশ্নমালায় তাহা তাহার মনে স্পষ্ট উদয় হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, আজ পর্যন্ত রমেশের সঙ্গে ভালো করিয়া কোনো কথা আলোচনা করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই—সে রমেশের স্ত্রী হইয়া রমেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আজ ইহা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত বোধ হইল এবং নিজের এই অকিঞ্চিৎকরত্বের লজ্জা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

হরিভাবিনী আবার শুরু করিলেন, "বউমা, দেখি তোমার বালা? এ সোনা তো তেমন ভাল নয়? বাপের বাড়ি হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাই বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি রাখে? তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড়ো জামাই দুই মাস অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।"

এই সমস্ত সওয়াল-জবাবের মধ্যে শৈলজা তাহার দুই বৎসর বয়সের কন্যার হাত ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটোখাটো, মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত—মুখ দেখিলেই স্থির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।

শৈলজার ছোটো মেয়েটি কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্তকাল পর্যবেক্ষণের পর বলিয়া উঠিল—"মাসী"—বিধুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করিয়া যে বলিল, তাহা নহে—একটা বিশেষ বয়সের যে-কোনো মেয়েকে তাহার অপ্রিয় বোধ না হইলেই তাহাকেই সে নির্বিচারে মাসী নামে অভিহিত করে। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হরিভাবিনী শৈলজার নিকট কমলার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইহার স্বামী উকিল, নূতন রোজগার করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইহাদের গাজিপুরে আনিয়াছেন।"

শৈলজা কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলাও শৈলজার মুখের দিকে চাহিল, এবং সেই দৃষ্টিপাতেই এক মুহূর্তে উভয়ের সখ্যবন্ধন বাঁধিয়া গেল। হরিভাবিনী

আতিথ্যের আয়োজনে চলিয়া গেলেন—শৈলজা কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "এস ভাই, আমার ঘরে এস।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হইল। শৈলজার সঙ্গে কমলার বয়সের যে প্রভেদ ছিল, তাহা চোখে দেখিয়া সহসা বোঝা যায় না। শৈলজার সবসুদ্ধ একটু ছোটোখাটো সংক্ষিপ্ত রকমের ভাব—কমলার ঠিক তাহার উল্টা—আয়তনে ও ভাবে ভঙ্গীতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছাড়াইয়া গেছে। বিবাহের পর হইতে তাহার মাথার উপরে শ্বশুরবাড়ির কোনো রকমের চাপ না থাকাতেই হউক বা যে-কারণেই হউক, দেখিতে দেখিতে সে অসংকোচে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবের মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ ছিল। তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তত মনে মনেও সে প্রশ্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। "চুপ করো" "যাহা বলি তাহাই করিয়া যাও" "বউমানুষের অত 'নেই' করা শোভা পায় না"—এ-সব কথা তাহাকে আজ পর্যন্ত শুনিতে হয় নাই। তাই সে যেন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সরলতার মধ্যে সবলতা আছে।

শৈলজার মেয়ে উমি উভয়ের মনোযোগ নিজের প্রতি সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া লইবার বিধিমত চেষ্টা করিলেও দুই নূতন সখীর মধ্যে কথাবার্তা জমিয়া উঠিল। এই কথোপকথন-ব্যাপারে কমলা নিজের তরফের দৈন্য সহজেই বুঝিতে পারিল। শৈলজার বলিবার ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই। কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে, তাহা একটি পেনসিলের ক্ষীণ রেখা মাত্র—তাহার সকল জায়গা পরিস্ফুট সুসংলগ্ন নহে, তাহাতে আজও একটুও রং ফলানো হয় নাই। কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই—হৃদয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেহারাটা তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে নাই। বন্ধুত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল—যে-সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা রহিয়াছে, আঙুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুর বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ-সুরের কোনো ঝংকার দিবার নাই—স্বামীর কথা সে কী বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কী আছে। বলিবার আগ্রহই বা কোথায়। সুখের বোঝাই লইয়া শৈলজার ইতিহাস যেথা হু হু করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কমলার শূন্য নৌকাটা সেখানে মাটিতে ঠেকিয়া অচল হইয়া আছে।

শৈলজার স্বামী বিপিন গাজিপুরে অহিফেন-বিভাগে কাজ করে। চক্রবর্তীর

দুটিমাত্র মেয়ে। বড়ো মেয়ে তো শ্বশুরবাড়ি গেছে। ছোটোটিকে প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে না পারিয়া চক্রবর্তী একটি নিঃস্ব জামাই বাছিয়া আনিলেন এবং সাহেবসুবাকে ধরিয়া এইখানেই তাহার একটা কাজ জুটাইয়া দিলেন। বিপিন ইহাদের বাড়িতেই থাকে।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ এক সময় শৈল বলিল, "তুমি একটু বসো ভাই, আমি এখনি আসিতেছি।" পরক্ষণেই একটু হাসিয়া কারণ দর্শাইয়া কহিল, "উনি স্নান করিয়া ভিতরে আসিয়াছেন—খাইয়া আপিসে যাইবেন।"

কমলা সরল বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "তিনি আসিয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?"

শৈলজা। আর ঠাট্টা করিতে হইবে না। সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে, আমিও তেমনি করিয়া জানি। তুমি নাকি তোমার কর্তাটির পায়ের শব্দ চেন না?

এই বলিয়া হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আঁচলে-বদ্ধ চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া মেয়ে কোলে লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল। পদশব্দের ভাষা যে এতই সহজ, তাহা কমলা আজও জানিতে পারে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া জানলার বাহিরে চোখ রাখিয়া তাই ভাবিতে লাগিল। জানলার বাহিরে একটা পেয়ারা-গাছে ডাল ছাইয়া পেয়ারার ফুল ধরিয়াছে, সেই সমস্ত ফুলের কেশরের মধ্যে মৌমাছির দল তখন লুটোপুটি করিতেছিল।

৩২

একটু ফাঁকা জায়গায় গঙ্গার ধারে একটা আলাদা বাড়ি লইবার চেষ্টা হইতেছে। রমেশ, গাজিপুর-আদালতে বিধি-অনুসারে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য ও জিনিসপত্র আনিতে এক বার কলিকাতায় যাইতে হইবে, স্থির করিয়াছে কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইতেছে না। কলিকাতার একটা বিশেষ গলির চিত্র মনে উঠিলেই রমেশের বুকের ভিতরটা এখনো যেন কিসে চাপিয়া ধরে। এখনো জাল ছেঁড়ে নাই—অথচ কমলার সহিত স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব করিলে আর চলে না। এই সমস্ত দ্বিধায় কলিকাতায় যাত্রার দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

কমলা চক্রবর্তীর অন্তঃপুরেই থাকে। এ-বাংলায় ঘর নিতান্ত কম বলিয়া

রমেশকে বাহিরের ঘরেই থাকিতে হয়—কমলার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় না।

এই অনিবার্য বিচ্ছেদব্যাপার লইয়া শৈলজা কেবলই কমলার কাছে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। কমলা কহিল, "কেন ভাই তুমি এত হাহুতাশ করিতেছ? এমনি কী ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?"

শৈলজা হাসিয়া কহিল, "ইস, তাই তো। একেবারে যে পাষাণের মতো কঠিন মন। ও-সব ছলনায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তোমার মনের মধ্যে যে কী হইতেছে, সে কি আর আমি জানি না?"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, সত্যি করিয়া বলো, দুই দিন যদি বিপিনবাবু তোমাকে দেখা না দেন, তা হইলে কি অমনি—"

শৈলজা সগর্বে কহিল, "ইস, দুই দিন দেখা না দিয়া তাঁর নাকি থাকিবার জো আছে।"

এই বলিয়া বিপিনবাবুর অধৈর্য সম্বন্ধে শৈলজা গল্প করিতে লাগিল। প্রথম-প্রথম বিবাহের পর বালক বিপিন গুরুজনের ব্যূহভেদ করিয়া তাহার বালিকা বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবে কতপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল, কবে ব্যর্থ হইয়াছিল, কবে ধরা পড়িয়াছিল, দিবাসাক্ষাৎকারের নিষেধদুঃখলাঘবের জন্য বিপিনের মধ্যাহ্নভোজনকালে একটা আয়নার মধ্যে গুরুজনদের অজ্ঞাতে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টি-বিনিময় চলিত, তাহা বলিতে বলিতে পুরাতন স্মৃতির আনন্দকৌতুকে শৈলজার মুখখানি হাস্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে যখন আপিসে যাইবার পালা আরম্ভ হইল, তখন উভয়ের বেদনা এবং বিপিনের যখন-তখন আপিস-পলায়ন, সেও অনেক কথা। তাহার পরে এক বার শ্বশুরের ব্যবসায়ের খাতিরে কিছুদিনের জন্য বিপিনের পাটনায় যাইবার কথা হয়, তখন শৈলজা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি পাটনায় গিয়া থাকিতে পারিবে?' বিপিন স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন পারিব না, খুব পারিব।' সেই স্পর্ধাবাক্যে শৈলজার মনে খুব অভিমান হইয়াছিল—সে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদায়ের পূর্বরাত্রে সে কোনোমতে লেশমাত্র শোকপ্রকাশ করিবে না; কেমন করিয়া সে-প্রতিজ্ঞা হঠাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল এবং পরদিনে যখন যাত্রার আয়োজন সমস্তই স্থির, তখন বিপিনের অকস্মাৎ এমনি মাথা ধরিয়া কী-এক-রকমের অসুখ করিতে লাগিল যে, যাত্রা বন্ধ করিতে হইল, তাহার পরে ডাক্তার যখন ওষুধ দিয়া গেল, তখন সে-ওষুধের শিশি গোপনে নর্দামার মধ্যে শূন্য করিয়া অপূর্ব উপায়ে কী করিয়া ব্যাধির অবসান হইল—

এ-সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে কখন যে বেলা অবসান হইয়া আসে, শৈলজার তাহাতে হুঁশ থাকে না—অথচ এমন সময় হঠাৎ দূরে বাহির-দরজায় একটা কিসের শব্দ হয়-কি-না-হয় অমনি শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। বিপিনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত গল্পহাসির অন্তরালে একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেই পথের ধারের বাহির-দরজার দিকেই কান পাতিয়া বসিয়া ছিল।

কমলার কাছে এ-সমস্ত কথা যে একেবারেই আকাশকুসুমের মতো, তাহা নয়—ইহার আভাস সে কিছু-কিছু পাইয়াছে। প্রথম কয়েক মাস রমেশের সহিত প্রথম-পরিচয়ের রহস্যের মধ্যে যেন এইরকমেরই একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরেও ইস্কুল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া কমলা যখন রমেশের কাছে ফিরিয়া আসিল, তখনো মাঝে মাঝে এমন-সকল ঢেউ অপূর্ব সংগীতে ও অপরূপ নৃত্যে তাহার হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে—যাহার ঠিক অর্থটি সে আজ শৈলজার এই সমস্ত গল্পের মধ্য হইতে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তাহার এ-সমস্তই ভাঙাচোরা, ইহার ধারাবাহিকতা কিছুই নাই। তাহাকে যেন কোনো-একটা পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। শৈলজা ও বিপিনের মধ্যে যে একটা আগ্রহের টান, সেটা রমেশ ও তাহার মধ্যে কোথায়? এই যে কয়েক দিন তাহাদের দেখাশোনা বন্ধ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে এমনি কি অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে—এবং রমেশও তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে বসিয়া বসিয়া কোনো প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, তাহা কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ইতিমধ্যে যেদিন রবিবার আসিল, সেদিন শৈলজা কিছু মুশকিলে পড়িল। তাহার নূতন সখীকে দীর্ঘকাল একেবারে একলা পরিত্যাগ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ আজ ছুটির দিন একেবারে ব্যর্থ করিবে, এত-বড়ো ত্যাগশীলতাও তাহার নাই। এদিকে রমেশবাবু নিকটে থাকিতেও কমলা যখন মিলনে বঞ্চিত হইয়া আছে, তখন ছুটির উৎসবে নিজের বরাদ্দ পুরা ভোগ করিতে তাহার ব্যথাও বোধ হইল। আহা, যদি কোনোমতে রমেশের সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া যায়।

এ-সকল বিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত পরামর্শ চলে না—কিন্তু চক্রবর্তী পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করিবার লোক নহেন। তিনি বাড়িতে প্রচার করিয়া দিলেন, আজ তিনি বিশেষ কাজে শহরের বাহিরে যাইতেছেন। রমেশকে বুঝাইয়া গেলেন যে, বাহিরের লোক আজ কেহ তাঁহার বাড়িতে আসিতেছে না—সদর-দরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। এ খবর তাঁহার কন্যাকেও বিশেষ করিয়া

শোনাইয়া দিলেন—নিশ্চয় জানিতেন, কোন্ ইঙ্গিতের কী অর্থ, তাহা বুঝিতে শৈলজার বিলম্ব হয় না।

স্নানের পর শৈলজা কমলাকে বলিল, "এস ভাই, তোমার চুল শুকাইয়া দিই।"

কমলা কহিল, "কেন, আজ এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

শৈলজা। সে-কথা পরে হইবে—তোমার চুলটা আগে বাঁধিয়া দিই।—বলিয়া কমলার মাথা লইয়া পড়িল। আজ বিনানির সংখ্যা অনেক বেশি—খোঁপা একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিল।

তাহার পরে কাপড় লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিষম তর্ক বাধিয়া গেল। শৈলজা তাহাকে যে রঙিন কাপড় পরাইতে চায়, কমলা তাহা পরিবার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে শৈলজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরিতে হইল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর শৈলজা তাহার স্বামীকে কানে-কানে কী একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ছুটি লইয়া আসিল। তাহার পরে বাহিরের ঘরে পাঠাইবার জন্য পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল।

রমেশের কাছে কমলা ইতিপূর্বে অনেক বার অসংকোচে গিয়াছে। এ-সম্বন্ধে সমাজে লজ্জাপ্রকাশের যে কোনো বিধান আছে, তাহা জানিবার সে কোনো অবসর পায় নাই। পরিচয়ের আরম্ভেই রমেশ সংকোচ ভাঙিয়া দিয়াছিল। নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়া ধিক্‌কার দিবার সঙ্গিনীও তাহার কাছে কেহ ছিল না।

কিন্তু আজ শৈলজার অনুরোধ পালন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে শৈলজা যে-অধিকারে যায়, তাহা সে জানিয়াছে—কমলা সেই অধিকারের গৌরব যখন অনুভব করিতেছে না, তখন দীনভাবে সে আজ কেমন করিয়া যাইবে।

কমলাকে যখন কিছুতেই রাজি করা গেল না তখন শৈল মনে করিল, রমেশের 'পরে সে অভিমান করিয়াছে। অভিমান করিবার কথাই বটে। কয়টা দিন কাটিয়া গেল, অথচ রমেশবাবু কোনো ছুতা করিয়া এক বার দেখাসাক্ষাতের চেষ্টাও করিলেন না।

বাড়ির গৃহিণী তখন আহারান্তে ঘরে দুয়ার দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শৈলজা বিপিনকে আসিয়া কহিল, "রমেশবাবুকে তুমি আজ কমলার নাম করিয়া বাড়ির মধ্যেই ডাকিয়া আনো। বাবা কিছু মনে করিবেন না, মা কিছু জানিতেই পারিবেন না।" বিপিনের মতো চুপচাপ মুখচোরা লোকের পক্ষে এরূপ দৌত্য কোনোমতেই

রুচিকর নহে, তথাপি ছুটির দিনে এই অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সে সাহস করিল না।

রমেশ তখন বাহিরের ঘরের জাজিম-পাতা মেজের উপর চিত হইয়া শুইয়া এক পায়ের উচ্ছ্রিত হাঁটুর উপরে আর-এক পা তুলিয়া দিয়া পায়োনিয়র পড়িতেছিল। পাঠ্য অংশ শেষ করিয়া যখন কাজের অভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় বিপিনকে ঘরে আসিতে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সঙ্গী হিসাবে বিপিন যে খুব প্রথমশ্রেণীর পদার্থ, তাহা না হইলেও বিদেশে মধ্যাহ্নযাপনের পক্ষে রমেশ তাহাকে পরমলাভ বলিয়া গণ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল, "আসুন বিপিনবাবু, আসুন, বসুন।"

বিপিন না বসিয়াই একটুখানি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আপনাকে এক বার ইনি ভিতরে ডাকিতেছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে, কমলা?"

বিপিন কহিল, "হাঁ।"

রমেশ কিছু আশ্চর্য হইল। রমেশ পূর্বেই স্থির করিয়াছে, কমলাকে সে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক-দ্বিধাগ্রস্ত মন তৎপূর্বে এই কয়দিন অবকাশ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। কল্পনায় কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া সে মনকে নানাপ্রকার ভাবী সুখের আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে—কিন্তু প্রথম আরম্ভটাই দুরূহ। কিছুদিন হইতে কমলার প্রতি যেটুকু দূরত্ব রক্ষা করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গেছে, হঠাৎ এক দিন কেমন করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এইজন্যই বাড়িভাড়া করিবার দিকে তাহার তেমন সত্বরতা ছিল না।

কমলা ডাকিয়াছে শুনিয়া রমেশের মনে হইল, নিশ্চয় বিশেষ কোনো একটা প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবু প্রয়োজনের ডাক হইলেও তাহার মনের মধ্যে একটা হিল্লোল উঠিল। বিপিনের অনুবর্তী হইয়া পায়োনিয়রটা ফেলিয়া রাখিয়া যখন সে অন্তঃপুরে যাত্রা করিল, তখন এই মধুকরগুঞ্জরিত কার্তিকের আলস্যদীর্ঘ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভিসারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি চঞ্চল করিল।

বিপিন কিছুদূর হইতে ঘর দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমলা মনে করিয়াছিল, শৈলজা তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেছে। তাই সে খোলা দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া সামনের বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল। শৈল কেমন করিয়া কমলার অন্তরে-বাহিরে একটা ভালোবাসার সুর বাঁধিয়া দিয়াছিল।

ঈষত্তপ্ত বাতাসে বাহিরে গাছের পল্লবগুলি যেমন মর্মরশব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল— কমলার বুকের ভিতরেও মাঝে মাঝে তেমনি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়া উঠিয়া অব্যক্ত বেদনায় একটি অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছিল।

এমন সময়ে রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল— "কমলা"—তখন সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তরঙ্গিত হইতে লাগিল, যে কমলা ইতিপূর্বে কখনো রমেশের কাছে বিশেষ লজ্জা অনুভব করে নাই, সে আজ ভালো করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আজিকার সাজসজ্জায় ও ভাবে-আভাসে রমেশ কমলাকে নূতন মূর্তিতে দেখিল। হঠাৎ কমলার এই বিকাশ তাহাকে আশ্চর্য এবং অভিভূত করিল। সে আস্তে আস্তে কমলার কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ ?"

কমলা চমকিয়া উঠিয়া অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, "না না না, আমি ডাকি নাই—আমি কেন ডাকিতে যাইব।"

রমেশ কহিল, "ডাকিলেই বা দোষ কী কমলা ?"

কমলা দ্বিগুণ প্রবলতার সহিত বলিল, "না, আমি ডাকি নাই।"

রমেশ কহিল, "তা বেশ কথা। তুমি না ডাকিতেই আমি আসিয়াছি। তাই বলিয়াই কি অনাদরে ফিরিয়া যাইতে হইবে ?"

কমলা। তুমি এখানে আসিয়াছ, সকলে জানিতে পারিলে রাগ করিবেন— তুমি যাও। আমি তোমাকে ডাকি নাই।

রমেশ কমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমার ঘরে এস— সেখানে বাহিরের লোক কেহ নাই।"

কমলা কম্পিতকলেবরে তাড়াতাড়ি রমেশের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

রমেশ বুঝিল, এ সমস্তই বাড়ির কোনো মেয়ের ষড়যন্ত্র—এই বুঝিয়া পুলকিত-দেহে বাহিরের ঘরে গেল। চিত হইয়া পড়িয়া আর-এক বার পায়োনিয়রটা টানিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনশ্রেণীর উপরে চোখ বুলাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই অর্থগ্রহ হইল না। তাহার হৃদয়াকাশে নানারঙের ভাবের মেঘ উড়ো-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শৈল রুদ্ধঘরে ঘা দিল—কেহ দরজা খুলিল না। তখন সে দরজার খড়খড়ি খুলিয়া বাহির হইতে হাত গলাইয়া দিয়া ছিটকিনি খুলিয়া ফেলিল। ঘরে ঢুকিয়া

দেখে, কমলা মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

শৈল আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি কি ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহার জন্য কমলা এত আঘাত পায়। তাড়াতাড়ি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "কেন ভাই, তোমার কী হইয়াছে—তুমি কেন কাঁদিতেছ।"

কমলা কহিল, "তুমি কেন উঁহাকে ডাকিয়া আনিলে? তোমার ভারি অন্যায়।"

কমলার এই সকল আকস্মিক আবেগের প্রবলতা তাহার নিজের পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত। ইহার মধ্যে যে তাহার কতদিনের গুপ্তবেদনার সঞ্চয় আছে, তাহা কেহই জানে না।

কমলা আজ একটা কল্পনালোক অধিকার করিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়া ছিল। রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে সুখেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া ফেলা হইল। কমলাকে ছুটির সময় ইস্কুলে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা, স্টীমারে রমেশের ঔদাসীন্য, এ-সমস্তই মনের তলদেশে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আনিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিসটি যে কী, তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্পদিনেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু শৈলর পক্ষে এ-সব কথা বোঝা শক্ত। কমলা এবং রমেশের মাঝখানে যে কোনোপ্রকারের সত্যকার ব্যবধান থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে বহুযত্নে কমলার মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, রমেশবাবু কি তোমাকে কোনো কঠিন কথা বলিয়াছেন? হয়তো ইনি তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন। তুমি বলিলে না কেন যে, এ-সমস্ত আমার কাজ।"

কমলা কহিল, "না না, তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কেন তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে?"

শৈল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই দোষ হইয়াছে, মাপ করো।"

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিল—কহিল, "যাও ভাই, যাও তুমি, বিপিনবাবু রাগ করিতেছেন।"

বাহিরে নির্জন ঘরে রমেশ পায়োনিয়রের উপর অনেকক্ষণ বৃথা চোখ বুলাইয়া এক সময় সবলে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "না আর

না। কালই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিব। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যত দিন বিলম্ব হইতেছে, ততই আমার অন্যায় বাড়িতেছে।"

রমেশের কর্তব্যবুদ্ধি হঠাৎ আজ পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া সমস্ত দ্বিধা-সংশয় একলম্ফে অতিক্রম করিল।

৩৩

রমেশ ঠিক করিয়াছিল কলিকাতায় সে কেবল কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে, কলুটোলার সে-গলির ধার দিয়াও যাইবে না।

রমেশ দরজিপাড়ার বাসায় আসিয়া উঠিল। দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ই কাজ-কর্মে কাটে, বাকি সময়টা ফুরাইতে চায় না। রমেশ কলিকাতায় যে-দলের সহিত মিশিত, এবারে আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিল না। পাছে পথে কাহারও সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে যথাসাধ্য সাবধানে থাকিত।

কিন্তু রমেশ কলিকাতায় আসিতেই একটা পরিবর্তন অনুভব করিল। যে নির্জন অবকাশের মাঝখানে, যে নির্মল শান্তির পরিবেষ্টনে কমলা তাহার নবকৈশোরের প্রথম আবির্ভাব লইয়া রমেশের কাছে রমণীয় হইয়া দেখা দিয়াছিল, কলিকাতায় তাহার মোহ অনেকটা ছুটিয়া গেল। দরজিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে কল্পনাক্ষেত্রে আনিয়া ভালোবাসার মুগ্ধনেত্রে দেখিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু এখানে তাহার মন কোনোমতে সাড়া দিল না—আজ কমলা তাহার কাছে অপরিণতা অশিক্ষিতা বালিকার রূপে প্রতিভাত হইল।

জোর যতই অতিরিক্তমাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, জোর ততই কমিয়া আসিতে থাকে। হেমনলিনীকে কোনোমতেই মনের মধ্যে আমল দিবে না, এই পণ করিতে করিতেই অহোরাত্র হেমনলিনীর কথা রমেশের মনে জাগরূক থাকে। ভুলিবার কঠিন সংকল্পই স্মরণে রাখিবার প্রবল সহায় হইয়া উঠিল।

রমেশের যদি কিছুমাত্র তাড়া থাকিত, তবে বহু পূর্বেই কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া সে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সামান্য কাজ গড়াইতে গড়াইতে বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাল রমেশ প্রথমে কার্যানুরোধে এলাহাবাদে যাত্রা করিয়া সেখান হইতে গাজিপুরে ফিরিবে। এত দিন সে ধৈর্যরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে-ধৈর্যের

কি কোনো পুরস্কার নাই ? বিদায়ের আগে গোপনে এক বার কলুটোলার খবর লইয়া আসিলে ক্ষতি কী ?

আজ কলুটোলার সেই গলিতে যাওয়া স্থির করিয়া সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহাতে কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিল। এবারে গাজিপুরে ফিরিয়া গিয়া সে অগত্যা হতভাগিনী কমলাকে নিজের পরিণীত-পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এইরূপে হেমনলিনীর সহিত তাহার সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্বে সত্য ঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানাইয়া এই পত্রদ্বারা সে বিদায় গ্রহণ করিল।

চিঠি লিখিয়া লেফাফার মধ্যে পুরিয়া উপরে কাহারও নাম লিখিল না, ভিতরেও কাহাকেও সম্বোধন করিল না। অন্নদাবাবুর ভৃত্যেরা রমেশের প্রতি অনুরক্ত ছিল— কারণ রমেশ, হেমনলিনীর সম্পর্কীয় স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত। এইজন্য সেই বাড়ির চাকর-বাকরেরা রমেশের নিকট হইতে নানা উপলক্ষ্যে কাপড়চোপড় পার্বণী হইতে বঞ্চিত হইত না। রমেশ ঠিক করিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে কলুটোলার বাড়িতে গিয়া এক বার সে দূর হইতে হেমনলিনীকে দেখিয়া আসিবে এবং কোনো এক জন চাকরকে দিয়া এই চিঠি গোপনে হেমনলিনীর হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে চিরকালের মতো তাহার পূর্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় রমেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া সেই চিরপরিচিত গলির মধ্যে স্পন্দিত-বক্ষে কম্পিতপদে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল— দ্বার রুদ্ধ, উপরে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত জানালা বন্ধ, বাড়ি শূন্য, অন্ধকার।

তবু রমেশ দ্বারে ঘা দিল। দুই-চার বার আঘাত করিতে করিতে ভিতর হইতে এক জন বেহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও সুখন নাকি ?"

বেহারা কহিল, "হাঁ বাবু, আমি সুখন।"

রমেশ। বাবু কোথায় গেছেন ?

বেহারা। দিদিঠাকরুনকে লইয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

রমেশ। কোথায় গেছেন ?

বেহারা। তাহা তো বলিতে পারি না।

রমেশ। আর কে সঙ্গে গেছেন ?

বেহারা। নলিনবাবু সঙ্গে গেছেন ?

রমেশ। নলিনবাবুটি কে?

বেহারা। তাহা তো বলিতে পারি না।

রমেশ প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিল, নলিনবাবু যুবাপুরুষ, কিছুকাল হইতে এই বাড়িতে যাতায়াত করিতেছেন। যদিও রমেশ হেমনলিনীর আশা ত্যাগ করিয়াই যাইতেছিল, তথাপি নলিনবাবুটির প্রতি তাহার সদ্ভাব আকৃষ্ট হইল না।

রমেশ। তোর দিদিঠাকরুনের শরীর কেমন আছে?

বেহারা কহিল, "তাঁহার শরীর তো ভালোই আছে।"

সুখন-বেহারাটা ভাবিয়াছিল, এই সুসংবাদে রমেশবাবু নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবেন। অন্তর্যামী জানেন, সুখন-বেহারা ভুল বুঝিয়াছিল।

রমেশ কহিল, "আমি একবার উপরের ঘরে যাইব।"

বেহারা তাহার ধূমোচ্ছ্বসিত কেরোসিনের ডিপা লইয়া রমেশকে উপরে লইয়া গেল। রমেশ ভূতের মতো ঘরে ঘরে এক বার ঘুরিয়া বেড়াইল—দুই-একটা চৌকি ও সোফা বাছিয়া লইয়া তাহার উপরে বসিল। জিনিসপত্র গৃহসজ্জা, সমস্তই ঠিক পূর্বের মতোই আছে, মাঝে হইতে নলিনবাবুটি কে আসিল? পৃথিবীতে কাহারও অভাবে অধিক দিন কিছুই শূন্য থাকে না। যে বাতায়নে রমেশ এক দিন হেমনলিনীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণদিনের সূর্যাস্ত-আভায় দুটি হৃদয়ের নিঃশব্দ মিলনকে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল—সেই বাতায়নে আর কি সূর্যাস্তের আভা পড়ে না? সেই বাতায়নে আর কেহ আসিয়া আর-এক দিন যখন যুগল-মূর্তি রচনা করিতে চাহিবে, তখন পূর্ব-ইতিহাস আসিয়া কি তাহাদের স্থান রোধ করিয়া দাঁড়াইবে, নিঃশব্দে তর্জনী তুলিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে? ক্ষুণ্ণ অভিমানে রমেশের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন রমেশ এলাহাবাদে না গিয়া একেবারে গাজিপুরে চলিয়া গেল।

৩৪

কলিকাতায় রমেশ প্রায় মাসখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। এই এক মাস কমলার পক্ষে অল্পদিন নহে। কমলার জীবনে একটা পরিণতির স্রোত হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। ঊষার আলো যেমন দেখিতে দেখিতে প্রভাতের রৌদ্রে ফুটিয়া পড়ে, কমলার নারীপ্রকৃতি তেমনি অতি অল্পকালের মধ্যেই সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। শৈলজার সহিত যদি তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকের ছটা ও উত্তাপ যদি প্রতিফলিত

হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরে না পড়িত, তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইত বলা যায় না।

ইতিমধ্যে রমেশের আসিবার দেরি দেখিয়া শৈলজার বিশেষ অনুরোধে খুড়া কমলাদের বাসের জন্য শহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটি বাংলা ঠিক করিয়াছেন। অল্পস্বল্প আসবাব সংগ্রহ করিয়া বাড়িটি বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন এবং নূতন ঘরকন্নার জন্য আবশ্যকমত চাকরদাসীও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেকদিন দেরি করিয়া রমেশ যখন গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন খুড়ার বাড়িতে পড়িয়া থাকিবার আর কোনো ছুতা থাকিল না। এতদিন পরে কমলা নিজের স্বাধীন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাংলাটির চারিদিকে বাগান করিবার মতো জমি যথেষ্ট আছে। দুই সারি সুদীর্ঘ শিশুগাছের ভিতর দিয়া একটি ছায়াময় রাস্তা গেছে। শীতের শীর্ণ গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়া বাড়ি এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নিচু চর পড়িয়াছে—সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধুম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে। বাড়ীর দক্ষিণ সীমানায় গঙ্গার দিকে একটি বৃহৎ বৃদ্ধ নিমগাছ আছে, তাহার তলা বাঁধানো।

বহুদিন ভাড়াটের অভাবে বাড়ি ও জমি অনাদৃত অবস্থায় থাকাতে বাগানে গাছপালা প্রায় কিছুই ছিল না এবং ঘরগুলি অপরিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কমলার কাছে এ-সমস্তই অত্যন্ত ভালো লাগিল। গৃহিণীপদলাভের আনন্দ-আভায় তাহার চক্ষে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিল। কোন্ ঘর কী কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, জমির কোথায় কিরূপ গাছপালা লাগাইতে হইবে, তাহা সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। খুড়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কমলা সমস্ত জমিতে চাষ দিয়া লইবার ব্যবস্থা করিল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া রান্নাঘরের চুলা বানাইয়া লইল এবং তাহার পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ার-ঘরে যেখানে যেরূপ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা সাধন করিল। সমস্তদিন ধোয়ামাজা গোছানোগাছানো—কাজকর্মের আর অন্ত নাই। চারিদিকেই কমলার মমত্ব আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

গৃহকর্মের মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য যেমন বিচিত্র, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে। রমেশ আজ কমলাকে সেই কর্মের মাঝখানে দেখিল—সে যেন পাখিকে খাঁচার বাহিরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল।

এতদিন কমলাকে রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই— আজ তাহাকে আপন নূতন সংসারের শিখরদেশে যখন দেখিল, তখন তাহার সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা মহিমা দেখিতে পাইল।

কমলার কাছে আসিয়া রমেশ কহিল, "কমলা, করিতেছ কী? শ্রান্ত হইয়া পড়িবে যে।"

কমলা তাহার কাজের মাঝখানে একটুখানি থামিয়া রমেশের দিকে মুখ তুলিয়া তাহার মিষ্টমুখের হাসি হাসিল—কহিল, "না, আমার কিছু হইবে না।"

রমেশ যে তাহার তত্ত্ব লইতে আসিল, এটুকু সে পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মুগ্ধ রমেশ ছুতা করিয়া আবার তাহার কাছে গিয়া কহিল, "তোমার খাওয়া হইয়াছে তো কমলা?"

কমলা কহিল, "বেশ, খাওয়া হয় নাই তো কী। কোন্‌কালে খাইয়াছি।"

রমেশ এ খবর জানিত, তবু এই প্রশ্নের ছলে কমলাকে একটুখানি আদর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না—কমলাও রমেশের এই অনাবশ্যক প্রশ্নে যে একটুখানি খুশি হয় নাই, তাহা নহে।

রমেশ আবার একটুখানি কথাবার্তার সূত্রপাত করিবার জন্য কহিল, "কমলা, তুমি নিজের হাতে কত করিবে—আমাকে একটু খাটাইয়া লও না।"

কর্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়ো একটা বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের ভয় হয়, যে-কাজ তাহারা নিজে না করিবে, সেই কাজ অন্যে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। কমলা হাসিয়া কহিল, "না, এ-সমস্ত কাজ তোমাদের নয়।"

রমেশ কহিল, "পুরুষরা নিতান্তই সহিষ্ণু বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি তোমাদের এই অবজ্ঞা আমরা সহ্য করিয়া থাকি, বিদ্রোহ করি না—তোমাদের মতো যদি স্ত্রীলোক হইতাম, তবে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম। আচ্ছা, খুড়াকে তো তুমি খাটাইতে ত্রুটি কর না—আমি এতই কি অকর্মণ্য।"

কমলা কহিল, "তা জানি না, কিন্তু তুমি রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়াইতেছ, তাহা মনে করিলেই আমার হাসি পায়। তুমি এখান থেকে সরো—এখানে ভারি ধুলা উড়াইয়াছে।"

রমেশ কমলার সহিত কথা চালাইবার জন্য বলিল, "ধুলা তো লোক বিচার করে না, ধুলা আমাকেও যে-চক্ষে দেখে, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখে।"

কমলা। আমার কাজ আছে বলিয়া ধুলা সহিতেছি, তোমার কাজ নাই, তুমি কেন ধুলা সহিবে?

রমেশ ভৃত্যদের কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কাজ থাক বা না থাক, তুমি যাহা সহ্য করিবে, আমি তাহার অংশ লইব।"

কমলার কর্ণমূল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল—রমেশের কথার কোনো উত্তর না দিয়া কমলা একটু সরিয়া গিয়া কহিল, "উমেশ, এইখানটায় আর-এক ঘড়া জল ঢাল না—দেখছিস নে কত কাদা জমিয়া আছে। ঝাঁটাটা আমার হাতে দে দেখি।" বলিয়া ঝাঁটা লইয়া খুব বেগে মার্জনকার্যে নিযুক্ত হইল।

রমেশ কমলাকে ঝাঁট দিতে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আহা কমলা, ও কী করিতেছ?"

পিছন হইতে শুনিতে পাইল, "কেন রমেশবাবু, অন্যায় কাজটা কী হইতেছে? এদিকে ইংরেজি পড়িয়া আপনারা মুখে সাম্য প্রচার করেন; ঝাঁট দেওয়ার কাজটা যদি এত হেয় মনে হয়, তবে চাকরের হাতেই বা ঝাঁটা দেন কেন? আমি মূর্খ, আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, সতী মায়ের হাতের ওই ঝাঁটার প্রত্যেক কাঠি সূর্যের রশ্মিচ্ছটার মতো আমার কাছে উজ্জ্বল ঠেকে। মা, তোমার জঙ্গল আমি একরকম প্রায় শেষ করিয়া আসিলাম, কোনখানে তরকারির খেত করিবে, আমাকে এক বার দেখাইয়া দিতে হইবে।"

কমলা কহিল, "খুড়ামশায়, একটুখানি সবুর করো, আমার এ ঘর সারা হইল বলিয়া।"

এই বলিয়া কমলা ঘর-পরিষ্কার শেষ করিয়া কোমরে-জড়ানো আঁচল মাথায় তুলিয়া বাহিরে আসিয়া খুড়ার সহিত তরকারির খেত লইয়া গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ঘর-গোছানো এখনো ঠিকমতো হইয়া উঠিল না। বাংলাঘর অনেকদিন অব্যবহৃত ও রুদ্ধ ছিল, আরও দুই-চারি দিন ঘরগুলি ধোয়ামাজা করিয়া জানলা-দরজা খুলিয়া না রাখিলে তাহা বাসযোগ্য হইবে না দেখা গেল।

কাজেই আবার আজ সন্ধ্যার পরে খুড়ার বাড়িতেই আশ্রয় লইতে হইল। আজ তাহাতে রমেশের মনটা কিছু দমিয়া গেল। আজ তাহাদের নিজের নিভৃত ঘরটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বালিবে এবং কমলার সলজ্জ স্মিতহাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয় নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্তদিন থাকিয়া থাকিয়া

কল্পনা করিতেছিল। আরও দুই-চারি দিন বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া রমেশ তাহার আদালতপ্রবেশ-সম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

৩৫

পরদিন কমলার নূতন বাসায় শৈলর চড়িভাতির নিমন্ত্রণ হইল। বিপিন আহারান্তে আপিসে গেলে পর শৈল নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেল। কমলার অনুরোধে খুড়া সেদিন সোমবারের স্কুল কামাই করিয়াছিলেন। দুই জনে মিলিয়া নিমগাছতলায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন, উমেশ সহায়কার্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

রান্না ও আহার হইয়া গেলে পর খুড়া ঘরের মধ্যে গিয়া মধ্যাহ্ন-নিদ্রায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই সখীতে নিমগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহাদের সেই চিরদিনের আলোচনায় নিবিষ্ট হইল। এই গল্পগুলির সহিত মিশিয়া কমলার কাছে এই নদীর তীর, এই শীতের রৌদ্র, এই গাছের ছায়া বড়ো অপরূপ হইয়া উঠিল,—ওই মেঘশূন্য নীলাকাশের যত সুদূর উচ্চে রেখার মতো হইয়া চিল ভাসিতেছে, কমলার বক্ষোবাসী একটা উদ্দেশ্যহারা আকাঙ্ক্ষা ততদূরেই উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা যাইতে না যাইতেই শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী আপিস হইতে আসিবে। কমলা কহিল, "এক দিনও কি ভাই তোমার নিয়ম ভাঙিবার জো নাই?"

শৈল তাহার কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল—এবং বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, "বাবা, আমি বাড়ি যাইতেছি।"

কমলাকে খুড়া কহিলেন, "মা, তুমিও চলো।"

কমলা কহিল, "না, আমার কাজ বাকি আছে, আমি সন্ধ্যার পরে যাইব।"

খুড়া তাঁহার পুরাতন চাকরকে ও উমেশকে কমলার কাছে রাখিয়া শৈলকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন, সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল—কহিলেন, "আমার ফিরিতে বেশি বিলম্ব হইবে না।"

কমলা যখন তাহার ঘর-গোছানোর কাজ শেষ করিল, তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই। সে মাথায়-গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিমগাছের তলায় আসিয়া বসিল। দূরে ওপারে যেখানে বড়ো বড়ো গোটা-দুই-তিন নৌকার মাস্তুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারই পশ্চাতের উঁচু পাড়ির আড়ালে সূর্য নামিয়া গেল।

এমন সময় উমেশটা একটা ছুতা করিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মা, অনেকক্ষণ তুমি পান খাও নাই—ও-বাড়ি হইতে আসিবার সময় আমি পান জোগাড় করিয়া আনিয়াছি।" বলিয়া একটা কাগজে মোড়া কয়েকটা পান কমলার হাতে দিল।

কমলার তখন চৈতন্য হইল—সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উমেশ কহিল, "চক্রবর্তীমশায় গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কমলা গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বাংলার মধ্যে ঘরগুলি আর-এক বার দেখিয়া লইবার জন্য প্রবেশ করিল।

বড়ো ঘরে শীতে সময় আগুন জ্বালিবার জন্য বিলাতি ছাঁদের একটি চুল্লি ছিল। তাহারই সংলগ্ন থাকের উপরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই থাকের উপর কমলা পানের মোড়ক রাখিয়া কী একটা পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কাগজের মোড়কে রমেশের হস্তাক্ষরে তাহার নিজের নাম কমলার চোখে পড়িল।

উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাগজ তুই কোথায় পেলি ?"

উমেশ কহিল, "বাবুর ঘরের কোণে পড়িয়াছিল, ঝাঁট দিবার সময় তুলিয়া আনিয়াছি।"

কমলা সেই কাগজখানা মেলিয়া ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

হেমনলিনীকে রমেশ সেদিন যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিল, এটা সেই চিঠি। স্বভাবশিথিল রমেশের হাত হইতে কখন সেটা কোথায় পড়িয়া গড়াইতেছিল, তাহা তাহার হুঁশ ছিল না।

কমলার পড়া হইয়া গেল। উমেশ কহিল, "মা, অমন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে। রাত হইয়া যাইতেছে।"

ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া উমেশ ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, আমার কথা শুনিতেছ না ? ঘরে চলো, রাত হইল।"

কিছুক্ষণ পরে খুড়ার চাকর আসিয়া কহিল, "মায়ীজি, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। চলো আমরা যাই।"

৩৬

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আজ কি তোমার শরীর ভালো নাই ? মাথা ধরিয়াছে ?"

কমলা কহিল, "না। খুড়ামশায়কে দেখিতেছি না কেন ?"

শৈল কহিল, "ইস্কুলে বড়োদিনের ছুটি আছে—দিদিকে দেখিবার জন্য মা তাঁহাকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছেন—কিছুদিন হইতে দিদির শরীর ভালো নাই।"

কমলা কহিল, "তিনি কবে ফিরিবেন ?"

শৈল। তাঁর ফিরিতে অন্তত হপ্তাখানেক দেরি হইবার কথা। তোমাদের বাংলা সাজানো লইয়া তুমি সমস্ত দিন বড়ো বেশি পরিশ্রম কর, আজ তোমাকে বড়ো খারাপ দেখা যাইতেছে। আজ সকাল সকাল খাইয়া শুইতে যাও।

শৈলকে কমলা যদি সকল কথা বলিতে পারিত, তবে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু বলিবার কথা নয়। 'যাহাকে এতকাল আমার স্বামী বলিয়া জানিতাম, সে আমার স্বামী নয়'—এ-কথা আর যাহাকে হউক, শৈলকে কোনোমতেই বলা যায় না।

কমলা শোবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপের আলোকে আর এক বার রমেশের সেই চিঠি লইয়া বসিল। চিঠি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইতেছে, তাহার নাম নাই, ঠিকানা নাই—কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক, রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল ও কমলাকে লইয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে, তাহা চিঠি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাহাকে চিঠি লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালোবাসে এবং দৈবদুর্বিপাকে কোথা হইতে কমলা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই ভালোবাসার বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মত ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ-কথাও চিঠিতে গোপন নাই।

সেই নদীর চরে রমেশের সহিত প্রথম মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাজিপুরে আসা পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি কমলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল—যাহা অস্পষ্ট ছিল, সমস্ত স্পষ্ট হইল।

রমেশ যখন বরাবর তাহাকে পরের স্ত্রী বলিয়া জানিতেছে এবং ভাবিয়া অস্থির হইতেছে যে, তাহাকে লইয়া কী করিবে, তখন যে কমলা নিশ্চিন্তমনে তাহাকে স্বামী জানিয়া অসংকোচে তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী ঘরকন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিতেছে, ইহার লজ্জা কমলাকে বারবার করিয়া তপ্তশেলে বিঁধিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এ লজ্জা তাহার জীবনে একেবারে মাখা হইয়া গেছে—ইহা হইতে কিছুতেই আর তাহার উদ্ধার নাই।

রুদ্ধঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া কমলা খিড়কির বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার শীতের রাত্রি—কালো আকাশ কালো পাথরের মতো কনকনে ঠাণ্ডা। কোথাও বাষ্পের লেশ নাই; তারাগুলি সুস্পষ্ট জ্বলিতেছে।

সম্মুখে খর্বাকার কলমের আমের বন অন্ধকার বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা কোনোমতেই কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে ঠাণ্ডা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, কাঠের মূর্তির মতো স্থির হইয়া রহিল—তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না।

এমন কতক্ষণ সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না—কিন্তু তীব্র শীত তাহার হৃৎপিণ্ডকে দোলাইয়া দিল—তাহার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় যখন নিস্তব্ধ তালবনের অন্তরালে অন্ধকারের একটি প্রান্তকে ছিন্ন করিয়া দিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সকালবেলা কমলা চোখ মেলিয়া দেখিল, শৈল তাহার খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। অনেক বেলা হইয়া গেছে বুঝিয়া লজ্জিত কমলা তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

শৈল কহিল, "না ভাই, তুমি উঠিয়ো না, আর একটু ঘুমাও—নিশ্চয় তোমার শরীর ভালো নাই। তোমার মুখ বড়ো শুকনো দেখাইতেছে, চোখের নিচে কালি পড়িয়া গেছে। কী হইয়াছে ভাই, আমাকে বলো না।" বলিয়া শৈলজা কমলার পাশে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কমলার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার অশ্রু আর বাধা মানে না। শৈলজার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া তাহার কান্না একেবারে ফাটিয়া বাহির হইল। শৈল একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

একটু পরেই কমলা তাড়াতাড়ি শৈলজার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল—চোখ মুছিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল কহিল, "নাও নাও, আর হাসিতে হইবে না। ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছি, তোমার মতো এমন চাপা মেয়ে আমি দেখি নাই। কিন্তু তুমি মনে করিতেছ আমার কাছে লুকাইবে—আমাকে তেমন হাবা পাও নাই। তবে বলিব ? রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে এক-খানি চিঠি লিখেন নি তাই রাগ হইয়াছে—অভিমানিনী! কিন্তু তোমারও বোঝা উচিত, তিনি সেখানে কাজে গেছেন, দুদিন বাদেই আসিবেন—ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন, তাই বলিয়া কি অত রাগ করিতে আছে। ছি। তাও বলি ভাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি—আমি হইলেও ঠিক ওই কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম। এমন মিছিমিছি কান্না মেয়েমানুষকে অনেক কাঁদিতে হয়। আবার এই কান্না ঘুচিয়া গিয়া যখন হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তখন কিছুই মনে থাকিবে না।" এই বলিয়া কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শৈল কহিল, "আজ

তুমি মনে করিতেছ, রমেশবাবুকে আর কখনো তুমি মাপ করিবে না—তাই না? আচ্ছা সত্যি বলো।"

কমলা কহিল, "হাঁ, সত্যিই বলিতেছি।"

শৈল কমলার গালে করতলের আঘাত করিয়া কহিল, "ইস! তাই বই কি! দেখা যাইবে। আচ্ছা বাজি রাখো।"

কাল সকালে কমলার সঙ্গে কথাবার্তা হইবার পরেই শৈল এলাহাবাদে তার বাপকে চিঠি পাঠাইল। তাহাতে লিখিল, "কমলা রমেশবাবুর কোনো চিঠিপত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছে। একে বেচারা নূতন বিদেশে আসিয়াছে, তাহার 'পরে রমেশ-বাবু যখন তখন তাহাকে ফেলিয়া যাইতেছেন এবং চিঠিপত্র লিখিতেছেন না, ইহাতে তাহার কী কষ্ট হইতেছে, এক বার ভাবিয়া দেখো দেখি। তাঁহার এলাহাবাদের কাজ কি আর শেষ হইবে না নাকি? কাজ তো ঢের লোকের থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া দুই ছত্র চিঠি লিখিবার কি অবসর পাওয়া যায় না?"

খুড়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার কন্যার পত্রের অংশবিশেষ শুনাইয়া ভৎর্সনা করিলেন।

কমলার দিকে রমেশের মন যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, এ-কথা সত্য, কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহার দ্বিধা আরও বাড়িয়া উঠিল।

এই দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া রমেশ কোনোমতেই এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে পারিতে-ছিল না। ইতিমধ্যে খুড়ার কাছ হইতে শৈলর চিঠি শুনিল।

চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারিল, কমলা রমেশের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে—সে কেবল নিজে লজ্জায় লিখিতে পারে নাই।

ইহাতে রমেশের দ্বিধার দুই শাখা দেখিতে দেখিতে একটাতে আসিয়া মিলিয়া গেল। এখন তো রমেশের কেবলমাত্র সুখদুঃখ লইয়া কথা নয়, কমলাও যে রমেশকে ভালোবাসিয়াছে। বিধাতা যে কেবল নদীর চরের উপরে তাহাদের দুই জনকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা নহে, হৃদয়ের মধ্যেও এক করিয়াছেন।

এই ভাবিয়া রমেশ আর বিলম্বমাত্র না করিয়া কমলাকে এক চিঠি লিখিয়া বসিল। লিখিল—

"প্রিয়তমাসু—

"কমলা, তোমাকে এই যে সম্ভাষণ করিলাম, ইহাকে চিঠি লিখিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিয়ো না। যদি তোমাকে আজ পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রিয় বলিয়া না জানিতাম, তবে কখনোই

আজ 'প্রিয়তমা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিতাম না। যদি তোমার মনে কখনো কোনো সন্দেহ হইয়া থাকে, যদি তোমার কোমল হৃদয়ে কখনো কোনো আঘাত করিয়া থাকি, তবে এই যে আজ সত্য করিয়া তোমাকে ডাকিলাম 'প্রিয়তমা', ইহাতেই আজ তোমার সমস্ত সংশয়, সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ক্ষালন করিয়া দিক। ইহার চেয়ে তোমাকে আর বেশি বিস্তারিত করিয়া কী বলিব। এ-পর্যন্ত আমার অনেক আচরণ তোমার কাছে নিশ্চয় ব্যথাজনক হইয়াছে—সেজন্য যদি তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাক, তবে আমি প্রতিবাদী হইয়া তাহার লেশমাত্র প্রতিবাদ করিব না—আমি কেবল বলিব, আজ তুমি আমার প্রিয়তমা, তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেহই নাই—ইহাতেও যদি আমার সমস্ত অপরাধের, সমস্ত অসংগত আচরণের শেষ জবাব না হয়, তবে আর কিছুতেই হইবে না।

"অতএব কমলা, আজ তোমাকে এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করিয়া আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন অতীতকে দূরে সরাইয়া দিলাম, এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করিয়া আমাদের ভালোবাসার ভবিষ্যৎকে আরম্ভ করিলাম। তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি, তুমি আজ আমার 'প্রিয়তমা' এই কথাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো। ইহা যদি ঠিক তুমি মনে গ্রহণ করিতে পার, তবে কোনো সংশয় লইয়া আমাকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

"তাহার পরে, আমি তোমার ভালোবাসা পাইয়াছি কি না, সে-কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিবও না। আমার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের অনুকূল উত্তর এক দিন তোমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া পৌঁছিবে, ইহাতে আমি সন্দেহমাত্র করি না। ইহা আমি আমার ভালোবাসার জোরে বলিতেছি ;—আমার যোগ্যতা লইয়া অহংকার করি না, কিন্তু আমার সাধনা কেন সার্থক হইবে না ?

"আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেমন সহজ হইতেছে না—তাহা রচনার মতো শুনাইতেছে—ইচ্ছা করিতেছে, এ-চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলি। কিন্তু যে-চিঠি মনের মতো হইবে, সে-চিঠি এখনি লেখা সম্ভব হইবে না। কেন না, চিঠি দুজনের জিনিস, কেবল এক পক্ষ যখন চিঠি

লেখে, তখন সে-চিঠিতে সব কথা ঠিক করিয়া লেখা চলে না—তোমাতে আমাতে যেদিন মন-জানাজানির বাকি থাকিবে না, সেইদিনই চিঠির মতো চিঠি লিখিতে পারিব। সামনাসামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে। কমলা, প্রিয়তমা, তোমার হৃদয় কবে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব।

"এ-সব কথার মীমাংসা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হইবে—ব্যস্ত হইয়া ফল নাই। যেদিন আমার চিঠি পাইবে, তাহার পরের দিন সকালবেলাতেই আমি গাজিপুরে পৌঁছিব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই, গাজিপুরে পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই যেন তোমাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন গৃহহারার মতো কাটিল—আর আমার ধৈর্য নাই—এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব—হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিতে দেখিব। সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার আমাদের শুভদৃষ্টি হইবে। মনে আছে—আমাদের প্রথমবার সেই শুভদৃষ্টি? সেই জ্যোৎস্নারাত্রে, সেই নদীর ধারে, জনশূন্য বালুমরুর মধ্যে? সেখানে ছাদ ছিল না, প্রাচীর ছিল না, পিতামাতাভ্রাতা-আত্মীয়প্রতিবেশীর সম্বন্ধ ছিল না— সে যে গৃহের একেবারে বাহির। সে যেন স্বপ্ন, সে যেন কিছুই সত্য নহে। সেইজন্য আর-এক দিন স্নিগ্ধ-নির্মল প্রাতঃকালের আলোকে গৃহের মধ্যে, সত্যের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার অপেক্ষা আছে। পুণ্যপৌষের প্রাতঃকালে আমাদের গৃহদ্বারে তোমার সরল সহাস্য মূর্তিখানি চিরজীবনের মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইব, এইজন্য আমি আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া আছি। প্রিয়তমে, আমি তোমার হৃদয়ের দ্বারে অতিথি— আমাকে ফিরাইয়ো না।

প্রসাদভিক্ষু রমেশ।"

৩৭

শৈল ম্লান কমলাকে একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, "আজ তোমাদের বাংলায় যাইবে না?"

কমলা কহিল, "না, আর দরকার নাই।"

শৈল। তোমার ঘর-সাজানো শেষ হইয়া গেল?

কমলা। হাঁ ভাই, শেষ হইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শৈল আসিয়া কহিল, "একটা জিনিস যদি দিই তো কী দিবি বল্ ?"

কমলা কহিল, "আমার কী আছে দিদি ?"

শৈল। একেবারে কিছুই নাই ?

কমলা। কিছুই না।

শৈল কমলার কপোলে করাঘাত করিয়া কহিল, "ইস, তাই তো,—যা কিছু ছিল, সমস্ত বুঝি এক জনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিস ? এটা কী বল্ দেখি ?" বলিয়া শৈল অঞ্চলের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিল।

লেফাফায় রমেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমলার মুখ তৎক্ষণাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—সে একটুখানি মুখ ফিরাইল।

শৈল কহিল, "ওগো, আর অভিমান দেখাইতে হইবে না, ঢের হইয়াছে। এদিকে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইবার জন্য মনটার ভিতরে ধড়ফড় করিতেছে—কিন্তু মুখ ফুটিয়া না চাহিলে আমি দিব না—কখনো দিব না—দেখি কতক্ষণ পণ রাখিতে পার।"

এমন সময় উমা একটা সাবানের বাক্সে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, "মাসী, গ-গ।"

কমলা তাড়াতাড়ি উমিকে কোলে তুলিয়া বারংবার চুমো খাইতে খাইতে শোবার ঘরে লইয়া গেল। উমি তাহার শকটচালনায় অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কিন্তু কমলা কোনোমতেই ছাড়িল না—তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার প্রলাপবাক্যে তাহার মনোরঞ্জন-চেষ্টায় প্রবলবেগে প্রবৃত্ত হইল।

শৈল আসিয়া কহিল, "হার মানিলাম—তোরই জিত—আমি তো পারিতাম না। ধন্যি মেয়ে। এই নে ভাই—কেন মিছে অভিশাপ কুড়াইব।"

এই বলিয়া বিছানার উপরে চিঠিখানা ফেলিয়া উমিকে কমলার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

লেফাফাটা লইয়া একটুখানি নাড়াচাড়া করিয়া কমলা চিঠিখানা খুলিল—প্রথম দুই-চারি লাইনের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় [illegible] চিঠিখানা [illegible] ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রথম ধাক্কার এই প্রবল বিতৃষ্ণার [illegible] থামিলেই, [illegible] আবার সেই চিঠি মাটি হইতে তুলিয়া সমস্তটা সে পড়িল। [illegible] কি না বুঝিল, জানি না, কিন্তু তার মনে হইল, যেন সে [illegible] পদার্থ নাড়িতেছে। চিঠিখানা আবার সে ফেলিয়া দিল। [illegible] নহে, তাহারই ঘর করিতে হইবে, এইজন্য এই আহ্বান!

রমেশ জানিয়া শুনিয়া এতদিন পরে তাহাকে এই অপমান করিল! গাজিপুরে আসিয়া রমেশের দিকে কমলা যে তাহার হৃদয় অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, সে কি রমেশ বলিয়া, না তাহার স্বামী বলিয়া? রমেশ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল সেইজন্যই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে আজ এই ভালোবাসার চিঠি লিখিয়াছে। ভ্রমক্রমে রমেশের কাছে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটুকু কমলা আজ কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইবে—কেমন করিয়া! এমন লজ্জা, এমন ঘৃণা কমলার অদৃষ্টে কেন ঘটিল। সে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার কাছে কী অপরাধ করিয়াছে। এবারে 'ঘর' বলিয়া একটা বীভৎস জিনিস কমলাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—কমলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে! রমেশ যে তাহার কাছে এত-বড়ো বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুই দিন আগে তাহা কি কমলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত?

ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে উমেশ আসিয়া একটুখানি কাসিল। কমলার কাছে কোনো সাড়া না পাইয়া সে আস্তে আস্তে ডাকিল, "মা।" কমলা দ্বারের কাছে আসিল, উমেশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "মা, আজ সিধুবাবুরা মেয়ের বিবাহে কলিকাতা হইতে একটা যাত্রার দল আনাইয়াছেন।"

কমলা কহিল, "বেশ তো উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাস।"

উমেশ। কাল সকালে কি ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে হইবে?

কমলা। না না, ফুলের দরকার নেই।

উমেশ যখন চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কমলা তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল—কহিল, "ও উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাইতেছিস, এই নে, পাঁচটা টাকা নে।"

উমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল। যাত্রা শুনিবার সঙ্গে পাঁচটা টাকার কী যোগ, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কহিল, "মা, শহর হইতে কি তোমার জন্য কিছু কিনিয়া আনিতে হইবে?"

কমলা। না না, আমার কিছুই চাই নে। তুই রাখিয়া দে, তোর কাজে লাগিবে।

হতবুদ্ধি উমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল "উমেশ, তুই এই কাপড় পরিয়া যাত্রা শুনিতে যাইবি নাকি—তোকে লোকে বলিবে কী?"

লোকে যে উমেশের নিকট সাজসজ্জাসম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি [illegible]শা করে এবং ত্রুটি দেখিলে আলোচনা করিয়া থাকে, উমেশের এরূপ ধারণা [illegible] না—এই কারণে ধুতির শুভ্রতা ও উত্তরচ্ছদের একান্ত অভাবসম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কমলার প্রশ্ন শুনিয়া উমেশ কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল।

কমলা তাহার দুইজোড়া শাড়ি বাহির করিয়া উমেশের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "এই নে, যা, পরিস।"

শাড়ির চওড়া বাহারে পাড় দেখিয়া উমেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কমলার পায়ের কাছে পড়িয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল, এবং হাস্যদমনের বৃথাচেষ্টায় সমস্ত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল। উমেশ চলিয়া গেলে কমলা দুইফোঁটা চোখের জল মুছিয়া জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাবি নে?"

কমলার কাছে শৈলের তো কিছুই গোপন ছিল না—তাই শৈল এতদিন পরে সুযোগ পাইয়া এই দাবি করিল।

কমলা কহিল, "ওই যে দিদি, দেখো না।" বলিয়া, মেজের উপরে চিঠি পড়িয়া ছিল, দেখাইয়া দিল। শৈল আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, "বাস্ রে, এখনো রাগ যায় নাই।" মাটি হইতে শৈল চিঠি তুলিয়া লইয়া সমস্তটা পড়িল। চিঠিতে ভালোবাসার কথা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তবু এ কেমনতরো চিঠি। মানুষ আপনার স্ত্রীকে এমনি করিয়া চিঠি লেখে! এ যেন কী-এক-রকম! শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী কি নভেল লেখেন?"

"স্বামী" শব্দটা শুনিয়া চকিতের মধ্যে কমলার দেহমন যেন সংকুচিত হইয়া গেল। সে কহিল, "জানি না।"

শৈল কহিল, "তা হলে আজ তুমি বাংলাতেই যাইবে?"

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, যাইবে।

শৈল কহিল, "আমিও আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু জান তো ভাই, আজ নরসিংবাবুর বউ আসিবে। মা বরঞ্চ তোমার সঙ্গে যান।"

কমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, মা গিয়া কী করিবেন? সেখানে তো চাকর আছে।"

শৈল হাসিয়া কহিল, "আর তোমার বাহন উমেশ আছে, তোমার ভয় কী?"

উমা তখন কাহার একটা পেনসিল সংগ্রহ করিয়া যেখানে সেখানে আঁচড় কাটিতেছিল এবং চীৎকার করিয়া অব্যক্ত ভাষা উচ্চারণ করিতেছিল, মনে করিতেছিল, 'প[illegible]ড়িতেছি'। শৈল তাহার এই সাহিত্যরচনা হইতে তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইল—[illegible] যখন প্রবল তারস্বরে আপত্তিপ্রকাশ করিল, কমলা বলিল, "একটা মজার জিনিস দিতেছি আয়।"

এই বলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানার উপর ফেলিয়া আদরের দ্বারা

তাহাকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। সে যখন প্রতিশ্রুত উপহারের দাবি করিল, তখন কমলা তাহার বাক্স খুলিয়া একজোড়া সোনার ব্রেসলেট বাহির করিল। এই দুর্লভ খেলেনা পাইয়া উমি ভারি খুশি হইল। মাসী তাহার হাতে পরাইয়া দিতেই সে সেই ঢলঢলে গহনাজোড়া সমেত দুটি হাত সন্তর্পণে তুলিয়া ধরিয়া সগর্বে তাহার মাকে দেখাইতে গেল। মা ব্যস্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রেসলেট কাড়িয়া লইল—কহিল, "কমল, তোমার কী রকম বুদ্ধি। এ-সব জিনিস উহার হাতে দাও কেন ?"

এই দুর্ব্যবহারে উমির আর্তনাদের নালিশ গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কমল কাছে আসিয়া কহিল, "দিদি, এ ব্রেসলেটজোড়া আমি উমিকেই দিয়াছি।"

শৈল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "পাগল নাকি!"

কমলা কহিল, "আমার মাথা খাও দিদি, এ ব্রেসলেটজোড়া তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিবে না। ইহা ভাঙিয়া উমির হার গড়াইয়া দিয়ো।"

শৈল কহিল, "না, সত্য বলিতেছি, তোর মতো খ্যাপা মেয়ে আমি দেখি নাই।"

এই বলিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল। কমলা কহিল, "তোদের এখান হইতে আমি তো আজ চলিলাম দিদি—খুব সুখে ছিলাম—এমন সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই।" বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

শৈলও উদ্‌গত অশ্রু দমন করিয়া বলিল, "তোর রকমটা কী বল্ দেখি কমল, যেন কতদূরেই যাইতেছিস! যে সুখে ছিলি, সে আর আমার বুঝিতে বাকি নাই—এখন তোর সব বাধা দূর হইল, সুখে আপন ঘরে একলা রাজত্ব করিবি—আমরা কখনো গিয়া পড়িলে ভাবিবি আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি।"

বিদায়কালে কমলা শৈলকে প্রণাম করিলে পর শৈল কহিল, "কাল দুপুরবেলা আমি তোদের ওখানে যাইব।"

কমলা তাহার উত্তরে হাঁ-না কিছুই বলিল না।

বাংলায় গিয়া কমলা দেখিল, উমেশ আসিয়াছে। কমলা কহিল, "তুই যে! যাত্রা শুনিতে যাবি না ?"

উমেশ কহিল, "তুমি যে আজ এখানে থাকিবে, আমি—"

কমলা। আচ্ছা আচ্ছা, সে তোর ভাবিতে হইবে না। তুই যাত্রা শুনিতে যা —এখানে বিষণ আছে। যা, দেরি করিস নে।"

উমেশ। এখনো তো যাত্রার অনেক দেরি।

কমলা। তা হ'ক না, বিয়েবাড়িতে কত ধুম হইতেছে, ভালো করিয়া দেখিয়া আয় গে যা।

এ সম্বন্ধে উমেশকে অধিক উৎসাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল না। সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কমলা হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ্, খুড়োমশায় আসিলে তুই—"

এইটুকু বলিয়া কথাটা কী করিয়া শেষ করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না। উমেশ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "মনে রাখিস, খুড়োমশায় তোকে ভালোবাসেন—তোর যখন যা দরকার হইবে, আমার প্রণাম জানাইয়া তুই তাঁর কাছে চাস, তিনি দিবেন—তাঁকে আমার প্রণাম দিতে কখনো ভুলিস নে—জানিস।"

উমেশ এই অনুশাসনের কোনো অর্থ না বুঝিয়া "যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে বিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "মাজি, কোথায় যাইতেছ ?"

কমলা কহিল, "গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছি।"

বিষণ কহিল, "সঙ্গে যাইব ?"

কমলা কহিল, "না, তুই ঘরে পাহারা দে।" বলিয়া তাহার হাতে অনাবশ্যক একটা টাকা দিয়া কমলা গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল।

৩৮

একদিন অপরাহ্ণে, হেমনলিনীর সহিত একত্রে নিভৃতে চা খাইবার প্রত্যাশায় অন্নদাবাবু তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য দোতলায় আসিলেন—দোতলায় বসিবার ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, শুইবার ঘরেও সে নাই। বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হেমনলিনী বাহিরে কোথাও যায় নাই। তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্নদা ছাদের উপরে উঠিলেন।

তখন কলিকাতা শহরের নানা আকার ও আয়তনের বহুদূরবিস্তৃত ছাদগুলির উপরে হেমন্তের অবসন্ন রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে,—দিনান্তের লঘু হাওয়াটি থাকিয়া থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। হেমনলিনী চিলের ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

অন্নদাবাবু কখন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা সে টেরও পাইল না। অবশেষে অন্নদাবাবু যখন আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন, তখন সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া

উঠিল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার পূর্বেই অন্নদাবাবু তাহার পাশে বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না।"

বৃদ্ধের মুখে এই করুণ উক্তি শুনিবামাত্র হেমনলিনী যেন একটি সুগভীর মূর্ছার ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার বাপের মুখের দিকে এক বার চাহিয়া দেখিল। সে-মুখের উপরে কী স্নেহ, কী করুণা, কী বেদনা। এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কী পরিবর্তনই হইয়াছে। সংসারে হেমনলিনীকে লইয়া যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন—কন্যার আহত হৃদয়ের কাছে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন—সান্ত্বনা দিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আজ হেমনলিনীর মাকে তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং আপন অক্ষম স্নেহের অন্তঃস্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—হঠাৎ হেমনলিনীর কাছে আজ এ-সমস্তই যেন বজ্রের আলোকে প্রকাশ পাইল। ধিক্‌কারের আঘাতে তাহাকে আপন শোকের পরিবেষ্টন হইতে এক মুহূর্তে বাহির করিয়া আনিল। যে পৃথিবী তাহার কাছে ছায়ার মতো বিলীন হইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখনি সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ এই মুহূর্তে হেমনলিনীর মনে অত্যন্ত লজ্জার উদয় হইল। যে-সকল স্মৃতির মধ্যে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া ছিল, সে-সমস্ত বলপূর্বক আপনার চারিদিক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে?"

শরীর! শরীরটা যে আলোচ্য বিষয়, তাহা অন্নদা এ কয়দিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "আমার শরীর! আমার শরীর তো বেশ আছে মা। তোমার যে-রকম চেহারা হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার শরীরের জন্যই আমার ভাবনা। আমার শরীর এত বৎসর পর্যন্ত টিকিয়া আছে, আমাদের সহজে কিছু হয় না—তোদের এই দেহটুকু যে সেদিনকার, ভয় হয় পাছে ঘা সহিতে না পারে।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বাবা, মা যখন মারা যান, তখন আমি কত বড়ো ছিলাম?"

অন্নদা। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা ফুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, 'মা কোথা?' আমি বলিলাম, 'মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।' তোর জন্মাবার পূর্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জানিতিস না। আমার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না

পারিয়া আমার মুখের দিকে গম্ভীর হইয়া চাহিয়া রহিলি। খানিকক্ষণ বাদে আমার হাত ধরিয়া তোর মার শূন্য শয়নঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিলি। তোর বিশ্বাস ছিল, আমি তোকে সেখানকার শূন্যতার ভিতর হইতে একটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব। তুই জানিতিস তোর বাবা মস্ত লোক, এ-কথা তোর মনেও হয় নাই যে, যেগুলো আসল কথা, সেগুলোর সম্বন্ধে তোর মস্ত বাবা শিশুরই মতো অজ্ঞ ও অক্ষম। আজও সেই কথা মনে হয় যে, আমরা কত অক্ষম—ঈশ্বর বাপের মনে স্নেহ দিয়াছেন, কিন্তু কত অল্পই ক্ষমতা দিয়াছেন।

এই বলিয়া তিনি হেমনলিনীর মাথার উপরে এক বার তাঁহার ডান হাত স্পর্শ করিলেন।

হেমনলিনী পিতার সেই কল্যাণবর্ষী কম্পিতহস্ত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার উপরে অন্য হাত বুলাইতে লাগিল। কহিল, "মাকে আমার খুব অল্প একটুখানি মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে—দুপুরবেলায় তিনি বিছানায় শুইয়া বই লইয়া পড়িতেন, আমার তাহা কিছুতেই ভালো লাগিত না, আমি বই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতাম।"

ইহা হইতে আবার সেকালের কথা উঠিল মা কেমন ছিলেন, কী করিতেন, তখন কী হইত, এই আলোচনা হইতে হইতে সূর্য অস্তমিত এবং আকাশ মলিন তাম্রবর্ণ হইয়া আসিল। চারিদিকে কলিকাতার কর্ম ও কোলাহল, তাহারই মাঝখানে একটি গলির বাড়ির ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণ ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

এমন সময় সিঁড়িতে যোগেন্দ্রের পায়ের শব্দ শুনিয়া দুই জনের গুঞ্জনালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং চকিত হইয়া দুই জনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া উভয়ের মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হেমের সভা বুঝি আজকাল এই ছাদেই ?"

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি এই যে একটা শোকের কালিমা লাগিয়াই আছে, ইহাতে তাহাকে প্রায় বাড়িছাড়া করিয়াছে। অথচ বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গেলে হেমনলিনীর বিবাহ লইয়া নানা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হয় বলিয়া কোথাও যাওয়াও মুশকিল। সে কেবলই বলিতেছে, "হেমনলিনী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের ইংরেজি গল্পের বই পড়িতে দিলে এইরূপ দুর্গতি ঘটে। হেম ভাবিতেছে—'রমেশ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে,

তখন আমার হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়া উচিত,—তাই সে আজ খুব সমারোহ করিয়া হৃদয় ভাঙিতে বসিয়াছে। নভেল-পড়া কয়জন মেয়ের ভাগ্যে ভালোবাসার নৈরাশ্য সহিবার এমন চমৎকার সুযোগ ঘটে।"

যোগেন্দ্রের কঠিন বিদ্রূপ হইতে কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি হেমকে লইয়া একটুখানি গল্প করিতেছি।" যেন তিনিই গল্প করিবার জন্য হেমকে ছাদে টানিয়া আনিয়াছেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "কেন, চায়ের টেবিলে কি আর গল্প হয় না? বাবা, তুমিসুদ্ধ হেমকে খ্যাপাইবার চেষ্টায় আছ। এমন করিলে তো বাড়িতে টেকা দায় হয়।"

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, "বাবা, এখনো কি তোমার চা খাওয়া হয় নাই?"

যোগেন্দ্র। চা তো কবিকল্পনা নয় যে, সন্ধ্যাবেলাকার আকাশের সূর্যাস্ত-আভা হইতে আপনি ঝরিয়া পড়িবে। ছাদের কোণে বসিয়া থাকিলে চায়ের পেয়ালা ভরিয়া উঠে না, এ-কথাও কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে?

অন্নদা হেমনলিনীর লজ্জানিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে আজ চা খাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। কেন বাবা, তোমরা সকলেই তপস্বী হইয়া উঠিবে নাকি? তাহা হইলে আমার দশা কী হইবে? বায়ু-আহারটা আমার সহ্য হয় না।

অন্নদা। না না, তপস্যার কথা হইতেছে না; কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় নাই, তাই ভাবিতেছিলাম আজ চা না খাইয়া দেখা যাক কেমন থাকি।

বস্তুত হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালার ধ্যানমূর্তি অনেক বার অন্নদাবাবুকে প্রলুব্ধ করিয়া গেছে, কিন্তু আজ উঠিতে পারেন নাই। অনেক দিন পরে আজ হেম তাঁহার সঙ্গে সুস্থভাবে কথা কহিতেছে, এই নিভৃত ছাদে ছুটিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর-নিবিড়-ভাবে আলাপ পূর্বে তো তাঁহার কখনো মনে পড়ে না। এ আলাপ এক জায়গা হইতে আর-এক জায়গায় তুলিয়া লইয়া যাওয়া সহিবে না—নড়িবার চেষ্টা করিলেই ভীরু হরিণের মত সমস্ত জিনিস ছুটিয়া পালাইবে। সেইজন্যই অন্নদাবাবু আজ চা-পাত্রের মুহুর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবু যে চা-পান রহিত করিয়া অনিদ্রার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ-কথা হেমনলিনী বিশ্বাস করিল না—সে কহিল, "চলো বাবা, চা খাইবে চলো।" অন্নদাবাবু সেই মুহূর্তেই অনিদ্রার আশঙ্কাটা বিস্মৃত হইয়া ব্যগ্রপদেই টেবিলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চা খাইবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই অন্নদাবাবু দেখিলেন, অক্ষয় সেখানে বসিয়া আছে। তাঁহার মনটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হেমের মন আজ একটুখানি সুস্থ হইয়াছে, অক্ষয়কে দেখিলেই আবার বিকল হইয়া উঠিবে,—কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নাই। মুহূর্ত পরেই হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া পড়িল, কহিল, "যোগেন, আমি আজ তবে আসি।"

হেমনলিনী কহিল, "কেন অক্ষয়বাবু, আপনার কি কোনো কাজ আছে? এক পেয়ালা চা খাইয়া যান।"

হেমনলিনীর এই অভ্যর্থনায় ঘরের সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। অক্ষয় পুনর্বার আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "আপনাদের অবর্তমানেই আমি দু-পেয়ালা চা খাইয়াছি—পীড়াপীড়ি করিলে আরও দু-পেয়ালা যে চলে না, তাহা বলিতে পারি না।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "চায়ের পেয়ালা লইয়া আপনাকে কোনোদিন তো পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই।"

অক্ষয় কহিল, "না, ভালো জিনিসকে আমি কখনো প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরিতে দিই না, বিধাতা আমাকে ওইটুকু বুদ্ধি দিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র কহিল, "সেই কথা স্মরণ করিয়া ভালো জিনিসও যেন তোমাকে কোনোদিন প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া না দেয়, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ করি।"

অনেক দিন পরে অন্নদার চায়ের টেবিলে কথাবার্তা বেশ সহজভাবে জমিয়া উঠিল। সচরাচর হেমনলিনী শান্তভাবে হাসিয়া থাকে, আজ তাহার হাসির ধ্বনি মাঝে মাঝে কথোপকথনের উপরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নদাবাবুকে সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "বাবা, অক্ষয়বাবুর অন্যায় দেখো—কয়দিন তোমার পিল না খাইয়াও উনি দিব্যি ভালো আছেন। যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিত, তবে অন্তত মাথাও ধরিত।"

যোগেন্দ্র। ইহাকেই বলে পিল-হারামি।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত খুশি হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে আবার যে তাঁহার পিল-বাক্সের উপরে আত্মীয়স্বজনের কটাক্ষপাত আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি পারিবারিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেন—তাঁহার মন হইতে একটা ভার নামিয়া গেল।

তিনি কহিলেন, "এই বুঝি! লোকের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ! আমার পিলাহারী দলের মধ্যে ওই একটিমাত্র অক্ষয় আছে—তাহাকেও ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা!"

অক্ষয় কহিল, "সে-ভয় করিবেন না অন্নদাবাবু। অক্ষয়কে ভাঙাইয়া লওয়া শক্ত।"

যোগেন্দ্র। মেকি টাকার মতো—ভাঙাইতে গেলে পুলিস্-কেস হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপে হাস্যালাপে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলের উপর হইতে যেন অনেকদিনের এক ভূত ছাড়িয়া গেল।

আজিকার এই চায়ের সভা শীঘ্র ভাঙিত না—কিন্তু আজ যথাসময়ে হেমনলিনীর চুল বাঁধা হয় নাই বলিয়া তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল—তখন অক্ষয়েরও একটা বিশেষ কাজের কথা মনে পড়িল—সে-ও চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, আর বিলম্ব নয়—এইবেলা হেমের বিবাহের জোগাড় করো।"

অন্নদাবাবু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশের সহিত বিবাহ ভাঙিয়া-যাওয়া লইয়া সমাজে অত্যন্ত কানাকানি চলিতেছে—ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব। সকল কথা যদি খোলসা করিয়া বলিবার জো থাকিত, তাহা হইলে ঝগড়া করিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হেমের জন্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি না—কাজেই হাতাহাতি করিতে হয়। সেদিন অখিলকে চাবকাইয়া আসিতে হইয়াছিল—শুনিলাম, সে-লোকটা যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়াছিল। শীঘ্র যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত কথা চুকিয়া যায় এবং আমাকেও পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দিনরাত্রি আস্তিন তুলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে হয় না। আমার কথা শোনো, আর দেরি করিয়ো না।"

অন্নদা। বিবাহ কাহার সঙ্গে হইবে যোগেন?

যোগেন্দ্র। একটিমাত্র লোক আছে। যে-কাণ্ড হইয়া গেল এবং যে-সমস্ত কথাবার্তা উঠিয়াছে, তাহাতে পাত্র পাওয়া অসম্ভব। কেবল বেচারা অক্ষয় রহিয়াছে—তাহাকে কিছুতেই দমাইতে পারে না। তাহাকে পিল খাইতে বল পিল খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে।

অন্নদা। পাগল হইয়াছ যোগেন? অক্ষয়কে হেম বিবাহ করিবে!

যোগেন্দ্র। তুমি যদি গোল না কর তো আমি তাহাকে রাজি করিতে পারি।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না যোগেন না, তুমি হেমকে কিছুই বোঝ না। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কষ্ট দিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে। এখন তাহাকে কিছুদিন সুস্থ থাকিতে দাও—সে-বেচারা অনেক কষ্ট পাইয়াছে। বিবাহের ঢের সময় আছে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আমি তাহাকে কিছুমাত্র পীড়ন করিব না, যতদূর সাবধানে ও মৃদুভাবে কাজ উদ্ধার করিতে হয়, তাহার ত্রুটি হইবে না। তোমরা কি মনে কর, আমি ঝগড়া না করিয়া কথা কহিতে পারি না?"

যোগেন্দ্র অধীরপ্রকৃতির লোক। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় চুল বাঁধা সারিয়া হেমনলিনী বাহির হইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "হেম, একটা কথা আছে।"

কথা আছে শুনিয়া হেমের হৃৎকম্প হইল। যোগেন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া আস্তে আস্তে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, "হেম, বাবার শরীরটা কী-রকম খারাপ হইয়াছে দেখিয়াছ?"

হেমনলিনীর মুখে একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইল; সে কোনো কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র। আমি বলিতেছি, ইহার একটা প্রতিকার না করিলে উনি একটা শক্ত ব্যামোয় পড়িবেন।

হেমনলিনী বুঝিল, পিতার এই অস্বাস্থ্যের জন্য অপরাধ তাহারই উপরে পড়িতেছে। সে মাথা নিচু করিয়া ম্লানমুখে কাপড়ের পাড় লইয়া টানিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "যা হইয়া গেছে, সে তো হইয়াই গেছে, তাহা লইয়া যতই আক্ষেপ করিতে থাকিব, ততই আমাদের লজ্জার কথা। এখন বাবার মনকে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চাও, তবে যত শীঘ্র পার, এই সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপারের একেবারে গোড়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।"

এই বলিয়া উত্তর প্রত্যাশা করিয়া যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেম সলজ্জমুখে কহিল, "এ সমস্ত কথা লইয়া আমি যে কোনোদিন বাবাকে বিরক্ত করিব, এমন সম্ভাবনা নাই।"

যোগেন্দ্র। তুমি তো করিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে তো অন্য লোকের মুখ বন্ধ হইবে না।

হেম কহিল, "তা আমি কী করিতে পারি বলো।"

যোগেন্দ্র। চারিদিকে এই যে সব নানা কথা উঠিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার একটি-মাত্র উপায় আছে।

যোগেন্দ্র যে উপায় মনে মনে ঠাওরাইয়াছে, হেমনলিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "এখনকার মতো কিছু দিন বাবাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে ভালো হয় না? দু-চার মাস কাটাইয়া আসিলে ততদিনে সমস্ত গোল থামিয়া যাইবে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল হইবে না। তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই, যতদিন বাবা এ-কথা নিশ্চয় না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া থাকিবে—ততদিন তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ হইতে দিবে না।"

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিল—কহিল, "আমাকে কী করিতে বল।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তোমার কানে কঠোর শুনাইবে আমি জানি, কিন্তু সকল দিকের মঙ্গল যদি চাও, তোমাকে কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্র অধৈর্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "হেম, তোমরা কল্পনাদ্বারা ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলিতে ভালো-বাস। তোমার বিবাহ সম্বন্ধে যেমন গোলমাল ঘটিয়াছে, এমন কত মেয়ের ঘটিয়া থাকে—আবার চুকিয়া-বুকিয়া পরিষ্কার হইয়া যায়—নহিলে, ঘরের মধ্যে কথায় কথায় নভেল তৈরি হইতে থাকিলে তো লোকের প্রাণ বাঁচে না। চিরজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া ছাদে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব, সেই অপদার্থ মিথ্যাচারীটার স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিব,—পৃথিবীর লোকের সামনে এই সমস্ত কাব্য করিতে তোমরা লজ্জা করিবে না,—কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরিয়া যাই। ভদ্র গৃহস্থঘরে বিবাহ করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্মীছাড়া কাব্য, যত শীঘ্র পার, চুকাইয়া ফেলো।"

লোকের চোখের সামনে কাব্য হইয়া উঠিবার যে লজ্জা কতখানি, তাহা হেমনলিনী বিলক্ষণ জানে, এই জন্য যোগেন্দ্রের বিদ্রূপবাক্য তাহাকে ছুরির মতো বিঁধিল। সে কহিল, "দাদা, আমি কি বলিতেছি সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিব, বিবাহ করিব না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তাহা যদি না বলিতে চাও তো বিবাহ করো। অবশ্য, তুমি যদি বল, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রদেবকে না হইলে তোমার পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনীব্রতই গ্রহণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মনের মতো কটা জিনিসই বা মেলে—যাহা পাওয়া যায়, মনকে তাহারই মতো করিয়া লইতে হয়। আমি তো বলি ইহাতেই মানুষের যথার্থ মহত্ত্ব।"

হেমনলিনী মর্মাহত হইয়া কহিল, "দাদা, তুমি আমাকে এমন করিয়া খোঁটা দিয়া কথা বলিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে পছন্দ লইয়া কোনো কথা বলিয়াছি?"

যোগেন্দ্র। বল নাই বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি—অকারণে এবং অন্যায় কারণে তোমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধুর উপরে তুমি স্পষ্ট বিদ্বেষপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এ-কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এ-জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জন লোককে দেখা গেছে যে-ব্যক্তি সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে তোমার প্রতি হৃদয় স্থির রাখিয়াছে। এই কারণে আমি তাহাকে মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তোমাকে সুখী করিবার জন্য জীবন দিতে

পারে, এমন স্বামী যদি চাও, তবে সে-লোককে খুঁজিতে হইবে না। আর যদি কাব্য করিতে চাও, তবে—

হেমনলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এমন করিয়া তুমি আমাকে বলিয়ো না। বাবা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, যাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন, আমি পালন করিব। যদি না করি, তখন তোমার কাব্যের কথা তুলিয়ো।"

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া কহিল, "হেম, রাগ করিয়ো না বোন। আমার মন খারাপ হইয়া গেলে মাথার ঠিক থাকে না জান তো—তখন যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া বসি। আমি কি ছেলেবেলা হইতে তোমাকে দেখি নাই—আমি কি জানি না, লজ্জা তোমার পক্ষে কত স্বাভাবিক এবং বাবাকে তুমি কত ভালোবাস।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র তাহার বোনের উপর না জানি কিরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাই কল্পনা করিয়া অন্নদা তাঁহার ঘরে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন—ভাইবোনের কথোপকথনের মাঝখানে গিয়া পড়িবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল—অন্নদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, হেম বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি খুব বেশি জেদ করিয়া তাহাকে রাজি করাইয়াছি—তাহা মোটেই নয়। এখন, তুমি তাহাকে এক বার মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে অক্ষয়কে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না।"

অন্নদা কহিলেন, "আমাকে বলিতে হইবে?"

যোগেন্দ্র। তুমি না বলিলে সে কি নিজে আসিয়া বলিবে, 'আমি অক্ষয়কে বিবাহ করিব'? আচ্ছা, নিজের মুখে তোমার বলিতে যদি সংকোচ হয়, তবে আমাকে অনুমতি করো, আমি তোমার আদেশ তাহাকে জানাই গে।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, আমার যাহা বলিবার, আমি নিজেই বলিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কী? আমার মতে আর কিছুদিন যাইতে দেওয়া উচিত।"

যোগেন্দ্র কহিল, "না বাবা, বিলম্বে নানা বিঘ্ন হইতে পারে—এ-রকম ভাবে বেশিদিন থাকা কিছু নয়।"

যোগেন্দ্রের জেদের কাছে বাড়ির কাহারও পারিবার জো নাই—সে যাহা ধরিয়া বসে, তাহা সাধন না করিয়া ছাড়ে না। অন্নদা তাহাকে মনে মনে ভয় করেন। তিনি আপাতত কথাটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা আমি বলিব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, আজই বলিবার উপযুক্ত সময়। সে তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আজই যা হয় একটা শেষ করিয়া ফেলো।"

অন্নদা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি ভাবিলে চলিবে না—হেমের কাছে এক বার চলো।"

অন্নদা কহিলেন, "যোগেন, তুমি থাকো, আমি একলা তাহার কাছে যাইব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম।"

অন্নদা বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি একটা কৌচের উপর হইতে কে এক জন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং পরক্ষণেই একটি অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠ কহিল, "বাবা, আলো নিবিয়া গেছে—বেহারাকে জ্বালিতে বলি।"

আলো নিবিবার কারণ অন্নদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন—তিনি বলিলেন, "থাক্ না মা, আলোর দরকার কী।" বলিয়া হাতড়াইয়া হেমনলিনীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

হেম কহিল, "বাবা, তোমার শরীরের তুমি যত্ন করিতেছ না।"

অন্নদা কহিলেন, "তাহার বিশেষ কারণ আছে মা—শরীরটা বেশ ভালো আছে বলিয়াই যত্ন করি না। তোমার শরীরটার দিকে তুমি একটু তাকাইয়ো হেম।"

হেমনলিনী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা সকলেই ওই একই কথা বলিতেছ—ভারি অন্যায় বাবা। আমি তো বেশ সহজ মানুষেরই মতো আছি—শরীরের অযত্ন করিতে আমাকে কী দেখিলে বলো তো। যদি তোমাদের মনে হয়, শরীরের জন্য আমার কিছু করা আবশ্যক, আমাকে বল না কেন? আমি কি কখনো তোমার কোনো কথায় 'না' বলিয়াছি বাবা?" শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা দ্বিগুণ আর্দ্র শুনাইল।

অন্নদা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কখনো না মা। তোমাকে কখনো কিছু বলিতেও হয় নাই—তুমি আমার মা কি না, তাই তুমি আমার অন্তরের কথা জান—তুমি আমার ইচ্ছা বুঝিয়া কাজ করিয়াছ। আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ যদি ব্যর্থ না হয়, তবে ঈশ্বর তোমাকে চিরসুখিনী করিবেন।"

হেম কহিল, "বাবা, আমাকে কি তোমার কাছে রাখিবে না?"

অন্নদা। কেন রাখিব না?

হেম। যতদিন না দাদার বউ আসে, অন্তত ততদিন তো থাকিতে পারি। আমি না থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে?

অন্নদা। আমাকে দেখা! ও-কথা বলিস নে মা! আমাকে দেখিবার জন্য তোদের লাগিয়া থাকিতে হইবে, আমার সে-মূল্য নাই।

হেম কহিল, "বাবা, ঘর বড়ো অন্ধকার—আলো আনি।" বলিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে

একটা হাতলণ্ঠন আনিয়া ঘরে রাখিল। কহিল, "কয়দিন গোলমালে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হয় নাই। আজকে শোনাইব।"

অন্নদা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা একটু বসো মা, আমি আসিয়া শুনিতেছি।" বলিয়া যোগেন্দ্রের কাছে গেলেন। মনে করিয়াছিলেন বলিবেন,—আজ কথা হইতে পারিল না, আর-এক দিন হইবে। কিন্তু যেই যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল বাবা? বিবাহের কথা বলিলে?" অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "হাঁ বলিয়াছি।" তাঁহার ভয় ছিল, পাছে যোগেন্দ্র নিজে গিয়া হেমনলিনীকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

যোগেন্দ্র কহিল, "সে অবশ্য রাজি হইয়াছে?"

অন্নদা। হাঁ, এক রকম রাজি বই কী।

যোগেন্দ্র কহিল, "তবে আমি অক্ষয়কে বলিয়া আসি গে।"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না, অক্ষয়কে এখন কিছু বলিয়ো না। বুঝিয়াছ যোগেন, অত বেশি তাড়তাড়ি করিতে গেলে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে। এখন কাহাকেও কিছু বলিবার দরকার নাই—আমরা বরঞ্চ এক বার পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি গে, তার পরে সমস্ত ঠিক হইবে।"

যোগেন্দ্র সে-কথার কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া একেবারে অক্ষয়ের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয় তখন একখানি ইংরেজি মহাজনী হিসাবের বই লইয়া বুক্‌-কীপিং শিখিতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার খাতাপত্র টান দিয়া ফেলিয়া কহিল, "ও-সব পরে হইবে, এখন তোমার বিবাহের দিন ঠিক করো।"

অক্ষয় কহিল, "বল কী!"

৩৯

পরদিন হেমনলিনী প্রত্যুষে উঠিয়া যখন প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাঁহার শোবার ঘরের জানলার কাছে একটা ক্যামবিসের কেদারা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে আসবাব অধিক নাই। একটি খাট আছে, এক কোণে একটি আলমারি—একটি দেয়ালে অন্নদাবাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর একটি ছায়া-প্রায় বিলীয়মান বাঁধানো ফোটোগ্রাফ—এবং তাহারই সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর স্বহস্তরচিত একখণ্ড পশমের কারুকার্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায় আলমারিতে যে সমস্ত টুকিটাকি শৌখিন জিনিস যেমনভাবে সজ্জিত ছিল, আজও তাহারা তেমনি রহিয়াছে।

পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পাকা চুল তুলিবার ছলে মাথায় কোমল অঙ্গুলিগুলি

চালনা করিয়া হেম বলিল, "বাবা, চলো, আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া লইবে। তার পরে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সেকালের গল্প শুনিব—সে-সব কথা আমার কত ভালো লাগে, বলিতে পারি না।"

হেমনলিনী সম্বন্ধে অন্নদাবাবুর বোধশক্তি আজকাল এমনি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চা খাইতে তাড়া দিবার কারণ বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আর কিছু পরে অক্ষয় চায়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তাহারই সঙ্গ এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সারিয়া লইয়া হেম পিতার কক্ষে নিভৃতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা তিনি মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন। ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মতো তাঁহার কন্যা যে সর্বদা ত্রস্ত হইয়া আছে, ইহা তাঁহার মনে অত্যন্ত বাজিল।

নিচে গিয়া দেখিলেন, চাকর এখনো চায়ের জল তৈরি করে নাই। তাহার উপরে হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন—সে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চায়ের তলব হইয়াছে। চাকররা সব বাবু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইবার জন্য আবার অন্য লোক রাখার দরকার হইয়াছে,—এইরূপ মত তিনি অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রচার করিলেন।

চাকর তো তাড়াতাড়ি চায়ের জল আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্নদাবাবু অন্যদিন যেরূপ গল্প করিতে করিতে ধীরে-সুস্থে-আরামে চা-রস উপভোগ করিতেন, আজ তাহা না করিয়া অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত পেয়ালা নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেমনলিনী কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিল, "বাবা, আজ কি তোমার কোথাও বাহির হইবার তাড়া আছে?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার দিনে গরম চা-টা এক চুমুকে খাইয়া লইলে বেশ ঘামিয়া শরীরটা হালকা হইয়া যায়।"

কিন্তু অন্নদাবাবুর শরীরে ঘর্ম নির্গত হইবার পূর্বেই যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আজ অক্ষয়ের বেশভূষায় একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। হাতে রুপা-বাঁধানো ছড়ি—বুকের কাছে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছে—বাম হাতে একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া কেতাব। অন্যদিন অক্ষয় টেবিলের যে অংশে বসে, আজ সেখানে না বসিয়া হেমনলিনীর অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইল—হাসিমুখে কহিল, "আপনাদের ঘড়ি আজ দ্রুত চলিতেছে।"

হেমনলিনী অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল না, তাহার কথার উত্তরমাত্র দিল না। অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, চলো তো মা উপরে। আমার গরম কাপড়গুলা এক বার রৌদ্রে দেওয়া দরকার।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, রৌদ্র তো পালাইতেছে না—এত তাড়াতাড়ি কেন? হেম, অক্ষয়কে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দাও। আমারও চায়ের দরকার আছে—কিন্তু অতিথি আগে।"

অক্ষয় হাসিয়া হেমনলিনীকে কহিল, "কর্তব্যের খাতিরে এতবড়ো আত্মত্যাগ দেখিয়াছেন? দ্বিতীয় সার ফিলিপ সিডনি।"

হেমনলিনী অক্ষয়ের কথায় লেশমাত্র অবধান প্রকাশ না করিয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া এক পেয়ালা যোগেন্দ্রকে দিল ও অপর পেয়ালাটি অক্ষয়ের অভিমুখে ঈষৎ একটু ঠেলিয়া দিয়া অন্নদাবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "রৌদ্র বাড়িয়া উঠিলে কষ্ট হইবে—চলো, এইবেলা চলো।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আজ কাপড় রৌদ্রে দেওয়া থাক না। অক্ষয় আসিয়াছে—"

অন্নদা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের কেবলই জবরদস্তি। তোমরা কেবল জেদ করিয়া অন্য লোকের মর্মান্তিক বেদনার উপর দিয়া নিজের ইচ্ছাকে জারি করিতে চাও। আমি অনেকদিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না। মা হেম, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।"

এই বলিয়া হেমকে লইয়া অন্নদা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেম শান্তস্বরে কহিল, "বাবা, আর একটু বসো। আজ তোমার ভালো করিয়া চা খাওয়া হইল না। অক্ষয়বাবু, কাগজে-মোড়া এই রহস্যটি কী, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

অক্ষয় কহিল, "শুধু জিজ্ঞাসা কেন, এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেও পারেন।" এই বলিয়া মোড়কটি হেমনলিনীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

হেম খুলিয়া দেখিল, একখানি মরক্কো-বাঁধানো টেনিসন। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিক এই টেনিসন, এইরূপ বাঁধানো, সে পূর্বে উপহার পাইয়াছে—এবং সেই বইখানি আজও তাহার শোবার ঘরের দেরাজের মধ্যে গোপন সমাদরে রক্ষিত আছে।

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "রহস্য এখনো সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।" এই বলিয়া বইয়ের প্রথম শূন্য পাতাটি খুলিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সেই পাতায় লেখা আছে—শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রতি অক্ষয়শ্রদ্ধার উপহার।

তৎক্ষণাৎ বইখানা হেমের হাত হইতে একেবারে ভূতলে পড়িয়া গেল—এবং তৎপ্রতি সে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া কহিল, "বাবা, চলো।"

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রের চোখদুটা আগুনের মতো

জলিতে লাগিল। সে কহিল, "না, আমার আর এখানে থাকা পোষাইল না। আমি যেখানে হ'ক একটা ইস্কুলমাস্টারি লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

অক্ষয় কহিল, "ভাই, তুমি মিথ্যা রাগ করিতেছ। আমি তো তখনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমাকে বারংবার আশ্বাস দেওয়াতেই আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনীর মন কোনো দিন অনুকূল হইবে না। অতএব সে-আশা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু আসল কথা এই যে, উনি যাহাতে রমেশকে ভুলিতে পারেন, সেটা তোমাদের করা কর্তব্য।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তুমি তো বলিলে কর্তব্য—উপায়টা কী শুনি।"

অক্ষয় কহিল, "আমি ছাড়া জগতে আর বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ নাই নাকি। আমি দেখিতেছি, তুমি যদি তোমার বোন হইতে, তবে আমার আইবড়ো নাম ঘোচাইবার জন্য পিতৃপুরুষদিগকে হতাশভাবে দিন গণনা করিতে হইত না। যেমন করিয়া হ'ক, একটি ভালো পাত্র জোগাড় করা চাই,—যাহার প্রতি তাকাইবামাত্র অবিলম্বে কাপড় রৌদ্রে দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া না ওঠে।"

যোগেন্দ্র। পাত্র তো ফরমাশ দিয়া মেলে না।

অক্ষয়। তুমি একেবারে এত অল্পেই হাল ছাড়িয়া দিয়া ব'স কেন? পাত্রের সন্ধান আমি বলিতে পারি, কিন্তু তাড়াহুড়া যদি কর, তবে সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে। প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়িয়া দুই পক্ষকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিলে চলিবে না। আস্তে আস্তে আলাপ-পরিচয় জমিতে দাও, তাহার পরে সময় বুঝিয়া দিনস্থির করিয়ো।

যোগেন্দ্র। প্রণালীটি অতি উত্তম, কিন্তু লোকটি কে শুনি।

অক্ষয়। তুমি তাহাকে তেমন ভালো করিয়া জান না, কিন্তু দেখিয়াছ। নলিনাক্ষ ডাক্তার।

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ!

অক্ষয়। চমকাও কেন। তাহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গোলমাল চলিতেছে, চলুক না। তা বলিয়া অমন পাত্রটিকে হাতছাড়া করিবে?

যোগেন্দ্র। আমি হাত তুলিয়া লইলেই অমনি পাত্র যদি হাতছাড়া হইত, তা হইলে ভাবনা কি ছিল? কিন্তু নলিনাক্ষ বিবাহ করিতে কি রাজি হইবেন?

অক্ষয়। আজই হইবেন, এমন কথা বলিতে পারি না—কিন্তু সময়ে কী না হইতে পারে। যোগেন, আমার কথা শোনো। কাল নলিনাক্ষের বক্তৃতার দিন আছে—

সেই বক্তৃতায় হেমনলিনীকে লইয়া যাও। লোকটার বলিবার ক্ষমতা আছে। স্ত্রীলোকের চিত্ত-আকর্ষণের পক্ষে ওই ক্ষমতাটা অকিঞ্চিৎকর নয়। হায়, অবোধ অবলারা এ-কথা বোঝে না যে, বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভালো।

যোগেন্দ্র। কিন্তু নলিনাক্ষের ইতিহাসটা কী, ভালো করিয়া বলো দেখি, শোনা যাক।

অক্ষয়। দেখো যোগেন, ইতিহাসে যদি কিছু খুঁত থাকে, তাহা লইয়া বেশি ব্যস্ত হইয়ো না। অল্প একটুখানি খুঁতে দুর্লভ জিনিস সুলভ হয়—আমি তো সেটাকে লাভ মনে করি।

অক্ষয় নলিনাক্ষের ইতিহাস যাহা বলিল, তাহা সংক্ষেপে এই—

নলিনাক্ষের পিতা রাজবল্লভ ফরিদপুর-অঞ্চলের একটি ছোটোখাটো জমিদার ছিলেন। তাঁহার বছর-ত্রিশ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করিলেন না এবং আচারবিচার সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্বামীর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন—বলা বাহুল্য, ইহা রাজবল্লভের পক্ষে সুখকর হয় নাই। তাঁহার ছেলে নলিনাক্ষ ধর্ম প্রচারের উৎসাহে ও বক্তৃতাশক্তি দ্বারা উপযুক্ত বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি সরকারি ডাক্তারের কাজে বাংলার নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া চরিত্রের নির্মলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সৎ কর্মের উদ্‌যোগে সর্বত্র খ্যাতি বিস্তার করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। বৃদ্ধ বয়সে রাজবল্লভ একটি বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। রাজবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "আমার বর্তমান স্ত্রী আমার যথার্থ সহধর্মিণী নহে – যাহার সঙ্গে ধর্মে, মতে, ব্যবহারে ও হৃদয়ে মিল হইয়াছে, তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে অন্যায় হইবে।"এই বলিয়া রাজবল্লভ সর্বসাধারণের ধিক্‌কারের মধ্যে সেই বিধবাকে অগত্যা হিন্দুমতানুসারে বিবাহ করিলেন।

ইহার পরে নলিনাক্ষের মা গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নলিনাক্ষ রংপুরের ডাক্তারি ছাড়িয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমিও তোমার সঙ্গে কাশী যাইব।"

মা কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সঙ্গে তোদের তো কিছুই মেলে না, কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি?"

নলিনাক্ষ কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার কিছুই অমিল হইবে না।"

নলিনাক্ষ তাহার এই স্বামিপরিত্যক্ত অবমানিত মাতাকে সুখী করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। তাঁহার সঙ্গে কাশী গেল। মা কহিলেন, "বাবা, ঘরে কি বউ আসিবে না ?"

নলিনাক্ষ বিপদে পড়িল, কহিল, "কাজ কী মা, বেশ আছি।"

মা বুঝিলেন, নলিন অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মপরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। ব্যথিত হইয়া তিনি কহিলেন, "বাছা, আমার জন্যে তুই চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, এ তো কোনোমতেই হইতে পারে না। তোর যেখানে রুচি, তুই বিবাহ কর বাবা, আমি কখনো আপত্তি করিব না।"

নলিন দুই-এক দিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি যেমন চাও, আমি তেমনি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব—তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনোই ঘরে আনিব না।"

এই বলিয়া নলিন পাত্রীর সন্ধানে বাংলাদেশে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে মাঝখানে ইতিহাসে একটুখানি বিচ্ছেদ আছে। কেহ বলে, গোপনে সে এক পল্লীতে গিয়া কোন এক অনাথাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং বিবাহের পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। কেহ বা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। অক্ষয়ের বিশ্বাস এই যে, বিবাহ করিতে আসিয়া শেষ মুহূর্তে সে পিছাইয়াছিল।

যাহাই হউক, অক্ষয়ের মতে, এখন নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ যাহাকেই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, তাহার মা তাহাতে আপত্তি না করিয়া খুশিই হইবেন। হেমনলিনীর মতো অমন মেয়ে নলিনাক্ষ কোথায় পাইবে। আর যাই হউক, হেমের যেরূপ মধুর স্বভাব, তাহাতে সে যে তাহার শাশুড়ীকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া চলিবে, কোনো-মতেই তাঁহাকে কষ্ট দিবে না, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নলিনাক্ষ দুদিন ভালো করিয়া হেমকে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অতএব, অক্ষয়ের পরামর্শ এই যে, কোনোমতে দুজনের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হউক।

৪০

অক্ষয় চলিয়া যাইবামাত্র যোগেন্দ্র দোতলায় উঠিয়া গেল। দেখিল, উপরের বসিবার ঘরে হেমনলিনীকে কাছে বসাইয়া অন্নদাবাবু গল্প করিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদা একটু লজ্জিত হইলেন। আজ চায়ের টেবিলে তাঁহার স্বাভাবিক শান্তভাব নষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার রোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার মনে

মনে ক্ষোভ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বিশেষ সমাদরের স্বরে কহিলেন, "এস যোগেন্দ্র, বসো।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তোমরা যে কোনোখানে বাহির হওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ। দুজনে দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাকা কি ভালো?"

অন্নদা কহিলেন, "ওই শোনো। আমরা তো চিরকাল এইরকম কোণে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। হেমকে তো কোথাও বাহির করিতে হইলে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতে হইত।"

হেম কহিল, "কেন বাবা আমার দোষ দাও? তুমি কোথায় আমাকে লইয়া যাইতে চাও, চলো না।"

হেমনলিনী আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়াও সবলে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে মনের মধ্যে একটা শোক চাপিয়া ধরিয়া ঘরের মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া নাই। তাহার চারিদিকে যেখানে যাহা-কিছু হইতেছে, সব বিষয়েই যেন তাহার ঔৎসুক্য অত্যন্ত সজীব হইয়া আছে।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, কাল একটা মীটিং আছে, সেখানে হেমকে লইয়া চলো না।"

অন্নদা জানিতেন, মীটিঙের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হেমনলিনী চিরদিনই একান্ত অনিচ্ছা ও সংকোচ অনুভব করে—তাই তিনি কিছু না বলিয়া এক বার হেমের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেম হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল, "মীটিং? সেখানে কে বক্তৃতা দিবে দাদা?"

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ ডাক্তার।

অন্নদা। নলিনাক্ষ!

যোগেন্দ্র। ভারি চমৎকার বলিতে পারেন! তা ছাড়া, লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। এমন ত্যাগস্বীকার! এমন দৃঢ়তা! এ-রকম মানুষের মতো মানুষ পাওয়া দুর্লভ।

আর ঘণ্টা-দুই আগে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি ছাড়া নলিনাক্ষ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র কিছুই জানিত না।

হেম একটা আগ্রহ দেখাইয়া কহিল, "বেশ তো বাবা, চলো না, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইব।"

হেমনলিনীর এইরূপ উৎসাহের ভাবটাকে অন্নদা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না—

তথাপি তিনি মনে মনে একটু খুশি হইলেন। তিনি ভাবিলেন, হেম যদি জোর করিয়াও এইরূপ মেলামেশা যাওয়া-আসা করিতে থাকে, তাহ হইলে শীঘ্র উহার মন সুস্থ হইবে। মানুষের সহবাসই মানুষের সর্বপ্রকার মনোবৈকল্যের প্রধান ঔষধ। তিনি কহিলেন, "তা বেশ তো যোগেন্দ্র, কাল যথাসময়ে আমাদের মীটিঙে লইয়া যাইয়ো। কিন্তু নলিনাক্ষ সম্বন্ধে কী জান, বল তো। অনেক লোকে তো অনেক কথা কয়।"

যে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, প্রথমত যোগেন্দ্র তাহাদিগকে খুব একচোট গালি দিয়া লইল। বলিল, "ধর্ম লইয়া যাহারা ভড়ং করে, তাহারা মনে করে, কথায় কথায় পরের প্রতি অবিচার ও পরনিন্দা করিবার জন্য তাহারা ভগবানের স্বাক্ষরিত দলিল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এতবড়ো সংকীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই।" বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অন্নদা যোগেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বারবার বলিতে লাগিলেন, "সে-কথা ঠিক, সে-কথা ঠিক। পরের দোষত্রুটি লইয়া কেবলই আলোচনা করিতে থাকিলে মন ছোটো হইয়া যায়, স্বভাব সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, হৃদয়ের সরসতা থাকে না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ? কিন্তু ধার্মিকের মতো আমার স্বভাব নয়—আমি মন্দ বলিতেও জানি, ভালো বলিতেও জানি এবং মুখের উপরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া হাতে-হাতেই সব কথা চুকাইয়া ফেলি।"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "যোগেন, তুমি কি পাগল হইয়াছ? তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব কেন? আমি কি তোমাকে চিনি না?"

তখন ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যোগেন্দ্র নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত বিবরিত করিল। কহিল, "মাতাকে সুখী করিবার জন্য নলিনাক্ষ আচারসম্বন্ধে সংযত হইয়া কাশীতে বাস করিতেছে, এইজন্যই, বাবা, তুমি যাহাদিগকে অনেক লোক বল, তাহারা অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি তো এজন্য নলিনাক্ষকে ভালোই বলি। হেম, তুমি কী বল।"

হেমনলিনী কহিল, "আমিও তো তাই বলি।"

যোগেন্দ্র কহিল, "হেম যে ভালোই বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। বাবাকে সুখী করিবার জন্য হেম একটা-কিছু ত্যাগস্বীকার করিবার উপলক্ষ্য পাইলে যেন বাঁচে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি।"

অন্নদা স্নেহকোমলহাস্যে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন—হেমনলিনী লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত করিল।

৪১

সভাভঙ্গের পর অন্নদা হেমনলিনীকে লইয়া যখন ঘরে ফিরিলেন, তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। চা খাইতে বসিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, "আজ বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি।" ইহার অধিক আর তিনি কহিলেন না ;—তাঁহার মনের ভিতরের দিকে একটা ভাবের স্রোত বহিতেছিল।

আজ চা খাওয়ার পরেই হেমনলিনী আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেল, অন্নদাবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

আজ সভাস্থলে—নলিনাক্ষ—যিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে আশ্চর্য তরুণ এবং সুকুমার, যুবাবয়সেও যেন শৈশবের অম্লান লাবণ্য তাঁহার মুখশ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই ; অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাম্ভীর্য তাঁহার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ক্ষতি"। তিনি বলিয়াছিলেন, সংসারে যে-ব্যক্তি কিছু হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না ; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনি যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা-কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ, তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে-ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে, সে-লোক দুর্ভাগা ; বরঞ্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে। যাহা আমার যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড় করিয়া বলিতে পারি, "আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান,"—তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেবমন্দিরের রত্নভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি আজ হেমনলিনীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। ছাদের উপরে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলে সে আজ স্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত মন আজ পূর্ণ—সমস্ত আকাশ, সমস্ত জগৎসংসার তাহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

বক্তৃতাসভা হইতে ফিরিবার সময় যোগেন্দ্র কহিল, "অক্ষয়, তুমি বেশ পাত্রটি সন্ধান করিয়াছ যা হ'ক। এ তো সন্ন্যাসী! এর অর্ধেক কথা তো আমি বুঝিতেই পারিলাম না।"

অক্ষয় কহিল, "রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমনলিনী রমেশের ধ্যানে মগ্ন আছেন—সে-ধ্যান সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মতো সহজ লোকে

ভাঙাইতে পারিবে না। যখন বক্তৃতা চলিতেছিল, তখন তুমি কি হেমের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই?"

যোগেন্দ্র। দেখিয়াছি বই কি। ভালো লাগিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বক্তৃতা ভালো লাগিলেই যে বক্তাকে বরমাল্য দেওয়া সহজ হয়, তাহার কোনো হেতু দেখি না।

অক্ষয়। ওই বক্তৃতা কি আমাদের মতো কাহারও মুখে শুনিলে ভালো লাগিত। তুমি জান না যোগেন্দ্র, তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে। সন্ন্যাসীর জন্য উমা তপস্যা করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা কাব্যে লিখিয়া গেছেন। আমি তোমাকে বলিতেছি, আর যে-কোনো পাত্র তুমি খাড়া করিবে, হেমনলিনী রমেশের সঙ্গে মনে মনে তাহার তুলনা করিবে—সে-তুলনায় কেহ টিঁকিতে পারিবে না। নলিনাক্ষ মানুষটি সাধারণ লোকের মতোই নয়—ইহার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই উদয় হইবে না। অন্য কোনো যুবককে হেমনলিনীর সম্মুখে আনিলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু নলিনাক্ষকে বেশ একটু কৌশল করিয়া যদি এখানে আনিতে পার, তাহা হইলে হেমের মনে কোনো সন্দেহ উঠিবে না,—তাহার পরে ক্রমে শ্রদ্ধা হইতে মাল্যদান পর্যন্ত কোনোপ্রকারে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত শক্ত হইবে না।

যোগেন্দ্র। কৌশলটা আমার দ্বারা ভালো ঘটিয়া ওঠে না—বলাটাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু যাই বল, পাত্রটি আমার পছন্দ হইতেছে না।

অক্ষয়। দেখো যোগেন, তুমি নিজের জেদ লইয়া সমস্ত মাটি করিয়ো না। সকল সুবিধা একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন করিয়া হ'ক, রমেশের চিন্তা হেমনলিনীর মন হইতে না তাড়াইতে পারিলে আমি তো ভালো বুঝি না। তুমি যে গায়ের জোরে সেটা করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনেও করিয়ো না। আমার পরামর্শ অনুসারে যদি ঠিকমতো চল, তাহা হইলে তোমাদের একটা সদ্‌গতি হইতেও পারে।

যোগেন্দ্র। আসল কথা, নলিনাক্ষ আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্বোধ। এ-রকম লোকদের লইয়া কারবার করিতে আমি ভয় করি। একটা দায় হইতে উদ্ধার হইতে গিয়া ফের আর-একটা দায়ের মধ্যে জড়াইয়া পড়িব।

অক্ষয়। ভাই, তোমরা নিজের দোষে পুড়িয়াছ—আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া আতঙ্ক লাগিতেছে। রমেশ সম্বন্ধে তোমরা যে গোড়াগুড়ি একেবারে অন্ধ ছিলে। এমন ছেলে আর হয় না—ছলনা কাহাকে বলে, রমেশ তাহা জানে না—দর্শনশাস্ত্রে

রমেশ দ্বিতীয় শংকরাচার্য বলিলেই হয়, আর সাহিত্যে স্বয়ং সরস্বতীর ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরুষ-সংস্করণ। রমেশকে প্রথম হইতেই আমার ভালো লাগে নাই —ওইরকম অত্যুচ্চ-আদর্শওয়ালা লোক আমার বয়সে আমি ঢের-ঢের দেখিয়াছি। কিন্তু আমার কথাটি কহিবার জো ছিল না—তোমরা জানিতে, আমার মতো অযোগ্য অভাজন কেবল মহাত্মা-লোকদের ঈর্ষা করিতেই জানে, আমাদের আর কোনো ক্ষমতা নাই। যা হ'ক, এতদিন পরে বুঝিয়াছ, মহাপুরুষদের দূর হইতে ভক্তি করা চলে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের সম্বন্ধ করা নিরাপদ নহে। কিন্তু কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। যখন এই একটিমাত্র উপায় আছে, তখন আর এ লইয়া খুঁত খুঁত করিতে বসিয়ো না।

যোগেন্দ্র। দেখো অক্ষয়, তুমি যে আমাদের সকলের আগে রমেশকে চিনিতে পারিয়াছিলে, এ-কথা হাজার বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না। তখন নিতান্ত গায়ের জ্বালায় তুমি রমেশকে দু-চক্ষে দেখিতে পারিতে না—সেটা যে তোমার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয়, তাহা আমি মানিব না। যাই হ'ক, কলকৌশলের যদি প্রয়োজন থাকে তবে তুমি লাগো, আমার দ্বারা হইবে না। মোটের উপরে নলিনাক্ষকে আমার ভালোই লাগিতেছে না।

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় উভয়ে যখন অন্নদার চা খাইবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল, হেমনলিনী ঘরের অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অক্ষয় বুঝিল, হেমনলিনী তাহাদিগকে জানলা দিয়া পথেই দেখিতে পাইয়াছিল। ঈষৎ একটু হাসিয়া সে অন্নদার কাছে আসিয়া বসিল। চায়ের পেয়ালা ভরতি করিয়া লইয়া কহিল, "নলিনাক্ষবাবু যাহা বলেন, একেবারে প্রাণের ভিতর হইতে বলেন, সেইজন্য তাঁহার কথাগুলা এত সহজে প্রাণের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "লোকটির ক্ষমতা আছে।"

অক্ষয় কহিল, "শুধু ক্ষমতা! এমন সাধুচরিত্রের লোক দেখা যায় না।"

যোগেন্দ্র যদিও চক্রান্তের মধ্যে ছিল, তবু সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, সাধুচরিত্রের কথা আর বলিয়ো না—সাধুসঙ্গ হইতে ভগবান আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

যোগেন্দ্র কাল এই নলিনাক্ষের সাধুতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিল—এবং যাহারা নলিনাক্ষের বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহাদিগকে নিন্দুক বলিয়া গালি দিয়াছিল।

অন্নদা কহিলেন, "ছি যোগেন্দ্র, অমন কথা বলিয়ো না। বাহির হইতে যাঁহাদিগকে ভালো বলিয়া মনে হয়, অন্তরেও তাঁহারা ভালো, এ-কথা বিশ্বাস করিয়া বরং আমি ঠকিতে রাজি আছি, তবু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তার গৌরবরক্ষার জন্য সাধুতাকে

সন্দেহ করিতে আমি প্রস্তুত নই। নলিনাক্ষবাবু যে-সব কথা বলিয়াছেন, এ-সমস্ত পরের মুখের কথা নহে ;—তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার পক্ষে আজ তাহা নূতন লাভ বলিয়া মনে হইয়াছে। যে-ব্যক্তি কপট, সে-ব্যক্তি সত্যকার জিনিস দিবে কোথা হইতে? সোনা যেমন বানানো যায় না, এ-সব কথাও তেমনি বানানো যায় না। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, নলিনাক্ষবাবুকে আমি নিজে গিয়া সাধুবাদ দিয়া আসিব।"

অক্ষয় কহিল, "আমার ভয় হয়, ইঁহার শরীর টেঁকে কি না।"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "কেন, ইঁহার শরীর কি ভালো নয়?"

অক্ষয়। ভালো থাকিবার তো কথা নয়—দিনরাত্রি আপনার সাধনা এবং শাস্ত্রালোচনা লইয়াই আছেন, শরীরের প্রতি তো আর দৃষ্টি নাই।

অন্নদা কহিলেন, "এটা ভারি অন্যায়। শরীর নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই—আমরা আমাদের শরীর সৃষ্টি করি নাই। আমি যদি উঁহাকে কাছে পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই অল্পদিনেই আমি উঁহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম। আসলে স্বাস্থ্যরক্ষার গুটিকতক সহজ নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হচ্ছে—"

যোগেন্দ্র অধৈর্য হইয়া কহিল, "বাবা, বৃথা কেন তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ। নলিনাক্ষবাবুর শরীর তো দিব্য দেখিলাম,—তাঁহাকে দেখিয়া আজ আমার বেশ বোধ হইল, সাধুত্ব-জিনিসটা স্বাস্থ্যকর। আমার নিজেরই মনে হইতেছে, ওটা চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয়।"

অন্নদা কহিলেন, "না যোগেন্দ্র, অক্ষয় যাহা বলিতেছে, তাহা হইতেও পারে। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লোকেরা প্রায় অল্পবয়সেই মারা যান—ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকসান করিয়া থাকেন। এটা কিছুতে ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। যোগেন্দ্র, তুমি নলিনাক্ষবাবুকে যাহা মনে করিতেছ, তাহা নয়, উঁহার মধ্যে আসল জিনিস আছে। উঁহাকে এখন হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।"

অক্ষয়। আমি উঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিব। আপনি যদি উঁহাকে একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেন তো ভাল হয়। আর, আমার মনে হয়, আপনি সেই যে শিকড়ের রসটা আমাকে পরীক্ষার সময় দিয়াছিলেন, সেটা আশ্চর্য বলকারক। যে কোনো লোক সর্বদা মনকে খাটাইতেছে, তাহার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই। আপনি যদি এক বার নলিনাক্ষবাবুকে—

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কাহল, "আঃ, অক্ষয়, তুমি জ্বালাইলে। বড়ো বাড়াবাড়ি করিতেছ। আমি চলিলাম।"

৪২

পূর্বে যখন তাঁহার শরীর ভালো ছিল, তখন অন্নদাবাবু ডাক্তারি ও কবিরাজি নানাপ্রকার বটিকাদি সর্বদাই ব্যবহার করিতেন—এখন আর ওষুধ খাইবার উৎসাহ নাই এবং নিজের অস্বাস্থ্য লইয়া আজকাল তিনি আর আলোচনামাত্রও করেন না, বরঞ্চ তাহা গোপন করিতেই চেষ্টা করেন।

আজ তিনি যখন অসময়ে কেদারায় ঘুমাইতেছিলেন, তখন সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী কোল হইতে সেলাইয়ের সামগ্রী নামাইয়া তাহার দাদাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য দ্বারের কাছে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দাদার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে পালাইবার উপক্রম করিতেই যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "হেম, নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিই।"

হেম থমকিয়া দাঁড়াইল এবং নলিনাক্ষ তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু জাগিয়া উঠিয়া ডাকিলেন, "হেম।" হেম তাঁহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন।"

যোগেন্দ্রের সহিত নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিতেই অন্নদাবাবু ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া নলিনাক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কহিলেন, "আজ আমার বড়ো সৌভাগ্য,—আপনি আমার বাড়িতে আসিয়াছেন। হেম, কোথায় যাইতেছ মা, এইখানে বসো। নলিনাক্ষবাবু, এটি আমার কন্যা হেম,—আমরা দুজনেই সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিতে গিয়া বড়ো আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছি। আপনি ওই যে একটি কথা বলিয়াছেন,—আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা কখনোই হারাইতে পারি না, যাহা যথার্থ পাই নাই তাহাই হারাই—এ-কথাটির অর্থ বড়ো গভীর—কী বল মা হেম? বাস্তবিক কোন্ জিনিসটিকে যে আমার করিতে পারিয়াছি, আর কোন্‌টিকে পারি নাই, তাহার পরীক্ষা হয় তখনি, যখনি তাহা আমাদের হাতের কাছ হইতে সরিয়া যায়। নলিনাক্ষবাবু, আপনার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যান, তবে আমাদের বড়ো উপকার হয়। আমরা বড়ো কোথাও বাহির হই না—আপনি যখনি আসিবেন, আমাকে আর আমার মেয়েটিকে এই ঘরেই দেখিতে পাইবেন।"

নলিনাক্ষ আলজ্জিত হেমনলিনীর মুখের দিকে এক বার চাহিয়া কহিল, "আমি বক্তৃতাসভায় বড়ো বড়ো কথা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে মস্ত একটা গম্ভীর লোক মনে করিবেন না। সেদিন ছাত্ররা নিতান্ত ধরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া

বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম—অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই—কিন্তু এমন করিয়া বলিয়া আসিয়াছি যে, দ্বিতীয় বার অনুরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আমার নাই। ছাত্ররা স্পষ্টই বলিতেছে, আমার বক্তৃতা বারো-আনা বোঝাই যায় নাই। যোগেনবাবু, আপনিও তো সেদিন উপস্থিত ছিলেন—আপনাকে সতৃষ্ণনয়নে ঘড়ির দিকে তাকাইতে দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিচলিত হয় নাই, এ-কথা মনে করিবেন না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আমি ভালো বুঝিতে পারি নাই, সেটা আমার বুদ্ধির দোষ হইতে পারে, সে-জন্য আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না।"

অন্নদা। যোগেন, সব কথা বুঝিবার বয়স সব নয়।

নলিনাক্ষ। সব কথা বুঝিবার দরকারও সব সময়ে দেখি না।

অন্নদা। কিন্তু নলিনবাবু, আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে কাজ করাইয়া লইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, তাই বলিয়া শরীরকে অবহেলা করিবেন না। যাঁহারা দাতা, তাঁহাদের এ-কথা সর্বদাই স্মরণ করাইতে হয় যে, মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না, তাহা হইলে দান করিবার শক্তি চলিয়া যাইবে।

নলিনাক্ষ। আপনি যদি আমাকে কখনো ভালো করিয়া জানিবার অবসর পান, তবে দেখিবেন, আমি সংসারে কোনো-কিছুকেই অবহেলা করি না। জগতে নিতান্তই ভিক্ষুকের মতো আসিয়াছিলাম, বহুকষ্টে বহুলোকের আনুকূল্যে শরীর-মন অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। আমার পক্ষে এ নবাবি শোভা পায় না যে, আমি কিছুকেই অবহেলা করিয়া নষ্ট করিব। যে-ব্যক্তি গড়িতে পারে না, সে-ব্যক্তি ভাঙিবার অধিকারী তো নয়।

অন্নদা। বড়ো ঠিক কথা বলিয়াছেন। আপনি কতকটা এইভাবের কথাই সেদিনকার প্রবন্ধেও বলিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্র। আপনারা বসুন, আমি চলিলাম—একটু কাজ আছে।

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, আপনি কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, লোককে অতিষ্ঠ করা আমার স্বভাব নয়। আজ না হয় আমি উঠি। চলুন, খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাওয়া যাক।

যোগেন্দ্র। না না, আপনি বসুন। আমার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আমি কোথাও বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু, যোগেনের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যোগেন এমনি, যখন খুশি আসে, যখন খুশি যায়, উহাকে ধরিয়া রাখা শক্ত।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনবাবু, আপনি এখন কোথায় আছেন ?"

নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল, "আমি যে বিশেষ কোথাও আছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার জানাশুনা লোক অনেক আছেন, তাঁহারা আমাকে টানাটানি করিয়া লইয়া বেড়ান। আমার সে মন্দ লাগে না—কিন্তু মানুষের চুপ করিয়া থাকারও প্রয়োজন আছে। তাই যোগেনবাবু আমার জন্য আপনাদের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতেই স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ-গলিটি বেশ নিভৃত বটে।"

এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন তো দেখিতে পাইতেন যে, কথাটা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। ওই পাশের বাসাতেই রমেশ ছিল।

ইতিমধ্যে চা তৈরির খবর পাইয়া সকলে মিলিয়া নিচে চা খাইবার ঘরে গেলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, নলিনবাবুকে এক পেয়ালা চা দাও।"

নলিনাক্ষ কহিল, "না অন্নদাবাবু, আমি চা খাইব না।"

অন্নদা। সে কী কথা নলিনবাবু। এক পেয়ালা চা—না হয় ত কিছু মিষ্টি খান।

নলিনাক্ষ। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর কী বলিব। মধ্যাহ্নভোজনের তিন-চার ঘণ্টা পরে চায়ের উপলক্ষ্যে খানিকটা গরম জল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে না হয় খুব পাতলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই।

নলিনাক্ষ চকিতের মধ্যে হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, হেমনলিনী নলিনাক্ষের চা খাইতে সংকোচ সম্বন্ধে একটা কী আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চায়ের টেবিলকে আমি ঘৃণা করিতেছি বলিয়া মনেও করিবেন না। পূর্বে আমি যথেষ্ট চা খাইয়াছি—চায়ের গন্ধে এখনো আমার মনটা উৎসুক হয়—আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত আচারপরায়ণা—আমি ছাড়া তাঁহার যথার্থ আপনার কেহ নাই—সেই মার কাছে আমি সংকুচিত হইয়া যাইতে পারিব না। এইজন্য আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা খাইয়া যে সুখটুকু পাইতেছেন, আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে আমি বঞ্চিত নহি।"

ইতিপূর্বে নলিনাক্ষের কথাবার্তায় হেমনলিনী মনে মনে একটু যেন আঘাত পাইতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, নলিনাক্ষ নিজেকে তাহাদের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতেছিল না। সে কেবলই বেশি কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছিল। হেমনলিনী জানিত না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা একান্ত সংকোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে পারে না। এইজন্য নূতন লোকের কাছে অনেক স্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে। নিজের অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার মধ্যে একটা বেসুর লাগাইয়া বসে। সেটা নিজের কানেও ঠেকে। সেইজন্যই আজ যোগেন্দ্র যখন অধীর হইয়া উঠিয়া পড়িল, তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা ধিক্‌কার অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন মার কথা বলিল, তখন হেমনলিনী শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাম্ভীর্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু সংকোচে তাহা পারিল না।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ। এ-কথা পূর্বে জানিলে আমি কখনোই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ করিতাম না। মাপ করিবেন।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "চা লইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের স্নেহের অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব ?"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী তাহার পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিল এবং বাংলা মাসিক পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

৪৩

কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের সহিত অন্নদাবাবুদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল। প্রথমে হেমনলিনী মনে করিয়াছিল, নলিনাক্ষের মতো লোকের কাছে কেবল বড়ো বড়ো আধ্যাত্মিক বিষয়েই বুঝি উপদেশ পাওয়া যাইবে—এমন মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ বিষয়ে সহজ লোকের মতো আলাপ চলিতে পারে, তাহা মনেও

করিতে পারে নাই। অথচ সমস্ত হাস্যালাপের মধ্যে নলিনাক্ষের একটা কেমন দূরত্বও ছিল।

এক দিন অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে যোগেন্দ্র কিছু উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, "জান বাবা, আজকাল আমাদিগকে সমাজের লোকে নলিনাক্ষবাবুর চেলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই লইয়া এইমাত্র পরেশের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমি তো লজ্জার কথা কিছু দেখি না। যেখানে সকলেই গুরু, কেহই চেলা নয়, সেই দলে মিশিতেই আমার লজ্জাবোধ হয়;—সেখানে শিক্ষা দিবার হুড়োমুড়িতে শিক্ষা পাইবার অবকাশ থাকে না।"

নলিনাক্ষ। অন্নদাবাবু, আমিও আপনার দলে—আমরা চেলার দল। যেখানে আমাদের কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানেই আমরা তলপি বহিয়া বেড়াইব।

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া কহিল, "না না, কথাটা ভালো নয়। নলিনবাবু, কেহই যে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারিবে না—যাহারা আপনার কাছে আসিবে, তাহারাই আপনার চেলা বলিয়া খ্যাত হইয়া যাইবে, এমন বদনামটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আপনি কী সব কাণ্ড করেন, ওগুলা ছাড়িয়া দিন।"

নলিনাক্ষ। কী করিয়া থাকি বলুন।

যোগেন্দ্র। ওই যে শুনিয়াছি প্রাণায়াম করেন, ভোরের বেলায় সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, খাওয়াদাওয়া লইয়া নানাপ্রকার আচারবিচার করিতে ছাড়েন না, ইহাতে দশের মধ্যে আপনি খাপছাড়া হইয়া পড়েন।

যোগেন্দ্রের এই রূঢ়বাক্যে ব্যথিত হইয়া হেমনলিনী মাথা নিচু করিল। নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল, "যোগেনবাবু, দশের মধ্যে খাপছাড়া হওয়াটা দোষের। কিন্তু তলোয়ারই কী, আর মানুষই কী, তাহার সবটাই কি খাপের মধ্যে থাকে? খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে-অংশটা থাকিতে বাধ্য, সেটাতে সকল তলোয়ারেরই ঐক্য আছে—বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য অনুসারে কারিগরি নানারকমের হইয়া থাকে। মানুষেরও দশের খাপের বাহিরে নিজের বিশেষ কারিগরির একটা জায়গা আছে, সেটাও কি আপনারা বেদখল করিতে চান? আর, আমার কাছে এও আশ্চর্য লাগে, আমি সকলের অগোচরে ঘরে বসিয়া যে-সকল নিরীহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা লোকের চোখেই বা পড়ে কী করিয়া, আর তাহা লইয়া আলোচনাই বা হয় কেন?"

যোগেন্দ্র। আপনি তা জানেন না বুঝি, যাহারা জগতের উন্নতির ভার সম্পূর্ণ নিজের স্কন্ধে লইয়াছে, তাহারা পরের ঘরে কোথায় কী ঘটিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে। যেটুকু খবর না পায়, সেটুকু পূরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের আছে। এ নহিলে বিশ্বের সংশোধনকার্য চলিবে কী করিয়া? তা ছাড়া নলিনবাবু, পাঁচজনে যাহা না করে, তাহা চোখের আড়ালে করিলেও চোখে পড়িয়া যায়—যাহা সকলেই করে, তাহাতে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। এই দেখুন না কেন, আপনি ছাদে বসিয়া কী সব কাণ্ড করেন, তাহা আমাদের হেমের চোখেও পড়িয়া গেছে—হেম সে-কথা বাবাকে বলিতেছিল—অথচ হেম তো আপনার সংশোধনের ভার গ্রহণ করে নাই।

হেমনলিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ব্যথিত হইয়া একটা-কী বলিবার উপক্রম করিবামাত্র নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি কিছুমাত্র লজ্জা পাইবেন না; ছাদে বেড়াইতে উঠিয়া সকালে-সন্ধ্যায় আপনি যদি আমার আহ্নিককৃত্য দেখিয়া থাকেন, সে-জন্য আপনাকে কে দোষী করিবে? আপনার ছুটি চক্ষু আছে বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; ও-দোষটা আমাদেরও আছে।"

অন্নদা। তা ছাড়া হেম আপনার আহ্নিক সম্বন্ধে আমার কাছে কোনো আপত্তি প্রকাশ করে নাই। সে শ্রদ্ধাপূর্বক আপনার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

যোগেন্দ্র। আমি কিন্তু ও-সব কিছু বুঝি না। আমরা সাধারণে সংসারে সহজ রকমে যে-ভাবে চলিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোনো বিশেষ অসুবিধা দেখিতেছি না,—গোপনে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া, বিশেষ কিছু যে লাভ হয়, আমার তাহা মনে হয় না—বরং উহাতে মনের যেন একটা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মানুষকে একঝোঁকা করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না—আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ, পৃথিবীর মধ্যে আমি নেহাত মাঝারিরকম জায়গাটাতেই থাকি; যাঁহারা কোনো-প্রকার উচ্চমঞ্চে চড়িয়া বসেন, আমার পক্ষে ঢেলা না মারিয়া তাঁহাদের নাগাল পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার মতো এমন অসংখ্য লোক আছে, অতএব আপনি যদি সকলকে ছাড়িয়া কোনো অদ্ভুতলোকে উধাও হইয়া যান, তবে আপনাকে অসংখ্য ঢেলা খাইতে হইবে।

নলিনাক্ষ। ঢেলা যে নানারকমের আছে। কোনোটা বা স্পর্শ করে, কোনোটা বা চিহ্নিত করিয়া যায়। যদি কেহ বলে, লোকটা পাগলামি করিতেছে, ছেলেমানুষি করিতেছে, তাহাতে কোনো ক্ষতি করে না—কিন্তু যখন বলে, লোকটা সাধুগিরি-

সাধকগিরি করিতেছে, গুরু হইয়া উঠিয়া চেলাসংগ্রহের চেষ্টায় আছে, তখন সে-কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে যে-পরিমাণ হাসির দরকার হয়, সে-পরিমাণ অপর্যাপ্ত হাসি জোগায় না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আবার বলিতেছি, আমার উপর রাগ করিবেন না নলিনবাবু। আপনি ছাদে উঠিয়া যাহা খুশি করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কে? আমার বক্তব্য কেবল এই যে, সাধারণের সীমানার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিলে কোনো কথা থাকে না। সকলের যে-রকম চলিতেছে, আমার তেমনি চলিয়া গেলেই যথেষ্ট ;—তাহার বেশি চলিতে গেলেই লোকের ভিড় জমিয়া যায়। তাহারা গালি দিক বা ভক্তি করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না—কিন্তু জীবনটা এই রকম ভিড়ের মধ্যে কাটানো কি আরামের?

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, যান কোথায়? আমাকে আমার ছাদের উপর হইতে একেবারে সর্বসাধারণের শান-বাঁধানো একতলার মেজের উপর সবলে হঠাৎ উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া পালাইলে চলিবে কেন?

যোগেন্দ্র। আজকের মতো আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়। একটু ঘুরিয়া আসি গে।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে পর হেমনলিনী মুখ নত করিয়া টেবিল-ঢাকার ঝালরগুলির প্রতি অকারণে উপদ্রব করিতে লাগিল। সে-সময়ে অনুসন্ধান করিলে তাহার চক্ষুপল্লবের প্রান্তে একটা আর্দ্রতার লক্ষণও দেখা যাইত।

হেমনলিনী দিনে দিনে নলিনাক্ষের সহিত আলাপ করিতে করিতে আপনার অন্তরের দৈন্য দেখিতে পাইল এবং নলিনাক্ষের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুল-ভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অত্যন্ত দুঃখের সময় যখন সে অন্তরে-বাহিরে কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখনই নলিনাক্ষ বিশ্বকে তাহার সম্মুখে যেন নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিল। ব্রহ্মচারিণীর মতো একটা নিয়ম পালনের জন্য তাহার মন কিছুদিন হইতে উৎসুক ছিল—কারণ, নিয়ম মনের পক্ষে একটা দৃঢ় অবলম্বন ;—শুধু তাহাই নহে, শোক কেবলমাত্র মনের ভাব-আকারে টিঁকিতে চায় না, সে বাহিরেও একটা কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এ-পর্যন্ত হেমনলিনী সেরূপ কিছু করিতে পারে নাই,—লোকচক্ষুপাতের সংকোচে বেদনাকে সে অত্যন্ত গোপনে আপনার মনের মধ্যেই পালন করিয়া আসিয়াছে। নলিনাক্ষের সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আজ যখন সে শুচি আচার ও নিরামিষ আহার গ্রহণ করিল, তখন তাহার মন বড়ো তৃপ্তিলাভ করিল। নিজের শয়নঘরের

মেজে হইতে মাদুর ও কার্পেট তুলিয়া ফেলিয়া বিছানাটি একধারে পর্দার দ্বারা আড়াল করিল—সে-ঘরে আর কোনো জিনিস রাখিল না। সেই মেজে প্রত্যহ হেমনলিনী স্বহস্তে জল ঢালিয়া পরিষ্কার করিত—একটি রেকাবিতে কয়েকটি ফুল থাকিত ; স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিয়া সেইখানে মেজের উপরে হেমনলিনী বসিত—সমস্ত মুক্তবাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে অবারিত আলোক প্রবেশ করিত, এবং সেই আলোকের দ্বারা, আকাশের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সে আপনার অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া লইত। অন্নদাবাবু সম্পূর্ণভাবে হেমনলিনীর সহিত যোগ দিতে পারিতেন না—কিন্তু নিয়মপালনের দ্বারা হেমনলিনীর মুখে যে একটি পরিতৃপ্তির দীপ্তি প্রকাশ পাইত, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। এখন হইতে নলিনাক্ষ আসিলে হেমনলিনীর এই ঘরেই মেজের উপরে বসিয়া তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে আলোচনা চলিত।

যোগেন্দ্র একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—"এ সমস্ত কী হইতেছে ? তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়িটাকে ভয়ংকর পবিত্র করিয়া তুলিলে—আমার মতো লোকের এখানে পা ফেলিবার জায়গা নাই।"

আগে হইলে যোগেন্দ্রের বিদ্রূপে হেমনলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত ;—এখন অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রের কথায় মাঝে মাঝে রাগ করিয়া উঠেন, কিন্তু হেমনলিনী নলিনাক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া শান্তস্নিগ্ধভাবে হাস্য করে। এখন সে একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিত নির্ভর অবলম্বন করিয়াছে—এ-সম্বন্ধে লজ্জা করাকেও সে দুর্বলতা বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে তাহার এখনকার সমস্ত আচরণকে অদ্ভুত মনে করিয়া পরিহাস করিতেছে, তাহা সে জানিত—কিন্তু নলিনাক্ষের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত লোককে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে—এইজন্য লোকের সম্মুখে সে আর সংকুচিত হইত না।

এক দিন হেমনলিনী প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা শেষ করিয়া তাহার সেই নিভৃত ঘরটিতে বাতায়নের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমনসময় হঠাৎ অন্নদাবাবু নলিনাক্ষকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হেমনলিনীর হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে নলিনাক্ষকে ও পরে তাহার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "ব্যস্ত হইবেন না নলিনবাবু, হেম আপনার কর্তব্য করিয়াছে।"

অন্যদিন এত সকালে নলিনাক্ষ এখানে আসে না। তাই বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত হেমনলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিল। নলিনাক্ষ কহিল, "কাশী হইতে

মার খবর পাওয়া গেল, তাঁহার শরীর তেমন ভালো নাই, তাই আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কাশীতে যাইব স্থির করিয়াছি। দিনের বেলায় যথাসম্ভব আমার সমস্ত কাজ সারিয়া লইতে হইবে, তাই এখন আপনাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কী আর বলিব, আপনার মার অসুখ, ভগবান করুন তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন। এই কয়দিনে আমরা আপনার কাছে যে উপকার পাইয়াছি তাহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।"

নলিনাক্ষ কহিল, "নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন যত্নসাহায্য করিতে হয়, তাহা তো করিয়াইছেন—তা ছাড়া যে-সকল গভীর কথা লইয়া এতদিন আমি একলা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন—আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরও দ্বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য মানুষের হৃদয়ের সহযোগিতায় সার্থকতালাভ যে কত সহজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।"

অন্নদা কহিলেন, "আমি আশ্চর্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছুর বড়োই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কী, আমরা জানিতাম না—ঠিক এমন সময়েই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম, এবং দেখিলাম, আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না। আমরা অত্যন্ত কুনো, লোকজনের কাছে যাতায়াত আমাদের বড়ো বেশি নাই—কোনো সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিবার বাতিক আমাদের একেবারে নাই বলিলেই হয়—যদি বা আমি যাই, কিন্তু হেমকে নড়াইতে পারা বড়ো শক্ত। কিন্তু সেদিন এ কী আশ্চর্য বলুন দেখি—যেমনি যোগেনের কাছে শুনিলাম, আপনি বক্তৃতা করিবেন, আমরা দুই জনেই কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম—এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এ-সব কথা মনে রাখিবেন নলিনবাবু। ইহা হইতে বুঝিবেন, আপনাকে আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োজন আছে, নহিলে এমনটি ঘটিতে পারিত না। আমরা আপনার দায়স্বরূপ।"

নলিনাক্ষ। আপনারাও এ-কথা মনে রাখিবেন, আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাহারও কাছে আমি আমার জীবনের গূঢ়কথা প্রকাশ করি নাই। সত্যকে প্রকাশ করিতে পারাই সত্য সম্বন্ধে চরমশিক্ষা। সেই প্রকাশ করিবার গভীর প্রয়োজন আপনাদের দ্বারাই মিটাইতে পারিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে আমার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল, সে-কথাও আপনারা কখনো ভুলিবেন না।

হেমনলিনী কোনো কথা কহে নাই; বাতায়নের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিয়া

মেজের উপরে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনাক্ষের যখন উঠিবার সময় হইল, তখন সে কহিল, "আপনার মা কেমন থাকেন, সে-খবর আমরা যেন জানিতে পাই।"

নলিনাক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমনলিনী পুনর্বার তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

৪৪

এ-কয়দিন অক্ষয় দেখা দেয় নাই। নলিনাক্ষ কাশীতে চলিয়া গেলে আজ সে যোগেন্দ্রের সঙ্গে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে দেখা দিয়াছে। অক্ষয় মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রমেশের স্মৃতি হেমনলিনীর মনে কতখানি জাগিয়া আছে, তাহা পরিমাপ করিবার সহজ উপায় অক্ষয়ের প্রতি তাহার বিরাগপ্রকাশ। আজ দেখিল, হেমনলিনীর মুখ প্রশান্ত—অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হইল না—সহজ প্রসন্নতার সহিত হেমনলিনী কহিল, "আপনাকে যে এতদিন দেখি নাই ?"

অক্ষয় কহিল, "আমরা কি প্রত্যহ দেখিবার যোগ্য ?"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "সে-যোগ্যতা না থাকিলে যদি দেখাশোনা বন্ধ করা উচিত বোধ করেন, তবে আমাদের অনেককেই নির্জনবাস অবলম্বন করিতে হয়।"

যোগেন্দ্র। অক্ষয় মনে করিয়াছিল, একলা বিনয় করিয়া বাহাদুরি লইবে, হেম তাহার উপরেও টেক্কা দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির হইয়া বিনয় করিয়া লইল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার একটুখানি বলিবার কথা আছে। আমাদের মতো সাধারণ লোকই প্রত্যহ দেখাশোনার যোগ্য—আর যাঁরা অসাধারণ, তাঁহাদিগকে কদাচ-কখনো দেখাই ভালো, তাহার বেশি সহ্য করা শক্ত। এইজন্যই তো অরণ্যে-পর্বতে-গহ্বরেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়ান—লোকালয়ে তাঁহারা স্থায়িভাবে বসতি আরম্ভ করিয়া দিলে অক্ষয়-যোগেন্দ্র প্রভৃতি নিতান্তই সামান্য লোকদের অরণ্যে-পর্বতে ছুটিতে হইত।

যোগেন্দ্রের কথাটার মধ্যে যে খোঁচা ছিল, হেমনলিনীকে তাহা বিঁধিল। কোনো উত্তর না দিয়া তিন পেয়ালা চা তৈরি করিয়া সে অন্নদা, অক্ষয় ও যোগেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন করিল। যোগেন্দ্র কহিল, "তুমি বুঝি চা খাইবে না ?"

হেমনলিনী জানিত, এবার যোগেন্দ্রের কাছে কঠিন কথা শুনিতে হইবে, তবু সে শান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না, আমি চা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। এবারে রীতিমতো তপস্যা আরম্ভ হইল বুঝি। চায়ের পাতার মধ্যে বুঝি আধ্যাত্মিক তেজ যথেষ্ট নাই, যা-কিছু আছে, সমস্তই হরতুকির মধ্যে? কী বিপদেই পড়া গেল। হেম, ও-সমস্ত রাখিয়া দাও। এক পেয়ালা চা খাইলেই যদি তোমার যোগ-যাগ ভাঙিয়া যায়, তবে যাক না—এ-সংসারে খুব মজবুত জিনিসও টেঁকে না, অমন পলকা ব্যাপার লইয়া পাঁচ জনের মধ্যে চলা অসম্ভব।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া স্বহস্তে আর-এক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া হেমনলিনীর সম্মুখে রাখিল। সে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, আজ যে তুমি শুধু চা খাইলে। আর কিছু খাইবে না?"

অন্নদাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং হাত কাঁপিতে লাগিল, "মা আমি সত্য বলিতেছি, এ টেবিলে কিছু খাইতে আমার মুখে রোচে না। যোগেনের কথাগুলো আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। জানি আমার শরীর-মনের এ-অবস্থায় কথা বলিতে গেলেই আমি কী বলিতে কী বলিয়া ফেলি—শেষকালে অনুতাপ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী তাহার পিতার চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না। দাদা আমাকে চা খাওয়াইতে চান, সে তো ভালোই—আমি তো কিছু তাহাতে মনে করি নাই। না বাবা, তোমাকে খাইতে হইবে—খালি-পেটে চা খাইলে তোমার অসুখ করে আমি জানি।"

এই বলিয়া হেম আহার্যের পাত্র তাহার বাপের সম্মুখে টানিয়া আনিল। অন্নদা ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন।

হেমনলিনী নিজের চৌকিতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন্দ্রের প্রস্তুত চায়ের পেয়ালা হইতে চা খাইতে উদ্যত হইল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, "মাপ করিবেন, ও-পেয়ালাটি আমাকে দিতে হইবে, আমার পেয়ালা ফুরাইয়া গেছে।"

যোগেন্দ্র উঠিয়া আসিয়া হেমনলিনীর হাত হইতে পেয়ালা টানিয়া লইল এবং অন্নদাকে কহিল, "আমার অন্যায় হইয়াছে, আমাকে মাপ করো।"

অন্নদা তাহার কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে সরিয়া গেল। অন্নদাবাবু আহার করিয়া উঠিয়া হেমনলিনীর হাত ধরিয়া কম্পমান চরণে উপরের ঘরে গেলেন।

সেই রাত্রেই অন্নদাবাবুর শূলবেদনার মতো হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া

বলিল, তাঁহার যকৃতের বিকার উপস্থিত হইয়াছে—এখনো রোগ অগ্রসর হয় নাই, এইবেলা পশ্চিমে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বৎসরখানেক কিংবা ছয় মাস বাস করিয়া আসিলে শরীর নির্দোষ হইতে পারিবে।

বেদনা উপশম হইলে ও ডাক্তার চলিয়া গেলে, অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, চলো মা, আমরা কিছুদিন না হয় কাশীতে গিয়াই থাকি।"

ঠিক একই সময়ে হেমনলিনীর মনেও সে-কথা উদয় হইয়াছিল। নলিনাক্ষ চলিয়া যাইবামাত্র হেম আপন সাধনসম্বন্ধে একটা দুর্বলতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আহ্নিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত। নলিনাক্ষের মুখশ্রীতেই যে একটা স্থির নিষ্ঠা ও প্রশান্ত প্রসন্নতার দীপ্তি ছিল তাহাই হেমনলিনীর বিশ্বাসকে সর্বদাই যেন বিকশিত করিয়া রাখিয়াছিল, নলিনাক্ষের অবর্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটা ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্তদিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রান্তি আসিয়া এমনি নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। চায়ের টেবিলে দৃঢ়তার সহিত সে আতিথ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়া ছিল। আবার তাহাকে তাহার সেই পূর্বস্মৃতির বেদনা দ্বিগুণবেগে আক্রমণ করিয়াছে—আবার তাহার মন যেন গৃহহীন, আশ্রয়হীনের মতো হা হা করিয়া বেড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। তাই যখন সে কাশী যাইবার প্রস্তাব শুনিল, তখন ব্যগ্র হইয়া কহিল, "বাবা, সেই বেশ হইবে।"

পরদিন একটা আয়োজনের উদ্‌যোগ দেখিয়া যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কী, ব্যাপারটা কী?"

অন্নদা কহিলেন, "আমরা পশ্চিমে যাইতেছি।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "পশ্চিমে কোথায়?"

অন্নদা কহিলেন, "ঘুরিতে ঘুরিতে একটা কোনো জায়গা পছন্দ করিয়া লইব।" তিনি যে কাশীতে যাইতেছেন, এ-কথা একদমে যোগেন্দ্রের কাছে বলিতে সংকুচিত হইলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "আমি কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি সেই হেডমাস্টারির জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

৪৫

রমেশ প্রত্যুষেই এলাহাবাদ হইতে গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন রাস্তায় অধিক লোক ছিল না, এবং শীতের জড়িমায় রাস্তার ধারের গাছগুলা যেন পল্লবা-বরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া সাদা কুয়াশা, ডিম্বগুলির উপরে নিস্তব্ধ-আসীন রাজহংসের মতো স্থির হইয়া ছিল। সেই নির্জন পথে গাড়ির মধ্যে একটা মস্ত মোটা ওভারকোটের নিচে রমেশের বক্ষঃস্থল চঞ্চল হৃৎপিণ্ডের আঘাতে কেবলই তরঙ্গিত হইতেছিল।

বাংলার বাহিরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া রমেশ নামিল। ভাবিল, গাড়ির শব্দ নিশ্চয়ই কমলা শুনিয়াছে;—শব্দ শুনিয়া সে হয়তো বারান্দার বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বহস্তে কমলার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে রমেশ একটি দামি নেকলেস কিনিয়া আনিয়াছে—তাহারই বাক্সটা রমেশ তাহার ওভারকোটের বৃহৎ পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

বাংলার সম্মুখে আসিয়া রমেশ দেখিল, বিষন-বেহারা বারান্দায় শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে—ঘরের দ্বারগুলি বন্ধ। বিমর্ষমুখে রমেশ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু উচ্চস্বরে ডাকিল, "বিষন।" ভাবিল, এই ডাকে ঘরের ভিতরকার নিদ্রাও ভাঙিবে। কিন্তু এমন করিয়া নিদ্রা ভাঙাইবার যে অপেক্ষা আছে, ইহাই তাহার মনে বাজিল ; রমেশ তো অর্ধেক রাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই।

দুই-তিন ডাকেও বিষন উঠিল না—শেষকালে ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল। বিষন উঠিয়া বসিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মতো তাকাইয়া রহিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বহুজি ঘরে আছেন ?"

বিষন প্রথমটা রমেশের কথা যেন বুঝিতেই পারিল না—তাহার পরে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি ঘরেই আছেন।" এই বলিয়া সে পুনর্বার শুইয়া পড়িয়া নিদ্রা দিবার উপক্রম করিল।

রমেশ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তথাপি এক বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কমলা।" কোথাও কোনো সাড়া পাইল না। বাহিরের বাগানে নিমগাছতলা পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে, আস্তাবল-ঘরে সন্ধান করিয়া আসিল, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইল না। তখন রৌদ্র উঠিয়া পড়িয়াছে—কাকগুলা ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাংলার ইঁদারা হইতে জল লইবার জন্য কলস মাথায় পাড়ার মেয়ে

দুই-এক জন দেখা দিতেছে। পথের ওপারে কুটির-প্রাঙ্গণে কোনো পল্লীনারী বিচিত্র উচ্চ সুরে গান গাহিতে গাহিতে জাঁতায় গম ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমেশ বাংলাঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিষন পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন সে নত হইয়া দুই হাতে খুব করিয়া বিষণকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল— দেখিল, তাহার নিশ্বাসে তাড়ির প্রবল গন্ধ ছুটিতেছে।

ঝাঁকানির বিষম বেগে বিষন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, "বহুজি কোথায় ?"

বিষন কহিল, "বহুজি তো ঘরেই আছেন।"

রমেশ। কই, ঘরে কোথায় ?

বিষন। কাল তো এখানেই আসিয়াছেন।

রমেশ। তাহার পরে কোথায় গেছেন ?

বিষন হাঁ করিয়া রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময়ে খুব চওড়া পাড়ের এক বাহারে ধুতি পরিয়া চাদর উড়াইয়া রক্তবর্ণ-চক্ষু উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তোর মা কোথায় ?"

উমেশ কহিল, "মা তো কাল হইতে এখানেই আছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কোথায় ছিলি ?"

উমেশ কহিল, "আমাকে মা কাল বিকালে সিধুবাবুদের বাড়ি যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

গাড়োয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু, আমার ভাড়া।"

রমেশ তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতে চড়িয়া একবারে খুড়ার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাড়িসুদ্ধ সকলেই যেন চঞ্চল। রমেশের মনে হইল, কমলার বুঝি কোনো অসুখ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কাল সন্ধ্যার কিছু পরেই উমা হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ নীল ও হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। তাহার চিকিৎসা লইয়া কাল বাড়িসুদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিল। সমস্ত রাত কেহ ঘুমাইতে পায় নাই।

রমেশ মনে করিল, উমির অসুখ হওয়াতে নিশ্চয়ই কাল কমলাকে এখানে আনানো হইয়াছিল। বিপিনকে কহিল, "কমলা তা হইলে উমিকে লইয়া খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া আছে।"

কমলা কাল রাত্রে এখানে আসিয়াছিল কি না, বিপিন তাহা নিশ্চয় জানিত না—তাই রমেশের কথায় একপ্রকার সায় দিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি উর্মিকে যে-রকম ভালোবাসেন, খুব ভাবিতেছেন বই কি। কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছে, ভাবনার কোনো কারণই নাই।"

যাহা হউক, অত্যন্ত উল্লাসের মুখে কল্পনার পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বাধা পাইয়া রমেশের মনটা বিকল হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মিলনে যেন একটা দৈবের ব্যাঘাত আছে।

এমন সময় রমেশের বাংলা হইতে উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি ছিল। এই বালকটাকে শৈলজা স্নেহও করিত। বাড়ির ভিতরে শৈলজার ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া উর্মির ঘুম ভাঙিবার আশঙ্কায় শৈল তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় মাসীমা।"

শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন রে, তুই তো কাল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ও-বাড়িতে গেলি। সন্ধ্যার পর আমাদের লছমনিয়াকে ওখানে পাঠাইবার কথা ছিল, খুকীর অসুখে তাহা পারি নাই।

উমেশ মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "ও-বাড়িতে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।"

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে কী কথা। কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?"

উমেশ। আমাকে তো মা থাকিতে দিলেন না। ও-বাড়িতে গিয়াই তিনি আমাকে সিধুবাবুদের ওখানে যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।

শৈল। তোরও তো বেশ আক্কেল দেখিতেছি। বিষন কোথায় ছিল?

উমেশ। বিষন তো কিছুই বলিতে পারে না। কাল সে খুব তাড়ি খাইয়াছিল।

শৈল। যা, যা, শীঘ্র বাবুকে ডাকিয়া আন্।

বিপিন আসিতেই শৈল কহিল, "ওগো, এ কী সর্বনাশ হইয়াছে।"

বিপিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন, কী হইয়াছে?"

শৈল। কমল কাল ও-বাংলায় গিয়াছিল, তাহাকে তো সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

বিপিন। তিনি কি কাল রাত্রে এখানে আসেন নাই?

শৈল। না গো। উর্মির অসুখে আনাইব মনে করিয়াছিলাম, লোক কোথায় ছিল? রমেশবাবু কি আসিয়াছেন?

বিপিন। বোধ হয়, ও-বাংলায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন, কমলা এইখানেই আছেন। তিনি তো আমাদের এখানেই আসিয়াছেন।

শৈল। যাও যাও, শীঘ্র যাও, তাঁহাকে লইয়া খোঁজ করো গে। উমি এখন ঘুমাইতেছে—সে ভালোই আছে।

বিপিন ও রমেশ আবার সেই গাড়িতে উঠিয়া বাংলায় ফিরিয়া গেল এবং বিষনকে লইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় জোড়াতাড়া দিয়া যেটুকু খবর বাহির হইল, তাহা এই—কাল বৈকালে কমলা একলা গঙ্গার ধারের অভিমুখে চলিয়াছিল। বিষন তাহার সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করে, কমলা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া ফিরাইয়া দেয়। সে পাহারা দিবার জন্য বাগানের গেটের কাছে বসিয়া ছিল—এমন সময়ে গাছ হইতে সদ্যঃসঞ্চিত ফেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করিয়া তাড়িওয়ালা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার পর হইতে বিশ্বসংসারে কী যে ঘটিয়াছে, তাহা বিষনের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নহে। যে-পথ দিয়া কমলাকে গঙ্গার দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, বিষন তাহা দেখাইয়া দিল।

সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া রমেশ, বিপিন ও উমেশ কমলার সন্ধানে চলিল। উমেশ হৃতশাবক শিকারি জন্তুর মতো চারিদিকে তীক্ষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। গঙ্গার তটে আসিয়া তিন জনে এক বার দাঁড়াইল। সেখানে চারিদিক উন্মুক্ত। ধূসর বালুকা প্রভাত-রৌদ্রে ধু ধু করিতেছে। কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। উমেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা, মাগো, মা কোথায়?" ওপারের সুদূর উচ্চতীর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল—কেহই সাড়া দিল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে উমেশ হঠাৎ দূরে সাদা কী একটা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দেখিল, জলের একেবারে ধারেই একগোছা চাবি একটা রুমালে বাঁধা পড়িয়া আছে। "কি রে ওটা কী?" বলিয়া রমেশও আসিয়া পড়িল। দেখিল, কমলারই চাবির গোছা।

যেখানে চাবি পড়িয়াছিল, সেখানে বালুতটের প্রান্তভাগে পলিমাটি পড়িয়াছে। সেই কাঁচা মাটির উপর দিয়া গঙ্গার জল পর্যন্ত ছোটো ছুইটি পায়ের গভীর চিহ্ন পড়িয়া গেছে। খানিকটা জলের মধ্যে একটা কী ঝিকঝিক করিতেছিল, তাহা উমেশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না—সে সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ধরিতেই দেখা গেল, সোনার উপরে এনামেল-করা একটি ছোটো ব্রোচ—ইহা রমেশেরই উপহার।

এইরূপে সমস্ত সংকেতই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করিল,

তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না—"মা, মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জল সেখানে অধিক ছিল না—উমেশ বারংবার পাগলের মতো ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল, জল ঘোলা করিয়া তুলিল।

রমেশ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কহিল, "উমেশ, তুই কী করিতেছিস? উঠিয়া আয়।"

উমেশ মুখ দিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, "আমি উঠিব না, আমি উঠিব না। মাগো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।"

বিপিন ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু উমেশ জলের মাছের মতো সাঁতার দিতে পারে—তাহার পক্ষে জলে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সে অনেকটা হাঁপাইয়া-ঝাঁপাইয়া শ্রান্ত হইয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িল এবং বালুর উপরে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নিস্তব্ধ রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, চলুন। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কী হইবে! এক বার পুলিসকে খবর দেওয়া যাক, তাহারা সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখুক।"

শৈলজার ঘরে সেদিন আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া কান্নার রোল উঠিল। নদীতে জেলেরা নৌকা লইয়া অনেকদূর পর্যন্ত জাল টানিয়া বেড়াইল। পুলিস চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিল। স্টেশনে গিয়া বিশেষ করিয়া খবর লইল, কমলার সহিত বর্ণনায় মেলে, এমন কোনো বাঙালির মেয়ে রাত্রে রেলগাড়িতে ওঠে নাই।

সেই দিনই বিকালে খুড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়দিন হইতে কমলার ব্যবহার ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

লছমনিয়া কহিল, "সেইজন্যই খুকী কাল রাত্রে অকারণে কান্না জুড়িয়া এমন একটা অদ্ভুতকাণ্ড করিল—উহাকে ভালো করিয়া ঝাড়াইয়া লওয়া দরকার।"

রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল, তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—এক দিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর-এক দিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।

সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল—যেখানে চাবির গোছা পড়িয়া ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্ন কটি একদৃষ্টে দেখিল

—তাহার পরে তীরে জুতা খুলিয়া ধুতি গুটাইয়া লইয়া খানিকটা জল পর্যন্ত নামিয়া গেল এবং বাক্স হইতে সেই নূতন নেকলেসটি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রমেশ কখন যে গাজিপুর হইতে চলিয়া গেল, খুড়ার বাড়িতে তাহার খবর লইবার মতো অবস্থা কাহারও রহিল না।

৪৬

এখন রমেশের সম্মুখে কোনো কাজ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহজীবনে সে যেন কোনো কাজ করিবে না, কোথাও স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবে না। হেমনলিনীর কথা তাহার মনে একেবারেই যে উঠে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে সরাইয়া দিয়াছে—সে মনে মনে বলিয়াছে, "আমার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা আঘাত করিল, তাহাতে আমাকে চিরদিনের জন্য সংসারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বজ্রাহত গাছ প্রফুল্ল উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে?"

রমেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইল। এক জায়গায় কোথাও বেশিদিন রহিল না। সে নৌকায় চড়িয়া কাশীর ঘাটের শোভা দেখিল, সে দিল্লিতে কুতবমিনরের উপরে চড়িল, আগ্রায় জ্যোৎস্না-রাত্রে তাজ দেখিয়া আসিল। অমৃতসরে গুরুদরবার দেখিয়া রাজপুতানায় আবুপর্বতশিখরের মন্দির দেখিতে গেল—এমনি করিয়া রমেশ নিজের শরীর-মনকে আর বিশ্রাম দিল না।

অবশেষে এই ভ্রমণশ্রান্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হা হা করিতে লাগিল। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা কেবলই আঘাত দিতেছে। অবশেষে এক দিন তাহার শোককাল-যাপনের ভ্রমণ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল এবং সে একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমেশ সেই কলুটোলার গলিটার ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না। সেখানে গিয়া সে কী দেখিবে, কী শুনিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। মনের মধ্যে কেবলই একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, সেখানে একটা গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। এক দিন তো সে গলির মোড় পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা রমেশ নিজেকে জোর করিয়া সেই বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিল, বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ—ভিতরে কোনো লোক

আছে, এমন লক্ষণ নাই। তবু সেই সুখন-বেহারাটা হয়তো শূন্য বাড়ি আগলাইতেছে মনে করিয়া রমেশ বেহারাকে ডাকিয়া দ্বারে বারকতক আঘাত করিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রতিবেশী চন্দ্রমোহন তাহার ঘরের বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল— সে কহিল, "কে ও। রমেশবাবু নাকি। ভাল আছেন তো? এ বাড়িতে অন্নদা-বাবুরা তো এখন কেহ নাই।"

রমেশ। তাঁহারা কোথায় গেছেন জানেন?

চন্দ্রমোহন। সে-খবর তো বলিতে পারি না, পশ্চিমে গেছেন এই জানি।

রমেশ। কে কে গেছেন মশায়?

চন্দ্র। অন্নদাবাবু আর তাঁর মেয়ে।

রমেশ। ঠিক জানেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর কেহ যান নাই?

চন্দ্র! ঠিক জানি বই কি। যাইবার সময়ও আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে।

তখন রমেশ ধৈর্যরক্ষায় অক্ষম হইয়া কহিল, "আমি এক জনের কাছে খবর পাইয়াছি, নলিনবাবু বলিয়া একটি বাবু তাঁহাদের সঙ্গে গেছেন।"

চন্দ্র। ভুল খবর পাইয়াছেন। নলিনবাবু আপনার ওই বাসাটাতেই দিনকয়েক ছিলেন। ইহারা যাত্রা করিবার দিন-দুইচার পূর্বেই তিনি কাশীতে গেছেন।

রমেশ তখন এই নলিনবাবুটির বিবরণ প্রশ্ন করিয়া করিয়া চন্দ্রমোহনের কাছ হইতে বাহির করিল। ইহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। শোনা গেছে, পূর্বে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, এখন মাকে লইয়া কাশীতেই আছেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেন এখন কোথায় আছে বলিতে পারেন?"

চন্দ্রমোহন খবর দিল, যোগেন্দ্র ময়মনসিঙের একটি জমিদারের স্থাপিত হাই-স্কুলের হেডমাস্টারপদে নিযুক্ত হইয়া বিশাইপুরে গিয়াছে।

চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু, আপনাকে তো অনেকদিন দেখি নাই— আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন?"

রমেশ আর গোপন করিবার কারণ দেখিল না—সে কহিল, "প্র্যাকটিস করিতে গাজিপুরে গিয়াছিলাম।"

চন্দ্রমোহন। এখন তবে কি সেইখানেই থাকা হইবে?

রমেশ। না, সেখানে আমার থাকা হইল না—এখন কোথায় যাইব, ঠিক করি নাই।

রমেশ চলিয়া যাইবার অনতিকাল পরেই অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময়, মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ির তত্ত্বাবধানের জন্য অক্ষয়ের উপর ভার দিয়া গিয়াছিল। অক্ষয় যে-ভার গ্রহণ করে, তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না—তাই সে হঠাৎ যখন-তখন আসিয়া দেখিয়া যায়, বাড়ির বেহারা দুজনের মধ্যে এক জনও হাজির থাকিয়া খবরদারি করিতেছে কি না।

চন্দ্রমোহন তাহাকে কহিল, "রমেশবাবু এই খানিকক্ষণ হইল এখান হইতে চলিয়া গেলেন।"

অক্ষয়। বলেন কী? কী করিতে আসিয়াছিলেন?

চন্দ্রমোহন। তাহা তো জানি না। আমার কাছে অন্নদাবাবুদের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। এমন রোগা হইয়া গেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে চেনাই কঠিন—যদি বেহারাকে না ডাকিতেন, আমি চিনিতে পারিতাম না।

অক্ষয়। এখন কোথায় থাকেন, খবর পাইলেন?

চন্দ্রমোহন। এতদিন গাজিপুরে ছিলেন—এখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, কোথায় থাকিবেন, ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না।

অক্ষয় বলিল, "ও।" বলিয়া আপন কর্মে মন দিল।

রমেশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল, "অদৃষ্ট এ কী বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক দিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্য দিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর এই মিলন, এ যে একেবারে উপন্যাসের মতো— সেও কুলিখিত উপন্যাস। এমনতরো ঠিক উল্‌টাপাল্‌টা মিল করিয়া দেওয়া অদৃষ্টেরই মতো বে-পরোয়া রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব—সংসারে সে এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায়, যাহা ভীরু লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না।" কিন্তু রমেশ ভাবিল, এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্যাজাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই জটিল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের পক্ষে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না।

যোগেন্দ্র বিশাইপুর জমিদারবাড়ির নিকটবর্তী একটি একতলা বাড়িতে বাসা পাইয়াছিল—সেখানে রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় বাজারের একটি লোক তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। খামের উপরকার অক্ষর দেখিয়াই সে আশ্চর্য হইয়া গেল। খুলিয়া দেখিল রমেশ লিখিয়াছে—সে বিশাইপুরের একটি দোকানে অপেক্ষা করিতেছে, বিশেষ কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। রমেশকে যদিও সে এক দিন অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিল—তবু সেই বাল্যবন্ধুকে এই দূরদেশে এতদিন অদর্শনের পরে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। এমন কি, তাহার মনের মধ্যে

একটা আনন্দই হইল—কৌতূহলও কম হইল না। বিশেষত হেমনলিনী যখন কাছে নাই, তখন রমেশের দ্বারা কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় না।

পত্রবাহকটিকে সঙ্গে করিয়া যোগেন্দ্র নিজেই রমেশের সন্ধানে চলিল। দেখিল সে একটি মুদির দোকানে একটা শূন্য কেরোসিনের বাক্স খাড়া করিয়া তাহার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে;—মুদি ব্রাহ্মণের হুঁকায় তাহাকে তামাক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু চশমা-পরা বাবুটি তামাক খায় না শুনিয়া মুদি তাহাকে শহরজাত কোনো অদ্ভুতশ্রেণীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল। সেই অবধি পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকার আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা হয় নাই।

যোগেন্দ্র সবেগে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল—কহিল, "তোমার সঙ্গে পারা গেল না। তুমি আপনার দ্বিধা লইয়াই গেলে। কোথায় একেবারে সোজা আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইবে, না, পথের মধ্যে মুদির দোকানে গুড়ের বাতাসা ও মুড়ির চাকতির মাঝখানে অটল হইয়া বসিয়া আছ।"

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া একটুখানি হাসিল। যোগেন্দ্র পথের মধ্যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কহিল, "যিনিই যাই বলুন, বিধাতাকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই। তিনি আমাকে শহরের মধ্যে মানুষ করিয়া এতবড়ো শাহরিক করিয়া তুলিলেন, সে কি এই ঘোর পাড়াগাঁয়ের মধ্যে আমার জীবাত্মাটাকে একেবারে মাঠে মারিবার জন্য?"

রমেশ চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, "কেন, জায়গাটি তো মন্দ নয়।"

যোগেন্দ্র। অর্থাৎ?

রমেশ। অর্থাৎ নির্জন—

যোগেন্দ্র। সেইজন্য আমার মতো আরও একটি জনকে বাদ দিয়া এই নির্জনতা আর-একটু বাড়াইবার জন্য আমি অহরহ ব্যাকুল হইয়া আছি।

রমেশ। যাই বল, মনের শান্তির পক্ষে—

যোগেন্দ্র। ও-সব কথা আমাকে বলিয়ো না,—কয়দিন প্রচুর মনের শান্তি লইয়া আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে। আমার সাধ্যমতো এই শান্তি ভাঙিবার জন্য ত্রুটি করি নাই। ইতিমধ্যে সেক্রেটারির সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমিদারবাবুটিকেও আমার মেজাজের যে-প্রকার পরিচয় দিয়াছি, সহজে তিনি আমার উপরে আর হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন না। তিনি আমাকে দিয়া ইংরেজি খবরের কাগজে তাঁহার নকিবি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সেটা আমি তাঁকে কিছু প্রবলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি।

তবু যে টিঁকিয়া আছি, সে আমার নিজগুণে নয়। এখানকার জয়েণ্টসাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন—জমিদারটি সেইজন্য ভয়ে আমাকে বিদায় করিতে পারিতেছেন না—যেদিন গেজেটে দেখিব, জয়েণ্ট বদলি হইতেছেন, সেইদিনই বুঝিব, আমার হেডমাস্টারি-সূর্য বিশাইপুরের আকাশ হইতে অস্তমিত হইল। ইতিমধ্যে এখানে আমার একটিমাত্র আলাপী আছে—আমার পাঞ্চকুকুরটি। আর সকলেই আমার প্রতি যেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, তাহাকে কোনোমতেই শুভদৃষ্টি বলা চলে না।

যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া রমেশ একটা চৌকিতে বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, "না, বসা নয়। আমি জানি, প্রাতঃস্নান নামে তোমার একটা ঘোরতর কুসংস্কার আছে—সেটা সারিয়া এস। ইতিমধ্যে আর-এক বার গরম জলের কাতলিটা আগুনে চড়াইয়া দিই। আতিথ্যের দোহাই দিয়া আজ দ্বিতীয় বার চা খাইয়া লইব।"

এইরূপে আহার, আলাপ ও বিশ্রামে দিন কাটিয়া গেল। রমেশ যে বিশেষ কথাটা বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, যোগেন্দ্র সমস্তদিন তাহা কোনোমতেই বলিবার অবকাশ দিল না। সন্ধ্যার পরে আহারান্তে কেরোসিনের আলোকে দুই জনে দুই কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল। অদূরে শৃগাল ডাকিয়া গেল ও বাহিরে অন্ধকার রাত্রি ঝিল্লীর শব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রমেশ কহিল, "যোগেন, তুমি তো জানই, তোমাকে কী কথা বলিতে আমি এখানে আসিয়াছি। এক দিন তুমি আমাকে যে-প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে-প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। আজ আর উত্তর দিবার কোনো বাধা নাই।"

এই বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠ কম্পিত হইল—মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় সে দুই-এক মিনিট চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া শুনিল।

যখন বলা হইয়া গেল, তখন যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এই সকল কথা যদি সেদিন বলিতে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।"

রমেশ। বিশ্বাস করার হেতু তখনো যেটুকু ছিল, এখনো তাহাই আছে। সেজন্য তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যে-গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে-গ্রামে এক বার তোমাকে যাইতে হইবে। তাহার পরে সেখান হইতে কমলার মাতুলালয়েও লইয়া যাইব।

যোগেন্দ্র। আমি কোনোখানে এক পা নড়িব না—আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিব। তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভ্যাস ;—জীবনে একবারমাত্র তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া রমেশের সম্মুখে আসিল—রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুই বাল্যবন্ধু এক বার পরস্পর কোলাকুলি করিল। রমেশ রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আমি কোথা হইতে ভাগ্যরচিত এমন একটা দুশ্ছেদ্য মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা দেওয়া ছাড়া আমি কোনোদিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই। আজ যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, আর যে আমার কাহারও কাছে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি। কমলা কী জানিয়া, কী ভাবিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই—কিন্তু ইহা নিশ্চয়, মৃত্যু যদি এমন করিয়া আমাদের দুই জীবনের এই কঠিন গ্রন্থি কাটিয়া না দিত, তবে শেষকালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম, তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। মৃত্যুর গ্রাস হইতে এক দিন যে-সমস্যা অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর গর্ভেই এক দিন সেই সমস্যা তেমনি অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেল।"

যোগেন্দ্র। কমলা যে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা অসংশয়ে স্থির করিয়া বসিয়ো না। সে যাই হ'ক, তোমার এদিকটা তো পরিষ্কার হইয়া গেল, এখন নলিনাক্ষের কথা আমি ভাবিতেছি।

তাহার পরে যোগেন্দ্র নলিনাক্ষকে লইয়া পড়িল। কহিল, "আমি ও-রকম লোকদের ভালো বুঝি না এবং যাহা বুঝি না, তাহা আমি পছন্দও করি না। কিন্তু অনেক লোকের অন্যরকম মতিই দেখি, তাহারা যাহা বোঝে না, তাহাই বেশি পছন্দ করে। তাই হেমের জন্য আমার যথেষ্ট ভয় আছে। যখন দেখিলাম, সে চা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাছমাংসও খায় না, এমন কি, ঠাট্টা করিলে পূর্বের মতো তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসে না, বরং মৃদুমন্দ হাসে, তখন বুঝিলাম, গতিক ভালো নয়। যাই হ'ক, তোমাকে সহায় পাইলে তাহাকে উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাহাও আমি নিশ্চয় জানি—অতএব প্রস্তুত হও—দুই বন্ধু মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "আমি যদিও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত নই, তবু প্রস্তুত আছি।"

যোগেন্দ্র। রসো, আমার ক্রিস্টমাসের ছুটিটা আসুক।

রমেশ। সে তো দেরি আছে—ততক্ষণ আমি একলা অগ্রসর হই না কেন?

যোগেন্দ্র। না না, সেটি কোনোমতেই হইবে না। তোমাদের বিবাহটি আমিই ভাঙিয়াছিলাম, আমি নিজের হাতে তাহার প্রতিকার করিব। তুমি যে আগেভাগে গিয়া, আমার এই শুভকার্যটি চুরি করিবে, সে আমি ঘটিতে দিব না। ছুটির তো আর দশ দিন বাকি আছে।

রমেশ। তবে ইতিমধ্যে আমি এক বার—

যোগেন্দ্র। না না, সে-সব আমি কিছু শুনিতে চাই না—এ দশ দিন তুমি আমার এখানেই আছ। এখানে ঝগড়া করিবার যতগুলা লোক ছিল, সব আমি একটি একটি করিয়া শেষ করিয়াছি—এখন মুখের তার বদলাইবার জন্য এক জন বন্ধুর প্রয়োজন হইয়াছে, এ-অবস্থায় তোমাকে ছাড়িবার জো নাই। এতদিন সন্ধ্যাবেলায় কেবলই শেয়ালের ডাক শুনিয়া আসিয়াছি—এখন, এমন কি, তোমার কণ্ঠস্বরও আমার কাছে বীণাবিনিন্দিত বলিয়া মনে হইতেছে, আমার অবস্থা এতই শোচনীয়।

৪৭

চন্দ্রমোহনের কাছে রমেশের খবর পাইয়া অক্ষয়ের মনে অনেকগুলা চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কী? রমেশ গাজিপুরে প্র্যাকটিস করিতেছিল—এতদিন নিজেকে যথেষ্ট গোপনেই রাখিয়াছিল—ইতিমধ্যে এমন কী ঘটিল, যাহাতে সে সেখানকার প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়া আবার সাহসপূর্বক কলুটোলার গলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অন্নদাবাবুরা যে কাশীতে আছেন, কোন দিন রমেশ কোথা হইতে সে-খবর পাইবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হাজির হইবে।" অক্ষয় স্থির করিল, ইতিমধ্যে গাজিপুরে গিয়া সে সমস্ত সংবাদ জানিবে এবং তাহার পর এক বার কাশীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসিবে।

এক দিন অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণে অক্ষয় তাহার ব্যাগ হাতে করিয়া গাজিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু বলিয়া একটি বাঙালি উকিলের বাসা কোন দিকে?" অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাজারে রমেশবাবু নামক কোনো ব্যক্তির উকিল বলিয়া কোনো খ্যাতি নাই। তখন সে আদালতে গেল। আদালত তখন ভাঙিয়াছে। শামলা-পরা একটি বাঙালি উকিল গাড়িতে

উঠিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরি বলিয়া একটি নূতন বাঙালি উকিল গাজিপুরে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসা কোথায় জানেন ?"

অক্ষয় ইহার কাছ হইতে খবর পাইল যে,—রমেশ তো এতদিন খুড়ামশায়ের বাড়িতেই ছিল, এখন সে সেখানে আছে, কি কোথাও গেছে, তাহা বলা যায় না। তাহার স্ত্রীকে পাওয়া যাইতেছে না, সম্ভবত তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।

অক্ষয় খুড়ার বাড়িতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল,— এইবার রমেশের চালটা বুঝা যাইতেছে। স্ত্রী মারা গিয়াছে, এখন সে অসংকোচে হেমনলিনীর কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার স্ত্রী কোনোকালেই ছিল না। হেমনলিনীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে রমেশের কথা অবিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। যাহারা ধর্মনীতি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়ায়, গোপনে তাহারা যে কী ভয়ানক লোক, অক্ষয় তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল।

খুড়ার কাছে গিয়া তাঁহাকে রমেশের ও কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "আপনি যখন রমেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমার মা কমলাকে নিশ্চয় আপনি আত্মীয়ের মতোই জানেন ; কিন্তু আমি এ-কথা বলিতেছি, কয়েকদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আমি আমার নিজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রভেদ ভুলিয়া গেছি। দুদিনের জন্য মায়া বাড়াইয়া মা-লক্ষ্মী যে আমাকে এমন বজ্রাঘাত করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ কি আমি জানিতাম।"

অক্ষয় মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "এমন ঘটনাটা যে কী করিয়া ঘটিল, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই রমেশ কমলার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নাই।"

খুড়া। আপনি রাগ করিবেন না,—আপনাদের রমেশটিকে আমি আজ পর্যন্ত চিনিতে পারিলাম না। এদিকে বাহিরে তো দিব্য লোকটি, কিন্তু মনের মধ্যে কী ভাবেন, কী করেন, বুঝিবার জো নাই। নহিলে কমলার মতো অমন স্ত্রীকে কী মনে করিয়া যে অনাদর করিতেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কমলা এমন সতী-লক্ষ্মী, আমার মেয়ের সঙ্গে তার আপন বোনের মতো ভাব হইয়াছিল—তবু কখনো এক দিনের জন্যও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে নাই। আমার মেয়ে মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিত যে, সে মনের মধ্যে খুবই কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত একটি কথা বলাইতে পারে নাই। এমন স্ত্রী যে কী অসহ্য

কষ্ট পাইলে এমন কাজ করিতে পারে, তাহা তো আপনি বুঝিতেই পারেন, সে-কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। আবার আমার এমনি কপাল, আমি তখন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিলাম, নহিলে কি মা কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন।

পরদিন প্রাতে খুড়াকে লইয়া অক্ষয় রমেশের বাংলা ও গঙ্গার তীর ঘুরিয়া আসিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দেখুন মশায়, কমলা যে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আপনি যতটা নিঃসংশয় হইয়াছেন, আমি ততটা হইতে পারি নাই।"

খুড়া। আপনি কিরূপ মনে করেন ?

অক্ষয়। আমার মনে হয়, তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে ভালোরূপ খোঁজ করা উচিত।

খুড়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কথাটা নিতান্তই অসম্ভব নহে।"

অক্ষয়। নিকটেই কাশীতীর্থ। সেখানে আমাদের একটি পরম বন্ধু আছেন—এমনও হইতে পারে, কমলা তাঁহাদের কাছে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

খুড়া আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "কই, তাঁহাদের কথা তো রমেশবাবু আমাদের কখনো বলেন নাই। যদি জানিতাম, তবে কি খোঁজ করিতে বাকি রাখিতাম ?"

অক্ষয়। তবে এক বার চলুন না, আমরা দুই জনেই কাশী যাই—পশ্চিম-অঞ্চল আপনার সমস্তই জানাশোনা আছে, আপনি ভালো করিয়া খোঁজ করিতে পারিবেন।

খুড়া এ-প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত সম্মত হইলেন। অক্ষয় জানিত, তাহার কথা হেমনলিনী সহজে বিশ্বাস করিবে না, এইজন্য প্রামানিক-সাক্ষীর স্বরূপে খুড়াকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে গেল।

৪৮

শহরের বাহিরে ক্যাণ্টনমেণ্টের অধিকারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় অন্নদাবাবুরা একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন।

অন্নদাবাবুরা কাশীতে পৌঁছিয়াই খবর পাইলেন, নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমংকরীর সামান্য জরকাসি ক্রমে নিয়মোনিয়াতে দাঁড়াইয়াছে। জরের উপরেও এই শীতে তিনি নিয়মিত প্রাতঃস্নান বন্ধ করেন নাই বলিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েকদিন অশ্রান্তযত্নে হেম তাঁহার সেবা করার পর ক্ষেমংকরীর সংকটের অবস্থা কাটিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাঁহার অতিশয় দুর্বল অবস্থা। শুচিতা লইয়া অত্যন্ত বিচার থাকাতে পথ্যজল প্রভৃতি সম্বন্ধে হেমনলিনীর সাহায্য তাঁহার কোনো কাজে লাগিল না। ইতিপূর্বে তিনি স্বপাক আহার করিতেন, এখন নলিনাক্ষ স্বয়ং তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল এবং আহার সম্বন্ধে মাতার সমস্ত সেবা নলিনাক্ষকে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহাতে ক্ষেমংকরী সর্বদা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তো গেলেই হত, কেবল তোদের কষ্ট দিবার জন্যই আবার বিশ্বেশ্বর আমাকে বাঁচাইলেন।"

ক্ষেমংকরী নিজের সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চারিদিকে পারিপাট্য ও সৌন্দর্যবিন্যাসের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল। হেমনলিনী সে-কথা নলিনাক্ষের কাছ হইতে শুনিয়াছিল। এইজন্য সে বিশেষ যত্নে চারিদিক পরিপাটি করিয়া এবং ঘরদুয়ার সাজাইয়া রাখিত এবং নিজেও যত্ন করিয়া সাজিয়া ক্ষেমংকরীর কাছে আসিত। অন্নদা ক্যান্টনমেণ্টে যে বাগান ভাড়া করিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যহ ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতেন, হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর রোগশয্যার কাছে সেই ফুলগুলি নানারকম করিয়া সাজাইয়া রাখিত।

নলিনাক্ষ মাতার সেবার জন্য দাসী রাখিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু তাহাদের হস্ত হইতে সেবা গ্রহণ করিতে কোনো মতেই তাঁহার অভিরুচি হইত না। অবশ্য, জলতোলা প্রভৃতির জন্য চাকর-চাকরানী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত নিজের কাজগুলিতে বেতনভুক কোনো চাকরের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যে হরির মা ছেলেবেলায় তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে মারা গিয়া অবধি অতি বড়ো রোগের সময়েও কোনো দাসীকে তিনি পাখা করিতে বা গায়ে হাত বুলাইতে দেন নাই।

সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। দশাশ্বমেধঘাটে প্রাতঃস্নান সারিয়া পথে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় এক-এক দিন কোথা হইতে হয়তো একটি সুন্দর খোট্টার ছেলেকে অথবা কোনো ফুটফুটে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়িতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। পাড়ার দুটি-একটি সুন্দর ছেলেকে তিনি খেলনা দিয়া, পয়সা দিয়া, খাবার দিয়া বশ করিয়াছিলেন; তাহারা যখন-তখন তাঁহার বাড়ির যেখানে-সেখানে উপদ্রব করিয়া খেলিয়া বেড়াইত; ইহাতে তিনি বড়ো আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আর একটি বাতিক ছিল। ছোটোখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিস দেখিলেই তিনি না কিনিয়া

থাকিতে পারিতেন না। এ-সমস্ত তাঁহার নিজের কোনো কাজেই লাগিত না ;—কিন্তু কোন্ জিনিসটি কে পাইলে খুশি হইবে, তাহা মনে করিয়া উপহার পাঠাইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। অনেকসময় তাঁহার দূর আত্মীয়-পরিচিতেরাও এইরূপ একটা কোনো জিনিস ডাকযোগে পাইয়া আশ্চর্য হইয়া যাইত। তাঁহার একটি বড়ো আবলুস কাঠের কালো সিন্দুকের মধ্যে এইরূপ অনাবশ্যক সুন্দর শৌখিন জিনিসপত্র, রেশমের কাপড়চোপড় অনেক সঞ্চিত ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, নলিনের বউ যখন আসিবে, তখন এগুলি সমস্ত তাহারই হইবে। নলিনের একটি পরমাসুন্দরী বালিকাবধূ তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—তাহাকে তিনি সাজাইতেছেন-পরাইতেছেন, এই সুখচিন্তায় তাঁহার অনেক দিনের অনেক অবসর কাটিয়াছে।

তিনি নিজে তপস্বিনীর মতো ছিলেন,—স্নানাহ্নিকপূজায় প্রায় দিন কাটিয়া গেলে একবেলা ফলদুধমিষ্ট খাইয়া থাকিতেন, কিন্তু নিয়মসংযমে নলিনাক্ষের এতটা নিষ্ঠা তাঁহার ঠিক মনের মধ্যে ভালো লাগিত না। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের আবার অত আচারবিচারের বাড়াবাড়ি কেন।" পুরুষমানুষদিগকে তিনি বৃহৎবালকদের মতো মনে করিতেন ;—খাওয়াদাওয়া-চালচলনে উহাদের পরিমাণবোধ বা কর্তব্যবোধ না থাকিলে সেটা যেন তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়বুদ্ধির সহিত সংগত মনে করিতেন—ক্ষমার সহিত বলিতেন, "পুরুষমানুষ কঠোরতা করিতে পারিবে কেন!" অবশ্য, ধর্ম সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের জন্য নহে, ইহাই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ যদি অন্যান্য সাধারণপুরুষের মতো কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী হইত, সতর্কতার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ এবং অসময়ে তাঁহাকে স্পর্শকরাটুকু বাঁচাইয়া চলিত, তাহা হইলে তিনি খুশিই হইতেন।

ব্যামো হইতে যখন সারিয়া উঠিলেন, ক্ষেমংকরী দেখিলেন, হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদেশ অনুসারে নানাপ্রকার নিয়মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, বৃদ্ধ অন্নদাবাবুও নলিনাক্ষের সকল কথা প্রবীণ গুরুবাক্যের মতো বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অবধান করিয়া শুনিতেছেন।

ইহাতে ক্ষেমংকরীর অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল। তিনি এক দিন হেমনলিনীকে ডাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরও খ্যাপাইয়া তুলিবে। ওর ও-সমস্ত পাগলামির কথা তোমরা শোন কেন? তোমরা সাজগোজ করিয়া হাসিয়া-খেলিয়া আমোদ-আহ্লাদে বেড়াইবে,—তোমাদের কি

এখন সাধন করিবার বয়স? যদি বল, তুমি কেন বরাবর এই সব লইয়া আছ? তার একটু কথা আছে। আমার বাপ-মা বড়ো নিষ্ঠাবান ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে আমরা ভাইবোনেরা এই সকল শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। এ যদি আমরা ছাড়ি তো আমাদের দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় থাকে না। কিন্তু তোমরা তো সে-রকম নও—তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা তো সমস্তই আমি জানি। তোমরা এ যা-কিছু করিতেছ, এ কেবল জোর করিয়া করিতেছ—তাহাতে লাভ কী মা। যে যাহা পাইয়াছে, সে তাহাই ভালো করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক, আমি তো এই বলি। না না, ও সব কিছু নয়—ও-সমস্ত ছাড়ো। তোমাদের আবার নিরামিষ খাওয়া কি, যোগতপই বা কিসের! আর নলিনই বা এতবড়ো গুরু হইয়া উঠিল কবে? ও এ-সকলের কী জানে? ও তো সেদিন পর্যন্ত যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়াইয়াছে, শাস্ত্রের কথা শুনিলে একেবারে মারমূর্তি ধরিত। আমাকেই খুশি করিবার জন্য এই সমস্ত আরম্ভ করিল, শেষকালে দেখিতেছি, কোন্‌দিন পুরা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবে। আমি ওকে বার বার করিয়া বলি, 'ছেলেবেলা হইতে তোর যা বিশ্বাস ছিল, তুই তাই লইয়াই থাক্,—সে তো মন্দ কিছু নয়, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।' শুনিয়া নলিন হাসে—ওই ওর একটি স্বভাব—সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিয়া যায়—গাল দিলেও উত্তর করে না।"

অপরাহ্ণে পাঁচটার পর হেমনলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে এই সমস্ত আলোচনা চলিত। হেমের খোঁপা-বাঁধা ক্ষেমংকরীর পছন্দ হইত না। তিনি বলিতেন, "তুমি বুঝি মনে কর মা, আমি নিতান্তই সেকেলে, এখনকার কালের ফ্যাশান কিছুই জানি না। কিন্তু আমি যতরকম চুলবাঁধা জানি, এত তোমরাও জান না বাছা। একটি বেশ ভালো মেম পাইয়াছিলাম, সে আমাকে সেলাই শেখাইতে আসিত, সেই সঙ্গে কতরকম চুলবাঁধাও শিখিয়াছিলাম। সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কী করিব মা, সংস্কার, উহার ভালোমন্দ জানি না—না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই-ছুঁই করি, কিছু মনে করিয়ো না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়—ও কেবল একটা অভ্যাস। নলিনদের বাড়িতে যখন অন্যরূপ মত হইল, হিন্দুয়ানি ঘুচিয়া গেল, তখন তো আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কোনো কথাই বলি নাই—আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে, যাহা ভালো বোঝ করো—আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, এতকাল যাহা করিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়িতে পারিব না।" বলিতে বলিতে ক্ষেমংকরী চোখের এক ফোঁটা জল তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

এমনি করিয়া, হেমনলিনীর খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রত্যহ নূতন-নূতন রকম বিনানি করিতে ক্ষেমংকরীর ভারি ভালো লাগিত। এমনও হইয়াছে, তিনি তাঁহার সেই আবলুসকাঠের সিন্দুক হইতে নিজের পছন্দসই-রঙের কাপড় বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন। মনের মতো করিয়া সাজাইতে তাঁহার বড়ো আনন্দ। প্রায়ই প্রতিদিন হেমনলিনী তাহার সেলাই আনিয়া ক্ষেমংকরীর কাছে দেখাইয়া লইয়া যাইত—ক্ষেমংকরী তাহাকে নূতন-নূতন রকমের সেলাই সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ-সমস্তই তাঁহার সন্ধ্যার সময়কার কাজ ছিল। বাংলা মাসিকপত্র এবং গল্পের বই পড়িতেও উৎসাহ অল্প ছিল না। হেমনলিনীর কাছে যাহা-কিছু বই এবং কাগজ ছিল, সমস্তই সে ক্ষেমংকরীর কাছে আনিয়া দিয়াছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমংকরীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য হইয়া যাইত—ইংরেজি না শিখিয়া যে এমন বুদ্ধিবিচারের সহিত চিন্তা করা যায়, হেমের তাহা ধারণাই ছিল না। নলিনাক্ষের মাতার কথাবার্তা এবং সংস্কার-আচরণ সমস্তটা লইয়া হেমনলিনীর তাঁহাকে বড়োই আশ্চর্য স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই নয়, সমস্তই অপ্রত্যাশিত।

৪৯

ক্ষেমংকরী পুনর্বার জ্বরে পড়িলেন। এবারকার জ্বর অল্পের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। সকালবেলায় নলিনাক্ষ প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইবার সময় বলিল, "মা, তোমাকে কিছুকাল রোগীর নিয়মে থাকিতে হইবে। দুর্বল শরীরের উপর কঠোরতা সহ্য হয় না।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আমি রোগীর নিয়মে থাকিব, আর তুমিই যোগীর নিয়মে থাকিবে। নলিন, তোমার ও-সমস্ত আর বেশিদিন চলিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে এবার বিবাহ করিতেই হইবে।"

নলিনাক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "দেখো বাছা, আমার এ শরীর আর গড়িবে না—এখন তোমাকে আমি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে মনের সুখে মরিতে পারিব। আগে মনে করিতাম, একটি ছোটো ফুটফুটে বউ আমার ঘরে আসিবে, আমি তাহাকে নিজের হাতে শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিব, তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া মনের সুখে থাকিব। কিন্তু এবার ব্যামোর সময় ভগবান আমাকে চৈতন্য দিয়াছেন। নিজের আয়ুর উপরে এতটা বিশ্বাস

রাখা চলে না, আমি কবে আছি কবে নাই, তার ঠিকানা কী। একটি ছোটো মেয়েকে তোমার ঘাড়ের উপর ফেলিয়া গেলে সে আরও বেশি মুশকিল হইবে। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের মতে বড়ো-বয়সের মেয়েই বিবাহ করো। জ্বরের সময় এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার রাত্রে ঘুম হইত না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, এই আমার শেষ কাজ বাকি আছে—এইটি সম্পন্ন করিবার অপেক্ষাতেই আমাকে বাঁচিতে হইবে, নহিলে আমি শান্তি পাইব না।"

নলিনাক্ষ। আমাদের সঙ্গে মিশ খাইবে, এমন পাত্রী পাইব কোথায় ?

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আচ্ছা, সে আমি ঠিক করিয়া তোমাকে বলিব এখন—সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

আজ পর্যন্ত ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর সম্মুখে বাহির হন নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী—তাহার 'পরে আমার বড়োই স্নেহ পড়িয়াছে। আমার নলিনকে তো আপনারা জানেন, সে ছেলের কোনো দোষ কেহ দিতে পারিবে না—ডাক্তারিতেও তাহার বেশ নাম আছে। আপনার মেয়ের জন্য এমনতরো সম্বন্ধ কি শীঘ্র খুঁজিয়া পাইবেন ?"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কী। এমনতরো কথা আশা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। নলিনাক্ষের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে তার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার কী হইতে পারে। কিন্তু তিনি কি—"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "নলিন আপত্তি করিবে না। সে এখনকার ছেলেদের মতো নয়, সে আমার কথা মানে। আর, এর মধ্যে পীড়াপীড়ির কথাই বা কী আছে। আপনার মেয়েটিকে পছন্দ না করিবে কে ? কিন্তু এই কাজটি আমি অতি শীঘ্রই সারিতে চাই। আমার শরীরের গতিক আমি ভালো বুঝিতেছি না।"

সে-রাত্রে অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া বাড়িতে গেলেন। সেই রাত্রেই তিনি হেমনলিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, আমার শরীরও ইদানীং ভালো চলিতেছে না। তোমার একটা স্থিতি না করিয়া যাইতে পারিলে আমার মনে সুখ নাই। হেম, আমার কাছে লজ্জা করিলে চলিবে না ; তোমার মা নাই, এখন তোমার সমস্ত ভার আমারই উপরে।"

হেমনলিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, তোমার জন্য এমন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে যে, মনের

আনন্দ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না। আমার কেবলই ভয় হইতেছে, পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে। আজ নলিনাক্ষের মা নিজে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।

হেমনলিনী মুখ লাল করিয়া অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল, "বাবা, তুমি কী বল! না না, এ কখনো হইতেই পারে না।"

নলিনাক্ষকে যে কখনো বিবাহ করা যাইতে পারে, এ-সম্ভাবনার সন্দেহমাত্র হেমনলিনীর মাথায় আসে নাই—হঠাৎ পিতার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে লজ্জায়-সংকোচে অস্থির করিয়া তুলিল।

অন্নদাবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কেন হইতে পারে না?"

হেমনলিনী কহিল, "নলিনাক্ষবাবু! এও কি কখনো হয়!" এরূপ উত্তরকে ঠিক যুক্তি বলা চলে না—কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা ইহা অনেকগুণে প্রবল।

হেম আর থাকিতে পারিল না—সে বারান্দায় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি এরূপ বাধার কথা কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার ধারণা ছিল, নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেম মনে মনে খুশিই হইবে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ বিষণ্ণমুখে কেরোসিনের আলোর দিকে চাহিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য ও হেমনলিনীর জননীর অভাব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেম অনেকক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তাহার পরে ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার পিতার নিতান্ত হতাশ মুখের ভাব চোখে পড়িতেই তাহার মনে বাজিল। তাড়াতাড়ি তাহার পিতার চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, "বাবা চলো, অনেকক্ষণ খাবার দিয়াছে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

অন্নদাবাবু যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া খাবারের জায়গায় গেলেন কিন্তু ভালো করিয়া খাইতেই পারিলেন না। হেমনলিনী সম্বন্ধে সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়া গেল মনে করিয়া তিনি বড়োই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর দিক হইতেই যে এত-বড়ো ব্যাঘাত আসিল, ইহাতে তিনি অত্যন্ত দমিয়া গেছেন। আবার তিনি ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবিলেন, "হেম তবে এখনো রমেশকে ভুলিতে পারে নাই।"

অন্যদিন আহারের পরেই অন্নদাবাবু শুইতে যাইতেন, আজ বারান্দায় ক্যামবিসের কেদারার উপরে বসিয়া বাড়ির বাগানের সম্মুখবর্তী ক্যান্টনমেণ্টের নির্জন রাস্তার

দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেমনলিনী আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "বাবা, এখানে বড়ো ঠাণ্ডা, শুইতে চলো।"

অন্নদা কহিলেন, "তুমি শুইতে যাও, আমি একটু পরেই যাইতেছি।"

হেমনলিনী চুপ করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার খানিক বাদেই কহিল, "বাবা, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না হয় বসিবার ঘরেই চলো।"

তখন অন্নদাবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কিছু না বলিয়া শুইতে গেলেন।

পাছে তাহার কর্তব্যের ক্ষতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া নিজেকে পীড়িত হইতে দেয় না। এজন্য এ-পর্যন্ত সে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে যখন টান পড়ে, তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কি ভাবে চলিবে, তাহা এ-পর্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না—এই কারণেই একটা সুদৃঢ় কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে গুরু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখনি বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে, তখনি সে বুঝিতে পারে, সে-বন্ধন কি কঠিন। তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।

৫০

এদিকে ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তোমার পাত্রী ঠিক করিয়াছি।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ ?"

ক্ষেমংকরী। তা নয় তো কী ? আমি কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব ? তা শোনো, আমি হেমনলিনীকেই পছন্দ করিয়াছি – অমন মেয়ে আর পাইব না। রংটা তেমন ফরসা নয় বটে, কিন্তু—

নলিনাক্ষ। দোহাই মা, আমি রং ফরসার কথা ভাবিতেছি না। কিন্তু হেমনলিনীর সঙ্গে কেমন করিয়া হইবে ? সে কি কখনো হয় ?

ক্ষেমংকরী। ও আবার কী কথা। না হইবার তো কোনো কারণ দেখি না।

নলিনাক্ষের পক্ষে ইহার জবাব দেওয়া বড়ো মুশকিল। কিন্তু হেমনলিনী—এতদিন

যাহাকে কাছে লইয়া অসংকোচে গুরুর মতো উপদেশ দিয়া আসিয়াছে—হঠাৎ তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাক্ষকে যেন লজ্জা আঘাত করিল।

নলিনাক্ষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এবারে আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনিব না। আমার জন্য তুমি যে এই বয়সে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কাশীবাসী হইয়া তপস্যা করিতে থাকিবে, সে আমি আর কিছুতেই সহ্য করিব না। এইবারে যেদিন শুভদিন আসিবে, সেদিন ফাঁক যাইবে না, এ আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

নলিনাক্ষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়ো না। যে-ঘটনার কথা বলিতেছি, সে আজ নয়-দশ মাস হইয়া গেল, এখন তাহা লইয়া উতলা হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার যে-রকম স্বভাব মা, একটা অমঙ্গল কাটিয়া গেলেও তাহার ভয় তোমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। এইজন্যই কতদিন তোমাকে বলিব-বলিব করিয়াও বলিতে পারি নাই। আমার গ্রহশান্তির জন্য যত খুশি স্বস্ত্যয়ন করাইতে চাও করাইয়ো, কিন্তু অনাবশ্যক মনকে পীড়িত করিয়ো না।"

ক্ষেমংকরী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "কী জানি বাছা, কী বলিবে, কিন্তু তোমার ভূমিকা শুনিয়া আমার মন আরও অস্থির হয়। যতদিন পৃথিবীতে আছি, নিজেকে অত করিয়া ঢাকিয়া রাখা চলে না। আমি তো দূরে থাকিতে চাই, কিন্তু মন্দকে তো খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না; সে আপনিই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। তা ভালো হ'ক মন্দ হ'ক বলো তোমার কথাটা শুনি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "এই মাঘমাসে আমি রংপুরে আমার সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করিয়া, আমার বাগানবাড়িটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। সাঁড়ায় আসিয়া আমার কী বাতিক গেল, মনে করিলাম, রেলে না চড়িয়া নৌকা করিয়া কলিকাতা পর্যন্ত আসিব। সাঁড়ায় একখানা বড়ো দেশী নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দুদিনের পথ আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাঁধিয়া স্নান করিতেছি, এমন-সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বন্দুক হাতে করিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই তো সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড়ো শিকারটাই মিলিয়াছে।' সে ওই দিকেই কোথায় ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটি করিতেছিল—তাঁবুতে মফস্বল ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনেকদিন পরে দেখা, আমাকে তো কোনো-মতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ধোবাপুকুর বলিয়া একটা জায়গায় এক দিন তাহার তাঁবু পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির

হইয়াছি—নিতান্তই গণ্ডগ্রাম—একটি বৃহৎ খেতের ধারে একটা প্রাচীর-দেওয়া চালা-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য দুটি মোড়া আনিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইস্কুলে চলিতেছে। প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির গায়ে দুই পা তুলিয়া দিয়াছে। নিচে মাটিতে বসিয়া স্লেট-হাতে ছেলেরা মহা কোলাহল করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিতেছে। বাড়ীর কর্তাটির নাম তারিণী চাটুজ্জে। ভূপেনের কাছে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভালো—তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কী রকম?' ভূপেন কহিল, 'ওই তারিণী চাটুজ্জে লোকটি মহাজনী করে, এত-বড়ো কৃপণ জগতে নাই। ওই যে ইস্কুলটি বাড়িতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নূতন ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেই নিজের লোকহিতৈষিতা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইস্কুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়িতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্যন্ত সুদের হিসাব কষাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্মেণ্টের সাহায্য এবং ইস্কুলের বেতন হইতে উঠিয়া যায়। উহার একটি বোনের স্বামিবিয়োগ হইলে পর সে-বেচারা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন গর্ভিণী ছিল। এখানে আসিয়া একটি কন্যা প্রসব করিয়া নিতান্ত অচিকিৎসাতেই সে মারা যায়। আর একটি বিধবা বোন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করিয়া ঝি রাখিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মায়ের মতো মানুষ করে। মেয়েটি কিছু বড়ো হইতেই তাহারও মৃত্যু হইল। সেই অবধি মামা ও মামীর দাসত্ব করিয়া অহরহ ভর্ৎসনা সহিয়া মেয়েটি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাথার পাত্র জুটিবে কোথায়? বিশেষত উহার মা-বাপকে এখানকার কেহ জানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার জন্ম, ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁট-কর্তারা যথেষ্ট সংশয়প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারিণী চাটুজ্জের অগাধ টাকা আছে সকলেই জানে, লোকের ইচ্ছা, এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যা সম্বন্ধে খোঁটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও তো আজ চার বছর ধরিয়া এই মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অতএব, হিসাবমতো তার বয়স এখন অন্তত চৌদ্দ হইবে। কিন্তু যাই বল, মেয়েটি নামেও কমলা,—সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন সুন্দর মেয়ে আমি তো দেখি নাই। এ-গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণ যুবক উপস্থিত হইলেই তারিণী তাহাকে বিবাহের জন্য হাতে-পায়ে ধরে। যদি বা কেহ রাজি হয়, গ্রামের লোকে ভাংচি দিয়া তাড়ায়। অতএব এবারে নিশ্চয় তোমার পালা।' জান তো মা, আমার মনের অবস্থাটা

তখন একরকম মরিয়া গোছের ছিল—আমি কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, 'এ-মেয়েটিকে আমিই বিবাহ করিব।' ইহার পূর্বেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, একটি হিন্দুঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি তোমাকে চমৎকৃত করিয়া দিব—আমি জানিতাম, বড়ো বয়সের ব্রাহ্মমেয়ে আমাদের এ-ঘরে আনিলে তাহাতে সকল পক্ষই অসুখী হইবে। ভূপেন তো একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে বলিল, 'কী বল!' আমি বলিলাম, 'বলাবলি নয়, আমি একেবারেই মন স্থির করিয়াছি।' ভূপেন কহিল, 'পাকা?' আমি কহিলাম, 'পাকা।' সেই সন্ধ্যাবেলাতেই স্বয়ং তারিণী চাটুজ্জে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হাতে পইতা জড়াইয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মেয়েটি স্বচক্ষে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় তো অন্য কথা—কিন্তু শত্রুপক্ষের কথা শুনিবেন না।' আমি বলিলাম, 'দেখিবার দরকার নাই, দিন স্থির করুন।' তারিণী কহিলেন, 'পরশু দিন ভাল আছে, পরশুই হইয়া যাক।' তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়া বিবাহে যথাসাধ্য খরচ বাঁচাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বিবাহ তো হইয়া গেল।"

ক্ষেমংকরী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বিবাহ হইয়া গেল—বল কী নলিন।"

নলিনাক্ষ। হাঁ, হইয়া গেল। বধূ লইয়া নৌকাতেও উঠিলাম। যেদিন বৈকালে উঠিলাম, সেইদিনই ঘণ্টা-দুয়েক বাদে সূর্যাস্তের এক দণ্ড পরে হঠাৎ সেই অকালে ফাল্গুনমাসে কোথা হইতে অত্যন্ত গরম একটা ঘূর্ণিবাতাস আসিয়া এক মুহূর্তে আমাদের নৌকা উল্টাইয়া কী করিয়া দিল, কিছু যেন বোঝা গেল না।

ক্ষেমংকরী বলিলেন, "মধুসূদন!" তাঁহার সর্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ। ক্ষণকাল পরে যখন বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি নদীতে এক জায়গায় সাঁতার দিতেছি, কিন্তু নিকটে কোনো নৌকা বা আরোহীর কোনো চিহ্ন নাই। পুলিসে খবর দিয়া খোঁজ অনেক করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

ক্ষেমংকরী পাংশুবর্ণ মুখ করিয়া কহিলেন, "যাক, যা হইয়া গেছে তা গেছে, ও-কথা আমার কাছে আর কখনো বলিস নে—মনে করিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

নলিনাক্ষ। এ-কথা আমি কোনোদিনই তোমার কাছে বলিতাম না, কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া তুমি নিতান্তই জেদ করিতেছ বলিয়াই বলিতে হইল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এক বার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তুই ইহজীবনে কখনো বিবাহই করিবি না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "সেজন্য নয় মা, যদি সে-মেয়ে বাঁচিয়া থাকে ?"

ক্ষেমংকরী। পাগল হইয়াছিস ? বাঁচিয়া থাকিলে তোকে খবর দিত না ?

নলিনাক্ষ। আমার খবর সে কী জানে। আমার চেয়ে অপরিচিত তাহার কাছে কে আছে। বোধ হয় সে আমার মুখও দেখে নাই। কাশীতে আসিয়া তারিণী চাটুজ্জেকে আমার ঠিকানা জানাইয়াছি—তিনিও কমলার কোনো খোঁজ পান নাই বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন।

ক্ষেমংকরী। তবে আবার কী।

নলিনাক্ষ। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, পুরা একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।

ক্ষেমংকরী। তোমার সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আবার এক বৎসর অপেক্ষা করা কিসের জন্য ?

নলিনাক্ষ। মা, এক বৎসরের আর দেরিই বা কিসের। এখন অঘ্রান ; পৌষে বিবাহ হইতে পারিবে না—তাহার পরে মাঘটা কাটাইয়া ফাল্গুন।

ক্ষেমংকরী। আচ্ছা বেশ। কিন্তু পাত্রী ঠিক রহিল। হেমনলিনীর বাপকে আমি কথা দিয়াছি।

নলিনাক্ষ কহিল, "মা, মানুষ তো কেবল কথাটুকুমাত্রই দিতে পারে, সে-কথার সফলতা দেওয়া যাঁহার হাতে, তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিব।"

ক্ষেমংকরী। যাই হ'ক বাছা, তোমার এই ব্যাপারটা শুনিয়া এখনো আমার গা কাঁপিতেছে।

নলিনাক্ষ। সে তো আমি জানি মা, তোমার এই মন সুস্থির হইতে অনেক দিন লাগিবে। তোমার মনটা এক বার একটু নাড়া পাইলেই তাহার আন্দোলন কিছুতেই আর থামিতে চায় না। সেইজন্যই তো মা, তোমাকে এ-রকম সব খবর দিতেই চাই না।

ক্ষেমংকরী। ভালোই কর বাছা,—আজকাল আমার কী হইয়াছে জানি না,—একটা মন্দ-কিছু শুনিলেই তার ভয় কিছুতেই ঘোচে না। আমার একটা ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করে,—পাছে তাহাতে কোনো কুসংবাদ থাকে। আমিও তো তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমাকে কোনো খবর দিবার কোনো দরকার নাই ;—আমি তো মনে করি, এ-সংসারে আমি মরিয়াই গেছি, এখানকার আঘাত আমার উপরে আর কেন।

৫১

কমলা যখন গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল, শীতের সূর্য তখন রশ্মিচ্ছটাহীন ম্লান পশ্চিমাকাশের প্রান্তে নামিয়াছেন। কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগণ্ডূষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই আর-একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনোদিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই—যখন এক দিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই—বাসরঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দুই চারিটা কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও সে যেন ঘোমটার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া তেমন সুস্পষ্ট করিয়া শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই মনে আসিল না।

অনেক রাত্রে তাহার বিবাহের লগ্ন ছিল; নিতান্ত শ্রান্তশরীরে সে যে কখন কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও মনে নাই—সকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের প্রতিবেশীর বাড়ির একটি বধূ তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে —বিছানায় আর কেহই নাই। জীবনের এই শেষমুহূর্তে জীবনেশ্বরকে স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। সেদিকে একেবারে অন্ধকার—কোনো মূর্তি নাই, কোনো বাক্য নাই, কোনো চিহ্ন নাই। যে লাল চেলিটির সঙ্গে তাহার চাদরের গ্রন্থি বাঁধা হইয়াছিল—তারিণীচরণের প্রদত্ত সেই নিতান্ত অল্পদামের চেলির মূল্য তো কমলা জানিত না—সে চেলিখানিও সে যত্ন করিয়া রাখে নাই।

রমেশ হেমনলিনীকে যে-চিঠি লিখিয়াছিল, সেখানি কমলার আঁচলের প্রান্তে বাঁধা ছিল—সেই চিঠি খুলিয়া বালুতটে বসিয়া তাহার একটি অংশ গোধূলির আলোকে পড়িতে লাগিল। সেই অংশে তাহার স্বামীর পরিচয় ছিল,—বেশি কথা নয়, কেবল তাঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, আর তিনি যে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন ও এখন সেখানে তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় না—এইটুকুমাত্র। চিঠির বাকি অংশ সে অনেক সন্ধান করিয়াও পায় নাই। "নলিনাক্ষ" এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল,—এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে

স্নিগ্ধ করিয়া দিল—মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, "এ তো শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়—আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে।" তখন কমলা প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, "আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি, তখন তিনি কখনোই যান নাই, তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভগবান আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে তাহার রুমালে বাঁধা চাবির গোছা সেইখানেই ফেলিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রমেশের দেওয়া একটা ব্রোচ তাহার কাপড়ে বেঁধানো আছে। সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পরে পশ্চিমে মুখ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল—কোথায় যাইবে, কী করিবে, তাহা তাহার মনে স্পষ্ট ছিল না—কেবল সে জানিয়াছিল, তাহাকে চলিতেই হইবে, এখানে তাহার এক মুহূর্ত দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শীতের দিনান্তের আলোকটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা বালুতট অস্পষ্টভাবে ধূ ধূ করিতে লাগিল, হঠাৎ একজায়গায় কে যেন বিচিত্র রচনাবলীর মাঝখান হইতে সৃষ্টির খানিকটা চিত্রলেখা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি তাহার সমস্ত নির্নিমেষ তারা লইয়া এই জনশূন্য নদীতীরের উপর অতি ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কমলা সম্মুখে গৃহহীন অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে জানিল, তাহাকে চলিতেই হইবে—কোথাও পৌঁছিবে কি না, তাহা ভাবিবার সামর্থ্যও তাহার নাই।

বরাবর নদীর ধার দিয়া সে চলিবে, এই সে স্থির করিয়াছে—তাহা হইলে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না এবং যদি বিপদ তাহাকে আক্রমণ করে, তবে মুহূর্তের মধ্যেই মা গঙ্গা তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

আকাশে কুহেলিকার লেশমাত্র ছিল না। অনাবিল অন্ধকার কমলাকে আবৃত করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে বাধা দিল না।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যবের খেতের প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া গেল। কমলা বহুদূর চলিতে চলিতে বালুর চর শেষ হইয়া মাটির ডাঙা আরম্ভ হইল। নদীর ধারেই একটা গ্রাম দেখা গেল। কমলা কম্পিতবক্ষে গ্রামের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্রামটি সুষুপ্ত। ভয়ে ভয়ে গ্রামটি পার হইয়া চলিতে চলিতে তাহার

শরীরে আর শক্তি রহিল না। অবশেষে এক জায়গায় এমন একটা ভাঙাতটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে সম্মুখে আর কোনো পথ পাইল না। নিতান্ত অশক্ত হইয়া একটা বটগাছের তলায় শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্রই কখন নিদ্রা আসিল, জানিতেও পারিল না।

প্রত্যুষেই চোখ মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোকে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তুমি কে গা? শীতের রাত্রে এই গাছের তলায় কে শুইয়া?"

কমলা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, তাহার অদূরে ঘাটে দুখানা বজরা বাঁধা রহিয়াছে—এই প্রৌঢ়াটি লোক উঠিবার পূর্বেই স্নান সারিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

প্রৌঢ়া কহিলেন, "হাঁ গা, তোমাকে যে বাঙালির মতো দেখিতেছি।"

কমলা কহিল, "আমি বাঙালি।"

প্রৌঢ়া। এখানে পড়িয়া আছ যে?

কমলা। আমি কাশীতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি। রাত অনেক হইল, ঘুম আসিল, এইখানেই শুইয়া পড়িলাম।

প্রৌঢ়া। ওমা সে কী কথা! হাঁটিয়া কাশী যাইতেছ? আচ্ছা চলো, ওই বজরায় চলো, আমি স্নান সারিয়া আসিতেছি।

স্নানের পর এই স্ত্রীলোকটির সহিত কমলার পরিচয় হইল।

গাজিপুরে যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়িতে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ হইতেছিল, তাঁহারা ইহাদের আত্মীয়। এই প্রৌঢ়াটির নাম নবীনকালী এবং ইহার স্বামীর নাম মুকুন্দলাল দত্ত—কিছুকাল কাশীতেই বাস করিতেছেন। ইহারা আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ পাছে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিতে বা খাইতে হয়, এইজন্য বোটে করিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহবাড়ির কর্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করাতে নবীনকালী বলিয়াছিলেন, "জানই তো ভাই, কর্তার শরীর ভালো নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়িতে গোরু রাখিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া সেই মাখনমারা ঘিয়ে উঁহার লুচি তৈরি হয়,—আবার সে-গোরুকে যা-তা খাওয়াইলে চলিবে না"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীনকালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী?"

কমলা কহিল, "আমার নাম কমলা।"

নবীনকালী। তোমার হাতে লোহা দেখিতেছি, স্বামী আছে বুঝি?

কমলা কহিল, "বিবাহের পরদিন হইতেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন।"

নবীনকালী। ওমা, সে কী কথা। তোমার বয়স তো বড়ো বেশি বোধ হয় না।

তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "পনেরোর বেশি হইবে না।"

কমলা কহিল, "বয়স ঠিক জানি না, বোধ করি, পনেরোই হইবে।"

নবীনকালী। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে?

কমলা কহিল, "হাঁ।"

নবীনকালী কহিলেন, "তোমাদের বাড়ি কোথায়?"

কমলা। কখনো শ্বশুরবাড়ি যাই নাই, আমার বাপের বাড়ি বিশুখালি।

কমলার পিত্রালয় বিশুখালিতেই ছিল, তাহা সে জানিত।

নবীনকালী। তোমার বাপ-মা—

কমলা। আমার বাপ-মা কেহই নাই।

নবীনকালী। হরি বলো! তবে তুমি কী করিবে?

কমলা। কাশীতে যদি কোনো ভদ্র গৃহস্থ আমাকে বাড়িতে রাখিয়া দু-বেলা দুটি খাইতে দেন, তবে আমি কাজ করিব। আমি রাঁধিতে পারি।

নবীনকালী বিনা-বেতনে পাচিকা ব্রাহ্মণী লাভ করিয়া মনে মনে ভারি খুশি হইলেন। কহিলেন, "আমাদের তো দরকার নাই—বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার যে-সে বামুন হইবার জো নাই—কর্তার খাবারের একটু এদিক-ওদিক হইলে আর কি রক্ষা আছে। বামুনকে মাইনে দিতে হয় চৌদ্দ টাকা, তার উপরে ভাত-কাপড় আছে। তা হ'ক, ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ,—তা চলো, আমাদের ওখানেই চলো। কত লোক খাচ্ছে-দাচ্ছে, কত ফেলা-ছড়া যায়, আর-এক জন বাড়িলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আমাদের কাজও তেমন বেশি নয়। এখানে কেবল কর্তা আর আমি আছি। মেয়েগুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা তাহারা বেশ বড়ো ঘরেই পড়িয়াছে। আমার একটিমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন সেরাজগঞ্জে আছে, লাটসাহেবের ওখান হইতে দু-মাস অন্তর তাহার নামে চিঠি আসে, আমি কর্তাকে বলি, আমাদের নোটোর তো অভাব কিছুই নাই, কেন তাহার এই গেরো। এত বড়ো হাকিমি সকলের ভাগ্যে জোটে না, তা জানি, কিন্তু বাছাকে তবু তো সেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হয়। কেন। দরকার কী। কর্তা বলেন, 'ওগো সেজন্য নয়, সেজন্য নয়। তুমি মেয়েমানুষ, বোঝ না। আমি কি রোজগারের জন্য নোটোকে চাকরিতে দিয়াছি। আমার

অভাব কিসের। তবে কি না, হাতে একটা কাজ থাকা চাই, নহিলে অল্প বয়স, কি জানি কখন কী মতি হয়।' ”

পালে বাতাসের জোর ছিল, কাশী পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিল না। শহরের ঠিক বাহিরেই অল্প একটু বাগানওয়ালা একটি দোতলা বাড়িতে সকলে গিয়া উঠিলেন।

সেখানে চৌদ্দ টাকা বেতনের বামুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না—একটা উড়ে বামুন ছিল, অনতিকাল পরেই নবীনকালী তাহার উপরে এক দিন হঠাৎ অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিয়া বিনা বেতনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চৌদ্দ টাকা বেতনের অতি দুর্লভ দ্বিতীয় একটি পাচক জুটিবার অবকাশে কমলাকেই সমস্ত রাঁধা বাড়ার ভার লইতে হইল।

নবীনকালী কমলাকে বারবার সতর্ক করিয়া কহিলেন, “দেখো বাছা, কাশী শহর ভালো জায়গা নয়। তোমার অল্প বয়স। বাড়ির বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গাস্নান-বিশ্বেশ্বরদর্শনে আমি যখন যাইব, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।”

কমলা পাছে দৈবাৎ হাতছাড়া হইয়া যায়, নবীনকালী এজন্য তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিলেন। বাঙালি মেয়েদের সঙ্গেও তাহাকে বড়ো-একটা আলাপের অবসর দিতেন না। দিনের বেলা তো কাজের অভাব ছিল না, সন্ধ্যার পরে এক বার কিছুক্ষণ নবীনকালী তাঁহার যে ঐশ্বর্য, যে গহনাপত্র, যে সোনারুপার বাসন, যে মখমল-কিংখাবের গৃহসজ্জা চোরের ভয়ে কাশীতে আনিতে পারেন নাই, তাহারই আলোচনা করিতেন। “কাঁসার থালায় খাওয়া তো কর্তার কোনোকালে অভ্যাস নাই, তাই প্রথম-প্রথম এ লইয়া তিনি অনেক বকাবকি করিতেন। তিনি বলিতেন, ‘না হয় দু-চারখানা চুরি যায়, সেও ভালো, আবার গড়াইতে কতক্ষণ।’ কিন্তু টাকা আছে বলিয়াই যে লোকসান করিতে হইবে, সে আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারি না। তার চেয়ে বরঞ্চ কিছুকাল কষ্ট করিয়া থাকাও ভালো। এই দেখো না, দেশে আমাদের মস্ত বাড়ি, সেখানে লোক-লশকর যতই থাক আসে-যায় না, তাই বলিয়া কি এখানে সাত গণ্ডা চাকর আনা চলে? কর্তা বলেন, ‘কাছাকাছি না হয় আরও একটা বাড়ি ভাড়া করা যাইবে।’ আমি বলিলাম, ‘না, সে আমি পারিব না—কোথায় এখানে একটু আরাম করিব, না কতকগুলো লোকজন-বাড়িঘর লইয়া দিনরাত্রি ভাবনার অন্ত থাকিবে না।’ ” ইত্যাদি।

৫২

নবীনকালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাণটা যেন অল্পজল এঁদো-পুকুরের মাছের মতো ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সেদিনকার রাত্রে গৃহহীন বাহিরের পৃথিবীকে সে জানিয়াছে; সেখানে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আর তাহার সাহস হয় না।

নবীনকালী যে কমলাকে ভালোবাসিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সে ভালোবাসার মধ্যে রস ছিল না। দুই-এক দিন অসুখ-বিসুখের সময় তিনি কমলাকে যত্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-যত্ন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। বরঞ্চ সে কাজকর্মের মধ্যে থাকিত ভালো, কিন্তু যে-সময়টা নবীনকালীর সখীত্বে তাহাকে যাপন করিতে হইত, সেইটেই তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসময়।

এক দিন সকালবেলা নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, ও বামুন-ঠাকরুন, আজ কর্তার শরীর বড়ো ভালো নাই, আজ ভাত হইবে না, আজ রুটি। কিন্তু তাই বলিয়া একরাশ ঘি লইয়ো না। জানি তো তোমার রান্নার শ্রী, উহাতে এত ঘি কেমন করিয়া খরচ হইবে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। এর চেয়ে সেই যে উড়ে বামুনটা ছিল ভালো—সে ঘি লইত বটে, কিন্তু রান্নায় ঘিয়ের স্বাদ একটু-আধটু পাওয়া যাইত।"

কমলা এ-সমস্ত কথার কোনো জবাবই করিত না—যেন শুনিতে পায় নাই, এমনিভাবে নিঃশব্দে সে কাজ করিয়া যাইত।

আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল—সমস্ত পৃথিবী বিরস এবং জীবনটা দুঃসহ বোধ হইতেছিল, এমন-সময় গৃহিণীর ঘর হইতে একটা কথা তাহার কানে আসিয়া কমলাকে একেবারে চকিত করিয়া তুলিল। নবীনকালী তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "ওরে তুলসী, যা তো, শহর হইতে নলিনাক্ষ ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া আন্‌। বল্‌, কর্তার শরীর বড়ো খারাপ।"

নলিনাক্ষ ডাক্তার! কমলার চোখের উপরে সমস্ত আকাশের আলো আহত বীণার স্বর্ণতন্ত্রীর মতো কাঁপিতে লাগিল। সে তরকারি-কোটা ফেলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসী নিচে নামিয়া আসিতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছিস তুলসী?" সে কহিল, "নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকিতে যাইতেছি।"

কমলা কহিল, "সে আবার কোন্‌ ডাক্তার?"

তুলসী কহিল, "তিনি এখানকার একটি বড়ো ডাক্তার বটে।"

কমলা। তিনি থাকেন কোথায় ?

তুলসী কহিল, "শহরেই থাকেন, এখান হইতে আধ ক্রোশটাক হইবে।"

আহারের সামগ্রী অল্পস্বল্প যাহা-কিছু বাঁচাইতে পারিত, কমলা তাহাই বাড়ির চাকরবাকরদের ভাগ করিয়া দিত। এজন্য সে ভর্ৎসনা অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ-অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। বিশেষত গৃহিণীর কড়া আইন অনুসারে এ-বাড়ির লোকজনদের খাবার কষ্ট অত্যন্ত বেশি। তা ছাড়া কর্তা-গৃহিণীর খাইতে বেলা হইত—ভৃত্যেরা তাহার পরে খাইতে পাইত। তাহারা যখন আসিয়া কমলাকে জানাইত, "বামুনঠাকরুন, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে," তখন সে তাহাদিগকে কিছু-কিছু খাইতে না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারিত না। এমনি করিয়া বাড়ির চাকরবাকর দুই দিনেই কমলার একান্ত বশ মানিয়াছে।

উপর হইতে রব আসিল, "রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে রে তুলসী। আমার বুঝি চোখ নাই মনে করিস। শহরে যাইবার পথে এক বার বুঝি রান্নাঘর না মাড়াইয়া গেলে চলে না। এমনি করিয়াই জিনিসপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে। বলি বামুনঠাকরুন, রাস্তায় পড়িয়াছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাম, এমনি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বুঝি।"

সকলেই তাহার জিনিসপত্র চুরি করিতেছে, এই সন্দেহ নবীনকালীকে কিছুতেই ত্যাগ করে না। যখন প্রমাণের লেশমাত্রও না থাকে, তখনো তিনি আন্দাজে ভর্ৎসনা করিয়া লন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অন্ধকারে ঢেলা মারিলেও অধিকাংশ ঢেলা ঠিক জায়গায় গিয়া পড়ে, আর তিনি যে সর্বদা সতর্ক আছেন ও তাঁহাকে ফাঁকি দিবার জো নাই, ভৃত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে।

আজ নবীনকালীর তীব্রবাক্য কমলার মনেও বাজিল না। সে আজ কেবল কলের মতো কাজ করিতেছে, তাহার মনটা যে কোন্‌খানে উধাও হইয়া গেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

নিচে রান্নাঘরের দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় তুলসী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুলসী, কই ডাক্তারবাবু আসিলেন না ?"

তুলসী কহিল, "না, তিনি আসিলেন না।"

কমলা। কেন ?

তুলসী। তাঁহার মার অসুখ করিয়াছে।

কমলা। মার অসুখ? ঘরে আর কি কেহ নাই?

তুলসী। না, তিনি তো বিবাহ করেন নাই।

কমলা। বিবাহ করেন নাই, তুই কেমন করিয়া জানিলি?

তুলসী। চাকরদের মুখে তো শুনি, তাঁহার স্ত্রী নাই।

কমলা। হয়তো তাঁহার স্ত্রী মারা গেছে।

তুলসী। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চাকর ব্রজ বলে, তিনি যখন রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, তখনো তাঁহার স্ত্রী ছিল না।

উপর হইতে ডাক পড়িল, "তুলসী।" কমলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং তুলসী উপরে চলিয়া গেল।

নলিনাক্ষ—রংপুরে ডাক্তারি করিতেন - কমলার মনে আর তো কোনো সন্দেহ নাই। তুলসী নামিয়া আসিলে পুনর্বার কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্‌, তুলসী ডাক্তারবাবুর নামে আমার একটি আত্মীয় আছেন—বল্‌ দেখি, উনি ব্রাহ্মণ তো বটেন?"

তুলসী। হাঁ, ব্রাহ্মণ, চাটুজ্জে।

গৃহিণীর দৃষ্টিপাতের ভয়ে তুলসী বামুনঠাকরুনের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে সাহস করিল না—সে চলিয়া গেল।

কমলা নবীনকালীর নিকট গিয়া কহিল, "কাজকর্ম সমস্ত সারিয়া আজ আমি এক বার দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া আসিব।"

নবীনকালী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। কর্তার আজ অসুখ, আজ কখন কী দরকার হয়, তাহা বলা যায় না—আজ তুমি গেলে চলিবে কেন?

কমলা কহিল, "আমার একটি আপনার লোক কাশীতে আছেন খবর পাইয়াছি, তাঁহাকে এক বার দেখিতে যাইব।"

নবীনকালী। এ-সব ভালো কথা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আমি এ-সব বুঝি। খবর তোমাকে কে আনিয়া দিল? তুলসী বুঝি? ও ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয়। শোনো বলি বামুনঠাকরুন, আমার কাছে যতদিন আছ, ঘাটে একলা স্নান করিতে যাওয়া, আত্মীয়ের সন্ধানে শহরে বাহির হওয়া, ও-সমস্ত চলিবে না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।

দরোয়ানের উপর হুকুম হইয়া গেল, তুলসীকে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন এ-বাড়ি মুখো হইতে না পারে।

গৃহিণীর শাসনে অন্যান্য চাকরেরা কমলার সংস্রব যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিল।

নলিনাক্ষ সম্বন্ধে যতদিন কমলা নিশ্চিত ছিল না, ততদিন তাহার ধৈর্য ছিল; এখন তাহার পক্ষে ধৈর্যরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই নগরেই তাহার স্বামী রহিয়াছেন, অথচ সে এক মুহূর্তও যে অন্যের ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। কাজকর্মে তাহার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল।

নবীনকালী কহিলেন, "বলি বামুনঠাকরুন, তোমার গতিক তো ভালো দেখি না। তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে? তুমি নিজে তো খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছ, আমাদিগকেও কি উপোস করাইয়া মারিবে? আজকাল তোমার রান্না যে আর মুখে দেবার জো নাই।"

কমলা কহিল, "আমি এখানে আর কাজ করিতে পারিতেছি না—আমার কোনোমতে মন টিকিতেছে না। আমাকে বিদায় দিন।"

নবীনকালী ঝংকার দিয়া বলিলেন, "বটেই তো। কলিকালে কাহারও ভালো করিতে নাই। তোমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যে আমার এতকালের অমন ভালো বামুনটাকে ছাড়াইয়া দিলাম, এক বারও খবর লইলাম না, তুমি সত্যি বামুনের মেয়ে কি না। আজ উনি বলেন কিনা, আমাকে বিদায় দিন। যদি পালাইবার চেষ্টা কর তো পুলিসে খবর দিব না! আমার ছেলে হাকিম—তার হুকুমে কত লোক ফাঁসি গেছে—আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না। শুনেইছ তো—গদা কর্তার মুখের উপরে জবাব দিতে গিয়াছিল, সে-বেটা এমনি জব্দ হইয়াছে, আজও সে জেল খাটিতেছে। আমাদের তুমি যেমন-তেমন পাও নাই।"

কথাটা মিথ্যা নহে—গদা চাকরকে ঘড়িচুরির অপবাদ দিয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে বটে।

কমলা কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহার চিরজীবনের সার্থকতা যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, তখন সেই হাতে বাঁধন পড়ার মতো এমন নিষ্ঠুর আর কী হইতে পারে। কমলা আপনার কাজের মধ্যে, ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর তো বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার রাত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলে পর সে শীতে একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িত। প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া, যে-পথ শহরের দিকে চলিয়া গেছে, সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার যে তরুণ হৃদয়খানি সেবার জন্য ব্যাকুল, ভক্তিনিবেদনের জন্য ব্যগ্র,—সেই হৃদয়কে কমলা এই রজনীর নির্জন পথ বাহিয়া নগরের মধ্যে কোন্ এক অপরিচিত গৃহের উদ্দেশে প্রেরণ করিত—তাহার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার শয়নকক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু এইটুকু সুখ, এইটুকু স্বাধীনতাও কমলার বেশিদিন রহিল না। রাত্রির সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেলেও এক দিন কী কারণে নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেহারা আসিয়া খবর দিল, "বামুনঠাকরুনকে দেখিতে পাইলাম না।"

নবীনকালী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কী রে, তবে পালাইল নাকি ?"

নবীনকালী নিজে সেই রাত্রে আলো ধরিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়া আসিলেন, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দবাবু অর্ধনিমীলিতনেত্রে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন—তাঁহাকে গিয়া কহিলেন, "ওগো শুনছ, বামুনঠাকরুন বোধ করি পালাইল।"

ইহাতেও মুকুন্দবাবুর শান্তিভঙ্গ করিল না—তিনি কেবল আলস্যজড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "তখনি তো বারণ করিয়াছিলাম—জানাশোনা লোক নয়। কিছু সরাইয়াছে নাকি ?"

গৃহিণী কহিলেন, "সেদিন তাহাকে যে শীতের কাপড়খানা পরিতে দিয়াছিলাম, সেটা তো ঘরে নাই, এ ছাড়া আর কী গিয়াছে, এখনো দেখি নাই।"

কর্তা অবিচলিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "পুলিসে খবর দেওয়া যাক।"

এক জন চাকর লণ্ঠন লইয়া পথে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কমলা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নবীনকালী সে-ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। কোনো জিনিস চুরি গেছে কি না, তাহাই তিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-সময় কমলাকে হঠাৎ দেখিয়া নবীনকালী বলিয়া উঠিলেন, "বলি, কী কাণ্ডটাই করিলে ? কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ?"

কমলা কহিল, "কাজ শেষ করিয়া আমি একটুখানি বাগানে বেড়াইতেছিলাম।"

নবীনকালী মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া গেলেন। বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকর দরজার কাছে আসিয়া জড়ো হইল।

কমলা কোনোদিন নবীনকালীর কোনো ভর্ৎসনায় তাঁহার সম্মুখে অশ্রুবর্ষণ করে নাই। আজও সে কাঠের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনকালীর বাক্যবর্ষণ একটুখানি ক্ষান্ত হইবামাত্র কমলা কহিল, "আমার প্রতি আপনারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—আমাকে বিদায় করিয়া দিন।"

নবীনকালী। বিদায় তো করিবই। তোমার মতো অকৃতজ্ঞকে চিরদিন ভাত-কাপড় দিয়া পুষিব, এমন কথা মনেও করিয়ো না। কিন্তু কেমন লোকের হাতে পড়িয়াছ, সেটা আগে ভালো করিয়া জানাইয়া তবে বিদায় দিব।

ইহার পর হইতে কমলা বাহিরে যাইতে আর সাহস করিত না। সে ঘরের

মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে মনে এই কথা বলিল, "যে-লোক এত দুঃখ সহ্য করিতেছে, ভগবান নিশ্চয় তাহার একটা গতি করিয়া দিবেন।"

মুকুন্দবাবু তাঁহার দুইটি চাকর সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। বাড়িতে প্রবেশের দরজায় ভিতর হইতে হুড়কা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দ্বারের কাছে রব উঠিল, "মুকুন্দবাবু ঘরে আছেন কি?"

নবীনকালী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই গো, নলিনাক্ষ ডাক্তার আসিয়াছেন। বুধিয়া, বুধিয়া।"

বুধিয়া-নামধারিণীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন নবীনকালী কহিলেন, "বামুনঠাকরুন, যাও তো, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও গে। ডাক্তারবাবুকে বলো, কর্তা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, এখনি আসিবেন—একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

কমলা লণ্ঠন লইয়া নিচে নামিয়া গেল;—তাহার পা কাঁপিতেছে, তাহার বুকের ভিতর গুর গুর করিতেছে, তাহার করতল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে এই বিষম ব্যাকুলতায় সে চোখে ভালো করিয়া দেখিতে না পায়।

কমলা ভিতর হইতে হুড়কা খুলিয়া দিয়া ঘোমটা টানিয়া কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইল।

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কর্তা ঘরে আছেন কি?"

কমলা কোনোমতে কহিল, "না, আপনি আসুন।"

নলিনাক্ষ বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। ইতিমধ্যে বুধিয়া আসিয়া কহিল, "কর্তাবাবু বেড়াইতে গেছেন, এখনি আসিবেন, আপনি একটু বসুন।"

কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। যেখান হইতে নলিনাক্ষকে স্পষ্ট দেখা যাইবে, অন্ধকার বারান্দার এমন একটা জায়গা সে আশ্রয় করিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল। তাহার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্যের সঙ্গে শীতের হাওয়া যোগ দিয়া তাহাকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল।

নলিনাক্ষ কেরোসিন-আলোর পাশে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া কী ভাবিতেছিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে বার বার জল আসিতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া সে তাহার একাগ্রদৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ওই যে উন্নতললাট শুভ্র মুখখানির উপরে দীপালোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ওই মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল;—বিশ্বজগতের মধ্যে আর কিছুই রহিল না, কেবল ওই আলোকিত মুখখানি রহিল—যাহার সম্মুখে রহিল, সেও ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কমলা সচেতন কি অচেতন ছিল, তাহা বলা যায় না—এমন-সময় হঠাৎ সে চকিত হইয়া দেখিল, নলিনাক্ষ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মুকুন্দবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে।

এখনি পাছে উঁহারা বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন এবং কমলা ধরা পড়ে এই ভয়ে কমলা বারান্দা ছাড়িয়া নিচে তাহার রান্নাঘরে গিয়া বসিল। রান্নাঘরটি প্রাঙ্গণের এক ধারে, এবং এই প্রাঙ্গণটি বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ।

কমলা সর্বাঙ্গমনে পুলকিত হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার মতো হতভাগিনীর এমন স্বামী! দেবতার মতো এমন সৌম্য-নির্মল প্রসন্ন-সুন্দর মূর্তি! ওগো ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে।"

বলিয়া বার বার করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল।

সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার পদশব্দ শোনা গেল। কমলা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে দ্বারের পাশে দাঁড়াইল। বুধিয়া আলো ধরিয়া আগে আগে চলিল, তাহার অনুসরণ করিয়া নলিনাক্ষ বাহির হইয়া গেল।

কমলা মনে মনে কহিল, "তোমার শ্রীচরণের সেবিকা হইয়া এইখানে পরের দ্বারে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া আছি, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে, তবু জানিতেও পারিলে না।"

মুকুন্দবাবু অন্তঃপুরে আহার করিতে গেলে কমলা আস্তে আস্তে সেই বসিবার ঘরে গেল। যে-চৌকিতে নলিনাক্ষ বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে ভূমিতে ললাট ঠেকাইয়া সেখানকার ধূলি চুম্বন করিল। সেবা করিবার অবকাশ না পাইয়া অবরুদ্ধ ভক্তিতে কমলার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন কমলা সংবাদ পাইল, বায়ুপরিবর্তনের জন্য ডাক্তারবাবু কর্তাকে সুদূর পশ্চিমে কাশীর চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাই আজ হইতে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

কমলা নবীনকালীকে গিয়া কহিল, "আমি তো কাশী ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

নবীনকালী। আমরা পারিব, আর তুমি পারিবে না! বড়ো ভক্তি দেখিতেছি।

কমলা। আপনি যাহাই বলুন, আমি এখানেই থাকিব।

নবীনকালী। আচ্ছা, তা কেমন থাক, দেখা যাইবে।

কমলা কহিল, "আমাকে দয়া করুন, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না।"

নবীনকালী। তুমি তো বড়ো ভয়ানক লোক দেখিতেছি। ঠিক যাবার সময় বাহানা ধরিলে। আমরা এখন তাড়াতাড়ি লোক কোথায় খুঁজিয়া পাই। আমাদের কাজ চলিবে কী করিয়া।

কমলার অনুনয়-বিনয় সমস্ত ব্যর্থ হইল—কমলা তাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবানকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫৩

যেদিন সন্ধ্যার সময় নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ লইয়া হেমনলিনীর সঙ্গে অন্নদাবাবুর আলোচনা হইয়াছিল, সেইদিন রাত্রেই অন্নদাবাবুর আবার সেই শূলবেদনা দেখা দিল।

রাত্রিটা কষ্টে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে তাঁহার বেদনার উপশম হইলে তিনি তাঁহার বাড়ির বাগানে রাস্তার নিকটে শীতপ্রভাতের তরুণ সূর্যালোকে সম্মুখে একটি টিপাই লইয়া বসিয়াছেন—হেমনলিনী সেইখানেই তাঁহাকে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গতরাত্রের কষ্টে অন্নদাবাবুর মুখ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গেছে, তাঁহার চোখের নিচে কালি পড়িয়াছে, মনে হইতেছে, যেন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে।

যখনি অন্নদাবাবুর এই ক্লিষ্ট মুখের প্রতি হেমনলিনীর চোখ পড়িতেছে, তখনি তাহার বুকের মধ্যে যেন ছুরি বিঁধিতেছে। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে হেমনলিনীর অসম্মতিতেই যে বৃদ্ধ ব্যথিত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই মনোবেদনাই যে তাঁহার পীড়ার অব্যবহিত কারণ, ইহা হেমনলিনীর পক্ষে একান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; সে যে কী করিবে, কী করিলে বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, তাহা বার বার করিয়া ভাবিয়া কোনোমতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এমন-সময় হঠাৎ খুড়াকে লইয়া অক্ষয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অক্ষয় কহিল, "আপনি

যাইবেন না, ইনি গাজিপুরের চক্রবর্তীমহাশয়, ইহাকে পশ্চিম-অঞ্চলের সকলেই জানে—আপনাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ কথা আছে।"

সেই জায়গাটাতে বাঁধানো চাতালের মতো ছিল—সেইখানে খুড়া আর অক্ষয় বসিলেন।

খুড়া কহিলেন, "শুনিলাম, রমেশবাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে—আমি তাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি তাঁহার স্ত্রীর খবর কি আপনারা কিছু পাইয়াছেন ?"

অন্নদাবাবু ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন, "রমেশ-বাবুর স্ত্রী !"

হেমনলিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, "মা, তোমরা আমাকে বোধ করি নিতান্ত সেকেলে অসভ্য মনে করিতেছ। একটু ধৈর্য ধরিয়া সমস্ত কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি খামকা গায়ে পড়িয়া পরের কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে আসি নাই। রমেশবাবু পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া স্টীমারে করিয়া যখন পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই স্টীমারেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আপনারা তো জানেন, কমলাকে যে এক বার দেখিয়াছে, সে তাহাকে কখনো পর বলিয়া মনে করিতে পারে না। আমার এই বুড়াবয়সে অনেক শোকতাপ পাইয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গেছে, কিন্তু আমার সেই মা-লক্ষ্মীকে তো কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। রমেশবাবু কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক করেন নাই—কিন্তু এই বুড়াকে দুই দিন দেখিয়াই মা কমলার এমনি স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি রমেশবাবুকে গাজিপুরে আমার বাড়িতেই উঠিতে রাজি করেন। সেখানে কমলা, আমার মেজো মেয়ে শৈলর কাছে আপন বোনের চেয়ে যত্নে ছিল। কিন্তু কী যে হইল, কিছুই বলিতে পারি না—মা যে কেন আমাদের সকলকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তাহা আজ পর্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না। সেই অবধি শৈলর চোখের জল আর কিছুতেই শুকাইতেছে না।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন, "তাঁহার কী হইল, তিনি কোথায় গেলেন ?"

খুড়া কহিলেন, "অক্ষয়বাবু, আপনি তো সকল কথা শুনিয়াছেন, আপনিই বলুন। বলিতে গেলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

অক্ষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল। নিজে কোনোপ্রকার টীকা করিল না, কিন্তু তাহার বর্ণনায় রমেশের চরিত্রটি রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না।

অন্নদাবাবু বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা তো এ-সমস্ত কথা কিছুই শুনি নাই। রমেশ যেদিন হইতে কলিকাতার বাহির হইয়াছেন, তাঁহার একখানি পত্রও পাই নাই।"

অক্ষয় সেই সঙ্গে যোগ দিল, "এমন কি, তিনি যে কমলাকে বিবাহ করিয়াছেন, এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানিতাম না। আচ্ছা চক্রবর্তীমহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কমলা রমেশের স্ত্রী তো বটেন? ভগ্নী বা আর কোনো আত্মীয়া তো নহেন?"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আপনি বলেন কী অক্ষয়বাবু? স্ত্রী নহেন তো কী। এমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে জোটে?"

অক্ষয় কহিল, "কিন্তু আশ্চর্য এই যে, স্ত্রী যত ভালো হয়, তাহার অনাদরও তত বেশি হইয়া থাকে। ভগবান ভালো লোকদিগকেই বোধ করি সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন।" এই বলিয়া অক্ষয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অন্নদা তাঁহার বিরল কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন, "বড়ো দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা হইবার তা তো হইয়াই গেছে, এখন আর বৃথা শোক করিয়া ফল কী?"

অক্ষয় কহিল, "আমার মনে সন্দেহ হইল, যদি এমন হয়, কমলা আত্মহত্যা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন। তাই চক্রবর্তীমহাশয়কে লইয়া কাশীতে এক বার সন্ধান করিতে আসিলাম। বেশ বুঝা যাইতেছে, আপনারা কোনো খবরই পান নাই। যাহা হউক, দু-চার দিন এখানে তল্লাশ করিয়া দেখা যাক।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "রমেশ এখন কোথায় আছেন?"

খুড়া কহিলেন, "তিনি তো আমাদিগকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেছেন।"

অক্ষয় কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু লোকের মুখে শুনিলাম, তিনি কলিকাতাতেই গেছেন। বোধ করি আলিপুরে প্র্যাকটিস করিবেন। মানুষ তো আর অনন্তকাল শোক করিয়া কাটাইতে পারে না, বিশেষত তাঁহার অল্প বয়স। চক্রবর্তীমহাশয়, চলুন, শহরে এক বার ভালো করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা যাক।"

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয়, তুমি তো এই খানেই আসিতেছ?"

অক্ষয় কহিল, "ঠিক বলিতে পারি না। আমার মনটা বড়োই খারাপ হইয়া আছে অন্নদাবাবু। যত দিন কাশীতে আছি, আমাকে এই খোঁজেই থাকিতে হইবে। বলেন কী, ভদ্রলোকের মেয়ে, যদিই তিনি মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া

থাকেন, তবে আজ কী বিপদেই পড়িয়াছেন বলুন দেখি। রমেশবাবু দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি তো পারি না।"

খুড়াকে সঙ্গে লইয়া অক্ষয় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এক বার হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হেমনলিনী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া বসিয়াছিল। সে জানিত, তাহার পিতা মনে মনে তাহার জন্য আশঙ্কা অনুভব করিতেছেন।

হেমনলিনী কহিল, "বাবা, আজ এক বার ডাক্তারকে দিয়া তোমার শরীরটা ভালো করিয়া পরীক্ষা করাও। একটুতেই তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত।"

অন্নদাবাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। রমেশকে লইয়া এত বড়ো আলোচনাটার পর হেমনলিনী যে তাঁহার পীড়া লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিল, ইহাতে তাঁহার মনের মধ্য হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে তিনি নিজের পীড়ার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন—আজ কহিলেন, "সে তো বেশ কথা! শরীরটা না হয় পরীক্ষা করানোই যাক। তাহা হইলে আজ না হয় এক বার নলিনাক্ষকে ডাকিতে পাঠাই। কী বল?"

নলিনাক্ষ সম্বন্ধে হেমনলিনী একটুখানি সংকোচে পড়িয়া গেছে। পিতার সম্মুখে তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় সহজভাবে মেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে, তবু সে বলিল, "সে-ই ভালো, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিই।"

অন্নদাবাবু হেমের অবিচলিত ভাব দেখিয়া ক্রমে সাহস পাইয়া কহিলেন, "হেম, রমেশের এই সমস্ত কাণ্ড—"

হেমনলিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বাবা, রৌদ্রের ঝাঁজ বাড়িয়া উঠিয়াছে—চলো, এখন ঘরে চলো।" বলিয়া তাঁহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে আরামকেদারায় বসাইয়া তাঁহার গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া দিয়া তাঁহার হাতে এক খানি খবরের কাগজ দিল এবং চশমার খাপ হইতে চশমাটি বাহির করিয়া নিজে তাঁহার চোখে পরাইয়া দিয়া কহিল, "কাগজ পড়ো, আমি আসিতেছি।"

অন্নদাবাবু সুবাধ্য বালকের মতো হেমনলিনীর আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। হেমনলিনীর জন্য তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে এক সময় কাগজ রাখিয়া হেমের খোঁজ করিতে গেলেন—দেখিলেন, সেই প্রাতে অসময়ে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছু না বলিয়া অন্নদাবাবু বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার এক বার হেমনলিনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তখনো তাহার দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তখন শ্রান্ত অন্নদাবাবু ধপ করিয়া তাঁহার চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িয়া মুহুর্মুহু মাথার চুলগুলাকে করসঞ্চালনদ্বারা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ আসিয়া অন্নদাবাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং যথাকর্তব্য বলিয়া দিল এবং হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নদাবাবুর মনে কি বিশেষ কোনো উদ্বেগ আছে?" হেম কহিল, "তা থাকিতে পারে।"

নলিনাক্ষ কহিল, "যদি সম্ভব হয়, উঁহার মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। আমার মার সম্বন্ধেও ওই এক মুশকিলে পড়িয়াছি—তিনি একটুতেই এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার শরীর সুস্থ রাখা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য কী-একটা চিন্তা লইয়া কাল বোধ হয় সমস্তরাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। আমি চেষ্টা করি যাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হন, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে তাহা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না।"

হেমনলিনী কহিল, "আপনাকেও আজ তেমন ভালো দেখাইতেছে না।"

নলিনাক্ষ। না, আমি বেশ ভালোই আছি। মন্দ থাকা আমার অভ্যাস নয়। তবে কাল বোধ হয় কিছু রাত জাগিতে হইয়াছিল বলিয়া আজ আমাকে তেমন তাজা দেখাইতেছে না।

হেমনলিনী। আপনার মাকে সেবা করিবার জন্য সর্বদা যদি একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে থাকিত, তবে বোধ হয় ভালো হইত। আপনি একলা, আপনার কাজকর্ম আছে, কী করিয়া আপনি উঁহার শুশ্রূষা করিয়া উঠিবেন?

এ কথাটা হেমনলিনী সহজ ভাবেই বলিয়াছিল, কথাটা সংগত, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু বলার পরেই হঠাৎ তাহাকে লজ্জা আক্রমণ করিল, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—তাহার সহসা মনে হইল, নলিনাক্ষবাবু যদি কিছু মনে করেন। অকস্মাৎ হেমনলিনীর এই লজ্জার আবির্ভাব দেখিয়া নলিনাক্ষও তাহার মার প্রস্তাবের কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া কহিল, "উঁহার কাছে এক জন ঝি রাখিলে ভালো হয় না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, মা কিছুতেই রাজি হন না। তিনি শুদ্ধাচার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বলিয়া মাহিনা-করা লোকের কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হয়

না। তা ছাড়া, তাঁহার স্বভাব এমন যে, কেহ যে দায়ে পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।"

ইহার পরে এ-সম্বন্ধে হেমনলিনীর আর কোনো কথা চলিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনার উপদেশমতে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক-এক বার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোনো আশা নাই। আমার কি কোনোদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলই বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে ?"

হেমনলিনীর এই কাতর আবেদনে নলিনাক্ষ একটু চিন্তিত হইয়া কহিল, "দেখুন, বিঘ্ন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্যই উপস্থিত হয়। আপনি হতাশ হইবেন না।"

হেমনলিনী কহিল, "কাল সকালে আপনি এক বার আসিতে পারিবেন ? আপনার সহায়তা পাইলে আমি অনেকটা বল লাভ করি।"

নলিনাক্ষের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে যে একটি অবিচলিত শান্তির ভাব আছে, তাহাতে হেমনলিনী যেন একটা আশ্রয় পায়। নলিনাক্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু হেমনলিনীর মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনার স্পর্শ রাখিয়া গেল। সে তাহার শয়নগৃহের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক বার শীতরৌদ্রালোকিত বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার চারি দিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই রমণীয় মধ্যাহ্নে কর্মের সহিত বিরাম, শক্তির সহিত শান্তি, উদ্‌যোগের সহিত বৈরাগ্য একসঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, সেই বৃহৎ ভাবের ক্রোড়ে সে আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করিয়া দিল—তখন সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত উজ্জ্বল নীলাম্বর তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে জগতের নিত্য-উচ্চারিত সুগভীর আশীর্বচন প্রেরণ করিবার অবকাশ লাভ করিল।

হেমনলিনী নলিনাক্ষের মার কথা ভাবিতে লাগিল। কী চিন্তা লইয়া তিনি ব্যাপৃত আছেন, তিনি কেন যে রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেছেন না, তাহা হেমনলিনী বুঝিতে পারিল। নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের প্রথম আঘাত, প্রথম সংকোচ কাটিয়া গেছে। নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালোবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নাই—তা নাই থাকিল; ওই আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালোবাসার অপেক্ষা রাখে, তাহা তো মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন তো সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন—নলিনাক্ষকে

কে দেখিবে। এ-সংসারে নলিনাক্ষের জীবন তো অনাদরের সামগ্রী নহে—এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।

আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্মের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার সমস্ত মনের সমস্ত শক্তি আজ উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রমেশের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। সে রমেশকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। পৃথিবীতে কত শতসহস্র লোক ভালোমন্দ কত কী কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসারচক্র চলিতেছে—হেমনলিনী তাহার বিচারভার লয় নাই। রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে আত্মঘাতিনী কমলার কথা কল্পনা করিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে—তাহার মনে হইতে থাকে, এই হতভাগিনীর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কি কোনো সংস্রব আছে? তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত হইতে থাকে। সে জোড়হাত করিয়া বলে, "হে ঈশ্বর, আমি তো অপরাধ করি নাই, তবে আমি কেন এমন করিয়া জড়িত হইলাম? আমার এ-বন্ধন মোচন করো, একেবারে ছিন্ন করিয়া দাও। আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে তোমার এই জগতে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দাও।"

রমেশ ও কমলার ঘটনা শুনিয়া হেমনলিনী কী মনে করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অন্নদাবাবু উৎসুক হইয়া আছেন—অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। হেমনলিনী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছিল, সেখানে এক-এক বার গিয়া হেমনলিনীর চিন্তারত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের উপদেশমত অন্নদাবাবুকে জারকচূর্ণমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইয়া হেমনলিনী তাঁহার কাছে বসিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "আলোটা চোখের সামনে হইতে সরাইয়া দাও।"

ঘর একটু অন্ধকার হইলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "সকালবেলায় যে-বৃদ্ধটি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বেশ সরল বোধ হইল।"

হেমনলিনী এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনো কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু আর অধিক ভূমিকা বানাইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "রমেশের ব্যাপার শুনিয়া আমি কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেছি—লোকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে,—আমি আজ পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু আর তো—"

হেমনলিনী কাতরকণ্ঠে কহিল, "বাবা, ও-সকল কথার আলোচনা থাক্।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, আলোচনা করিতে তো ইচ্ছা করেই না। কিন্তু বিধির বিপাকে অকস্মাৎ এক-এক জন লোকের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখ জড়িত হইয়া যায়, তখন তাহার কোনো আচরণকে আর উপেক্ষা করিবার জো থাকে না।"

হেমনলিনী সবেগে বলিয়া উঠিল, "না না, সুখদুঃখের গ্রন্থি অমন করিয়া যেখানে-সেখানে কেন জড়িত হইতে দিব। বাবা, আমি বেশ আছি—আমার জন্য বৃথা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, আমার বয়স হইয়াছে, এখন তোমার একটা স্থিতি না করিয়া তো আমার মন স্থির হইতে পারে না। তোমাকে এমন তপস্বিনীর মতো কি আমি রাখিয়া যাইতে পারি?"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখো মা, পৃথিবীতে একটা আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই যে আর সমস্ত দুর্মূল্য জিনিসকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। তোমার জীবন কিসে সুখী হইবে, সার্থক হইবে, আজ হয়তো মনের ক্ষোভে তাহা তুমি না জানিতেও পার—কিন্তু আমি নিয়ত তোমার মঙ্গলচিন্তা করি—আমি জানি তোমার কিসে সুখ, কিসে মঙ্গল, আমার প্রস্তাবটাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়ো না।"

হেমনলিনী দুই চোখ ছলছল করিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলিয়ো না, আমি তোমার কোনো কথাই উপেক্ষা করি না। তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয় তাহা পালন করিব, কেবল এক বার অন্তঃকরণটা পরিষ্কার করিয়া এক বার ভালোরকম করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে চাই।"

অন্নদাবাবু সেই অন্ধকারে এক বার হেমনলিনীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। আর কোনো কথা কহিলেন না।

পরদিন সকালে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া বাহিরে গাছের তলায় চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু নীরব প্রশ্নের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অক্ষয় কহিল, "এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।" এই বলিয়া এক পেয়ালা চা লইয়া সে সেখানে বসিয়া গেল।

আস্তে আস্তে কথা তুলিল, "রমেশবাবু ও কমলার জিনিসপত্র কিছু-কিছু চক্রবর্তী-মহাশয়ের ওখানে রহিয়া গেছে, সেগুলি তিনি কোথায় কাহার কাছে পাঠাইবেন, তাই ভাবিতেছেন। রমেশবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ঠিকানা বাহির করিয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তাই আপনাদের এখানে যদি—"

অন্নদাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "অক্ষয়, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। রমেশ আমার এখানেই বা কেন আসিবে, আর তাহার জিনিসপত্র আমিই বা কেন রাখিতে যাইব ?"

অক্ষয় কহিল, "যা হ'ক, অন্যায় করুন আর ভুল করুন, রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন, এ-সময়ে কি তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের কর্তব্য নয় ? তাঁহাকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে ?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, তুমি কেবল আমাদের পীড়ন করিবার জন্য এই কথাটা লইয়া বার বার আন্দোলন করিতেছ। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, এ প্রসঙ্গ তুমি আমাদের কাছে কখনোই তুলিয়ো না।"

হেমনলিনী স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার অসুখ করিবে—অক্ষয়বাবু যাহা বলিতে চান, বলুন না, তাহাতে দোষ কী।"

অক্ষয় কহিল, "না না, আমাকে মাপ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

৫৪

মুকুন্দবাবু সপরিজনে কাশী ত্যাগ করিয়া মিরাটে যাইবেন, স্থির হইয়া গেছে। জিনিসপত্র বাঁধা হইয়াছে, কাল প্রভাতেই ছাড়িতে হইবে। কমলা নিতান্ত আশা করিয়াছিল, ইতিমধ্যে এমন একটা-কিছু ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে তাহাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। ইহাও সে একান্তমনে আশা করিয়াছিল যে, নলিনাক্ষ ডাক্তার হয়তো আর দুই-এক বার তাঁহার রোগীকে দেখিতে আসিবেন। কিন্তু দুয়ের কোনোটাই ঘটিল না।

পাছে বামুনঠাকরুন যাত্রার উদ্‌যোগের গোলেমালে পালাইয়া যাইবার অবকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নবীনকালী তাহাকে কয়দিন সর্বদাই কাছে কাছে রাখিয়াছেন—তাহাকে দিয়াই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছেন।

কমলা একান্তমনে কামনা করিতে লাগিল, আজ রাত্রির মধ্যে তাহার এমন একটা কঠিন পীড়া হয় যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া নবীনকালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই গুরুতর পীড়ার চিকিৎসাভার কোন্ ডাক্তারের উপর পড়িবে, তাহাও সে মনে মনে ভাবে নাই, এমন নহে। এই পীড়ায় যদি অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে আসন্ন মৃত্যুকালে সেই চিকিৎসকের পায়ের ধুলা লইয়া সে মরিতে পারিবে, ইহাও সে চোখ বুজিয়া কল্পনা করিতেছিল।

রাত্রে নবীনকালী কমলাকে আপনার ঘরে লইয়া শুইলেন। পরদিন স্টেশনে যাইবার সময় নিজের গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইলেন। কর্তা মুকুন্দবাবু রেলগাড়িতে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন—নবীনকালী বামুনঠাকরুনকে লইয়া ইণ্টারমীডিয়েটে স্ত্রীকক্ষে আশ্রয়লাভ করিলেন।

অবশেষে গাড়ি কাশী স্টেশন ছাড়িল—মত্ত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিঁড়িয়া লয়, তেমনি করিয়া রেলগাড়ি গর্জন করিতে করিতে কমলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। কমলা ক্ষুধিতচক্ষে জানলা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নবীনকালী কহিলেন, "বামুনঠাকরুন, পানের ডিপেটা কোথায় রাখিলে ?"

কমলা পানের ডিপেটা বাহির করিয়া দিল। ডিপে খুলিয়া নবীনকালী কহিলেন, "এই দেখো, যা ভাবিয়াছিলাম, তাই হইয়াছে। চুনের কৌটোটা ফেলিয়া আসিয়াছ ? এখন আমি করি কী। যেটি আমি নিজে না দেখিব, সেটিতে একটা-না-একটা গলদ হইয়া আছেই। এ কিন্তু বামুনঠাকরুন তুমি শয়তানি করিয়া করিয়াছ। কেবল আমাকে জব্দ করিবার মতলবে। ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় জ্বালাইতেছ। আজ তরকারিতে নুন নাই, কাল পায়সে ধরাগন্ধ—মনে করিতেছ, এ-সমস্ত চালাকি আমরা বুঝি না। আচ্ছা, চলো মিরাটে, তার পরে দেখা যাইবে তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে।"

গাড়ি যখন পুলের উপর দিয়া চলিল, কমলা জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া গঙ্গা-তীরবর্তী কাশী শহরটা এক বার দেখিয়া লইল। ওই শহরের মধ্যে কোন্ দিকে যে নলিনাক্ষের বাড়ি, তাহা সে কিছুই জানে না। এই জন্য রেলগাড়ির দ্রুতধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ি, মন্দিরচূড়া, যাহা-কিছু তাহার চক্ষে পড়িল, সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

নবীনকালী কহিলেন, "ওগো, অত করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছ কী। তুমি তো পাখি নও—তোমার ডানা নাই যে উড়িয়া যাইবে।"

কাশীনগরীর চিত্র কোথায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কমলা স্থিরনীরব হইয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে গাড়ি মোগলসরাইয়ে থামিল। কমলার কাছে স্টেশনের গোলমাল, লোকজনের ভিড়, সমস্তই ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো বোধ হইতে লাগিল। সে কলের পুতলির মত এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়িতে উঠিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে, এমন-সময় কমলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইল, তাহাকে কে পরিচিতকণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে। কমলা প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল উমেশ।

কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কহিল, "কী রে উমেশ !"

উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল। উমেশ তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কমলার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার সমস্ত মুখ আকর্ণপ্রসারিত হাসিতে ভরিয়া গেল।

পরক্ষণেই গার্ড কামরার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নবীনকালী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন, "বামুনঠাকরুন, করিতেছ কী। গাড়ি ছাড়িয়া দেয় যে। ওঠো, ওঠো !"

কমলার কানে সে-কথা পৌঁছিলই না। গাড়িও বাঁশি ফুঁকিয়া দিয়া গসগস শব্দে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস ?"

উমেশ কহিল, "গাজিপুর হইতে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে সকলে ভালো আছেন তো ? খুড়ামশায়ের কী খবর ?"

উমেশ কহিল, "তিনি ভালো আছেন।"

কমলা। আমার দিদি কেমন আছেন ?

উমেশ। মা, তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "উমি কেমন আছে রে ? সে তার মাসীকে কি মাঝে মাঝে মনে করে ?

উমেশ কহিল, "তুমি তাহাকে যে একজোড়া গহনা দিয়া আসিয়াছিলে, সেইটে না পরাইলে তাহাকে কোনোমতে দুধ খাওয়ানো যায় না। সেইটে পরিয়া সে দুই হাত ঘুরাইয়া বলিতে থাকে, 'মাসী গ-গ গেছে,' আর তার মার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কী করিতে আসিলি ?"

উমেশ কহিল, "আমার গাজিপুরে ভালো লাগিতেছিল না, তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি।"

কমলা। যাবি কোথায় ?

উমেশ কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে যাইব।"

কমলা কহিল, "আমার কাছে একটি পয়সাও নাই।"

উমেশ কহিল, "আমার কাছে আছে।"

কমলা। তুই কোথায় পেলি ?

উমেশ। সেই যে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়াছিলে, সে তো আমার খরচ হয় নাই।

বলিয়া গাঁট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কমলা। তবে চল উমেশ, আমরা কাশী যাই, কী বলিস? তুই তো টিকিট কিনিতে পারিবি?

উমেশ কহিল, "পারিব।" বলিয়া তখনি টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল, গাড়িতে কমলাকে উঠাইয়া দিল—কহিল, "মা, আমি পাশের কামরাতেই রহিলাম।"

কাশী স্টেশনে নামিয়া কমলা উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, এখন কোথায় যাই বল্ দেখি?"

উমেশ কহিল, "মা, তুমি কিছুই ভাবিয়ো না—আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় লইয়া যাইতেছি।"

কমলা। ঠিক জায়গা কী রে! তুই এখানকার কী জানিস বল্ দেখি?

উমেশ কহিল, "সব জানি। দেখো তো কোথায় লইয়া যাই।"

বলিয়া কমলাকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া সে কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াইলে উমেশ কহিল, "মা, এইখানে নামো।"

কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া উমেশের অনুসরণ করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিতেই উমেশ ডাকিয়া উঠিল, "দাদামশায়, বাড়ি আছ তো?"

পাশের একটা ঘর হইতে সাড়া আসিল—"কে ও, উমশে না কী! তুই কোথা থেকে এলি?"

পরক্ষণেই হুঁকা-হাতে স্বয়ং চক্রবর্তী-খুড়া আসিয়া উপস্থিত। উমেশ সমস্ত মুখ পরিপূর্ণ করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। বিস্মিত কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্রবর্তীকে প্রণাম করিল। খুড়ার খানিকক্ষণ মুখে আর কথা সরিল না;—তিনি কী যে বলিবেন, হুঁকাটা কোন্‌খানে রাখিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কমলার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া কহিলেন, "মা আমার ফিরে এল। চলো চলো, উপরে চলো।"

"ও শৈল, শৈল। দেখে যা, কে এসেছে।"

শৈলজা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। শৈল তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল। চোখের জলে দুই

কপোল ভাসাইয়া দিয়া কহিল, "মা গো মা! আমাদের এমন করিয়াও কাঁদাইয়া যাইতে হয়।"

খুড়া কহিলেন, "ও-সব কথা থাক শৈল, এখন উঁহার নাওয়া খাওয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দাও।"

এমন-সময় উমা 'মাসী মাসী' করিয়া দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

শৈলজা কমলার রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া স্নান করাইল—নিজের ভালো কাপড় একখানি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। কহিল, "কাল রাত্রে বুঝি ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। চোখ বসিয়া গেছে যে। ততক্ষণ তুই বিছানায় একটু গড়াইয়া নে। আমি রান্না সারিয়া আসিতেছি।"

কমলা কহিল, "না দিদি, তোমার সঙ্গে, চলো, আমিও রান্নাঘরে যাই।"

দুই সখীতে একত্রে রাঁধিতে গেল।

চক্রবর্তীখুড়া অক্ষয়ের পরামর্শে যখন কাশীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, শৈলজা ধরিয়া পড়িল, "বাবা, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাশী যাইব।"

খুড়া কহিলেন, "বিপিনের তো এখন ছুটি নাই।"

শৈল কহিল, "তা হ'ক, আমি একলাই যাইব। মা আছেন, উঁহার অসুবিধা হইবে না।"

স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছেদের প্রস্তাব শৈল পূর্বে কোনোদিন করে নাই।

খুড়াকে রাজি হইতে হইল। গাজিপুর হইতে যাত্রা করিলেন। কাশী স্টেশনে নামিয়া দেখেন, উমেশও গাড়ি হইতে নামিতেছে।—"আরে তুই এলি কেন রে।" সকলে যে-কারণে আসিয়াছেন, তাহারও সেই একই কারণ। কিন্তু উমেশ আজকাল খুড়ার গৃহকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে—সে এরূপ অকস্মাৎ চলিয়া আসিলে গৃহিণী অত্যন্ত রাগ করিবেন জানিয়া সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া উমেশকে গাজিপুরে ফিরাইয়া পাঠান। তাহার পরে কী ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সে গাজিপুরে কোনোমতেই টিকিতে পারিল না। গৃহিণী তাহাকে বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বাজারের পয়সা লইয়া সে একেবারে গঙ্গা পার হইয়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। চক্রবর্তী-গৃহিণী সেদিন এই ছোকরাটির জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

৫৫

দিনের মধ্যে অক্ষয় এক সময় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে কমলার প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না। রমেশের প্রতি অক্ষয়ের যে বিশেষ বন্ধুভাব নাই, তাহা খুড়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

কমলা কেন চলিয়া গিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে বাড়ির কেহ কোনো প্রশ্নই করিল না—কমলা যেন ইহাদের সঙ্গেই কাশী বেড়াইতে আসিয়াছে, এমনিভাবে দিন কাটিয়া গেল। উমির দাই লছমনিয়া স্নেহমিশ্রিত ভৎ'সনার ছলে কিছু বলিতে গিয়াছিল, খুড়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রে শৈলজা কমলাকে আপনার বিছানায় লইয়া শুইল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই কোমল হস্তস্পর্শ নীরব প্রশ্নের মতো কমলাকে তাহার গোপন বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

কমলা কহিল, "দিদি, তোমরা কী মনে করিয়াছিলে? আমার উপরে রাগ কর নাই?"

শৈল কহিল, "আমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই? আমরা কি এটা বুঝি নাই, সংসারে তোর যদি কোনো পথ থাকিত, তবে তুই এই ভয়ানক পথ লইতিস না। আমরা কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়াছি, ভগবান তোকে কেন এমন সংকটে ফেলিলেন। যে-লোক কোনো অপরাধ করিতে জানে না, সেও দণ্ড পায়।"

কমলা কহিল, "দিদি, আমার সব কথা তুমি শুনিবে?"

শৈল স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "শুনিব না তো কি বোন?"

কমলা। তখন যে তোমাকে কেন বলিতে পারি নাই, তাহা জানি না। তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মাথায় এমন বজ্রাঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না। সংসারে আমার মা-বোন কেহ নাই, দিদি, তুমি আমার মা-বোন দুই—তাই তোমার কাছে সব কথা বলিতেছি, নহিলে আমার যে-কথা, তাহা কাহারও কাছে বলিবার নয়।

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। শৈলও উঠিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। সেই অন্ধকার বিছানার মধ্যে বসিয়া কমলা বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল।

কমলা যখন বলিল, বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের রাত্রে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই, তখন শৈল কহিল, "তোর মতো বোকা মেয়ে তো আমি দেখি নাই। তোর চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—তুই কি মনে করিস, লজ্জায় আমি আমার বরকে কোনো সুযোগে দেখিয়া লই নাই।"

কমলা কহিল, "লজ্জা নয় দিদি। আমার বিবাহের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সঙ্গিনীরা আমাকে বড়োই খ্যাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাত রাজার ধন মানিক পাই নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করি নাই। এমন কী, তাঁহার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ মনের মধ্যেও অনুভব করা আমি নিতান্ত লজ্জার বিষয়, অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আজ তাহারই শোধ দিতেছি।"

এই বলিয়া কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে আরম্ভ করিল, "বিবাহের পর নৌকাডুবি হইয়া আমরা কী করিয়া রক্ষা পাইলাম, সে-কথা তো তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যখন বলিয়াছিলাম, তখনো জানিতাম না যে, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া যাঁহার হাতে পড়িলাম, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন।"

শৈলজা চমকিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি কমলার কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "হায় রে পোড়াকপাল—ও তাই বটে। এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম। এমন সর্বনাশও ঘটে।"

কমলা কহিল, "বল্‌ দেখি দিদি, যখন মরিলেই চুকিয়া যাইত, তখন বিধাতা এমন বিপদ ঘটাইলেন কেন ?"

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবুও কিছুই জানিতে পারেন নাই ?"

কমলা কহিল, "বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি এক দিন আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'আমার নাম কমলা, তবু তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন ?' আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেইদিন তাঁহার ভুল ভাঙিয়াছিল। কিন্তু দিদি, সে-সকল দিনের কথা মনে করিতেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।" এই বলিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল।

শৈলজা একটু একটু করিয়া কথায় কথায় সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত কথা শোনা হইলে সে কহিল, "বোন, তোর দুঃখের কপাল, কিন্তু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি। যাই বলিস, বেচারা

রমেশবাবুর কথা মনে করিলে বড়ো দুঃখ হয়। আজ রাত অনেক হইল, কমল তুই আজ ঘুমো। ক-দিন রাত জাগিয়া কাঁদিয়া মুখ কালি হইয়া গেছে। এখন কী করিতে হইবে, কাল সব ঠিক করা যাইবে।"

রমেশের লিখিত সেই চিঠি কমলার কাছে ছিল। পরদিন সেই চিঠিখানি লইয়া শৈলজা তাহার পিতাকে নিভৃত ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল এবং চিঠি তাঁহার হাতে দিল। খুড়া চশমা চোখে তুলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তাহার পরে চিঠি মুড়িয়া চশমা খুলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই তো, এখন কী কর্তব্য?"

শৈল কহিল, "বাবা, উমির কয়দিন হইতে সর্দিকাসি করিয়াছে, এক বার নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাও না। কাশীতে তাঁহার আর তাঁর মার তো খুব নাম শোনা যায়। এক বার তাঁকে দেখিই না।"

রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিল এবং ডাক্তারকে দেখিবার জন্য শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "কমল, আয়, শীঘ্র আয়।"

নবীনকালীর বাড়ি যে-কমলা নলিনাক্ষকে দেখিবার ব্যগ্রতায় প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কমলা আজ লজ্জায় উঠিতে চায় না।

শৈল কহিল, "দেখ্ পোড়ারমুখী, আমি তোকে বেশিক্ষণ সাধিব না, তা আমি বলিয়া রাখিতেছি—আমার সময় নাই—উমির ব্যামো কেবল নামমাত্র, ডাক্তার বেশিক্ষণ থাকিবে না—তোকে সাধাসাধি করিতে গিয়া মাঝে হইতে আমার দেখা হইবে না।"

এই বলিয়া কমলাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া শৈলজা দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। নলিনাক্ষ উমার বুক-পিঠ ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া ওষুধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শৈল কমলাকে কহিল, "কমল, বিধাতা তোকে যতই দুঃখ দিন, তোর ভাগ্য ভালো। এখন দুই-এক দিন বোন তোকে একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে—আমরা একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। ইতিমধ্যে উমির জন্যে ঘন ঘন ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে, অতএব নিতান্ত তোকে বঞ্চিত হইতে হইবে না।"

খুড়া এক দিন এমন সময় বাছিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন, যখন নলিনাক্ষ বাড়িতে থাকে না। চাকর কহিল, "ডাক্তারবাবু নাই।" খুড়া কহিলেন, "মাঠাকরুন তো আছেন, তাঁহাকে এক বার খবর দাও। বলো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

উপরে ডাক পড়িল। খুড়া গিয়া কহিলেন, "মা আপনার নাম কাশীতে বিখ্যাত। তাই আপনাকে দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে আসিলাম। আমার আর কোনো কামনা

নাই। আমার একটি দৌহিত্রীর অসুখ, আপনার ছেলেকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, তিনি বাড়ি নাই—তাই মনে করিলাম শুধু-শুধু ফিরিব না, এক বার আপনাকে দর্শন করিয়া যাইব।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "নলিন এখনি আসিবে, আপনি ততক্ষণ একটু বসুন। বেলা নিতান্ত কম হয় নাই—আপনার জন্য কিছু জলখাবার আনাইয়া দিই।"

খুড়া কহিলেন, "আমি জানিতাম, আপনি আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না—আমার যে ভোজনে বেশ একটুখানি শখ আছে, তাহা আমাকে দেখিলেই লোকে টের পায়—এবং সকলেই এ-বিষয়ে আমাকে একটু দয়াও করে।"

ক্ষেমংকরী খুড়াকে জল খাওয়াইয়া বড়ো খুশি হইলেন। কহিলেন, "কাল আমার এখানে আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রহিল—আজ প্রস্তুত ছিলাম না, আপনাকে ভালো করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।"

খুড়া কহিলেন, "যখনি প্রস্তুত হইবেন, এই ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিবেন। আপনাদের বাড়ি হইতে আমি বেশি দূরে থাকি না। বলেন তো আপনার চাকরটাকে লইয়া আমার বাড়ি দেখাইয়া আসিব।"

এমনি করিয়া খুড়া দুই-চারি দিনের যাতায়াতেই নলিনাক্ষের বাড়িতে বেশ একটু জমাইয়া লইলেন।

ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "ও নলিন, তুই চক্রবর্তীমশায়ের কাছ থেকে ভিজিট নিস নে যেন!"

খুড়া হাসিয়া কহিলেন, "মাতৃ-আজ্ঞা উনি পাইবার পূর্ব হইতেই পালন করিয়া আসিতেছেন—আমার কাছ হইতে উনি কিছুই নেন নাই। যাঁহারা দাতা, তাঁহারা গরিবকে দেখিলেই চিনিতে পারেন।"

দিনদুয়েক পিতায় ও কন্যায় পরামর্শ চলিল। তাহার পরে এক দিন সকালে খুড়া কমলাকে কহিল, "চলো মা, আমরা দশাশ্বমেধে স্নান করিতে যাই।"

কমলা শৈলকে কহিল, "দিদি, তুমিও চলো না।"

শৈল কহিল, "না ভাই, উমির শরীর তেমন ভালো নাই।"

খুড়া যে-পথ দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন, স্নানান্তে সে-পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য এক রাস্তায় চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন, একটি প্রবীণা স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন।

কমলাকে সম্মুখে আনিয়া খুড়া কহিলেন, "মা, ইহাকে প্রণাম করো, ইনি ডাক্তারবাবুর মাতা।"

কমলা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তুমি কে গা! দেখি দেখি, কী রূপ! যেন লক্ষ্মীটির প্রতিমা।" বলিয়া কমলার ঘোমটা সরাইয়া তাহার নতনেত্র মুখখানি ভালো করিয়া দেখিলেন। কহিলেন, "তোমার নাম কী বাছা?"

কমলা উত্তর করিবার পূর্বেই খুড়া কহিলেন, "ইহার নাম হরিদাসী। ইনি আমার দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইহার মা-বাপ কেহ নাই—আমার উপরেই নির্ভর।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আসুন না চক্রবর্তীমশায়, আমার বাড়িতেই আসুন।"

বাড়িতে লইয়া গিয়া ক্ষেমংকরী এক বার নলিনাক্ষকে ডাকিলেন। নলিনাক্ষ তখন বাহির হইয়া গেছেন।

খুড়া আসন গ্রহণ করিলেন—কমলা মেজের উপরে বসিল। খুড়া কহিলেন, "দেখুন, আমার এই ভাইঝির ভাগ্য বড়ো মন্দ। বিবাহের পরদিনই ইহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন—ইহার সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই। হরিদাসীর ইচ্ছা ধর্মকর্ম লইয়া তীর্থবাস করে—ধর্ম ছাড়া উহার সান্ত্বনার সামগ্রী আর তো কিছুই নাই। এখানে আমার বাড়ি নয়, আমার চাকরি আছে—উপার্জন করিয়া আমাকে সংসার চালাইতে হয়। আমি যে এখানে আসিয়া ইহাকে লইয়া থাকিব, আমার এমন সুবিধা নাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এটিকে আপনার মেয়ের মতো যদি কাছে রাখেন, তবে আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হই। যখনি অসুবিধা বোধ করিবেন, গাজিপুরে আমার কাছে পাঁঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, দুদিন ইহাকে কাছে রাখিলেই মেয়েটি কী রত্ন, তাহা বুঝিতে পারিবেন—তখন মুহূর্তের জন্য ছাড়িতে চাহিবেন না।"

ক্ষেমংকরী খুশি হইয়া কহিলেন, "আহা, এ তো ভালো কথা। এমন মেয়েটিকে আপনি যে আমার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন—এ তো আমার মস্ত লাভ। আমি কতদিন রাস্তা হইতে পরের মেয়েকে বাড়িতে আনিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া আনন্দ করি, কিন্তু তাহাদের তো রাখিতে পারি না। তা হরিদাসী আমারই হইল—আপনি ইহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমার ছেলের কথা অবশ্য আপনারা পাঁচ জনের কাছে শুনিয়া থাকিবেন—নলিনাক্ষ—সে বড়ো ভালো ছেলে। সে ছাড়া বাড়িতে আর কেহ নাই।"

খুড়া কহিলেন, "নলিনাক্ষবাবুর নাম সকলেই জানে। তিনি এখানে আপনার কাছে থাকেন জানিয়া আমি আরও নিশ্চিন্ত। আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পর দুর্ঘটনায়

তাঁহার স্ত্রী জলে ডুবিয়া মারা যাওয়াতে তিনি সেই অবধি একরকম ব্রহ্মচারীর মতোই আছেন।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সে যাহা হইয়াছে হইয়াছে—ও-কথা আর তুলিবেন না—মনে করিলেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।"

খুড়া কহিলেন, "যদি অনুমতি করেন, তবে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখিয়া এখন বিদায় হই। মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব। ইহার একটি বড়ো বোন আছে—সে-ও আপনাকে প্রণাম করিতে আসিবে।"

খুড়া চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী কমলাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "এস তো মা, দেখি। তোমার বয়স তো বেশি নয়। আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাষাণও আছে। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বিধাতা এত রূপ কখনো বৃথা নষ্ট করিবার জন্য গড়েন নাই।" বলিয়া কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এখানে তোমার সমবয়সী সঙ্গিনী কেহ নাই—একলা আমার কাছে থাকিতে পারিবে তো?"

কমলা তাহার দুই বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চক্ষে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া কহিল, "পারিব মা।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তোমার দিন কাটিবে কী করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি।"

কমলা কহিল, "আমি তোমার কাজ করিব।"

ক্ষেমংকরী। পোড়াকপাল। আমার আবার কাজ। সংসারে ওই তো আমার একটিমাত্র ছেলে—সে-ও সন্ন্যাসীর মতো থাকে—কখনো যদি বলিত 'মা, এইটে আমার দরকার আছে, আমি এইটে খেতে চাই, আমি এইটে ভালোবাসি,' তবে আমি কত খুশি হইতাম—তাও কখনো বলে না। রোজগার ঢের করে, হাতে কিছুই রাখে না—কত সংকাজে যে কতদিকে খরচ করে, তাহা কাহাকে জানিতেও দেয় না। দেখো বাছা, আমার কাছে যখন তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে হইবে, তখন এ-কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, আমার মুখে আমার ছেলের গুণগান বার বার শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে—কিন্তু ওইটে তোমাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।

কমলা পুলকিতচিত্তে চক্ষু নত করিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আমি তোমাকে কী কাজ দিব, তাই ভাবিতেছি। সেলাই করিতে জান?"

কমলা কহিল, "ভালো জানি না, মা।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে সেলাই শিখাইয়া দিব।"

ক্ষেমংকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়িতে জান তো?"

কমলা কহিল, "হাঁ, জানি।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সে হইল ভালো। চোখে তো আর চশমা নহিলে দেখিতে পাই না—তুমি আমাকে পড়িয়া শোনাইতে পারিবে।"

কমলা কহিল, "আমি রাঁধাবাড়া-ঘরকন্নার কাজ সমস্ত শিখিয়াছি।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "অমন অন্নপূর্ণার মতো চেহারা, তুমি যদি রাঁধাবাড়ার কাজ না জানিবে তো কে জানিবে। আজ পর্যন্ত নলিনকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি—আমার অসুখ হইলে বরঞ্চ স্বপাক রাঁধিয়া খায়, তবু আর কাহারও হাতে খায় না। এবার হইতে তোমার কল্যাণে তাহার স্বপাক খাওয়া আমি ঘোচাইব। আর অক্ষম হইয়া পড়িলে আমাকেও যদি চারটিখানি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খাওয়াও তো আমার তাহাতে অনভিরুচি হইবে না। চলো মা, তোমাকে আমার ভাঁড়ার-ঘর, রান্নাঘর সমস্ত দেখাইয়া আনি।"

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরকন্নার সমস্ত নেপথ্যগৃহ কমলাকে দেখাইলেন। কমলা ইতিমধ্যে একটা অবকাশ বুঝিয়া আস্তে আস্তে আপনার দরখাস্ত জারি করিল। কহিল, "মা, আমাকে আজকে রাঁধিতে দাও না।"

ক্ষেমংকরী একটুখানি হাসিলেন। কহিলেন, "গৃহিণীর রাজত্ব ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে—জীবনে অনেক জিনিস ছাড়িতে হইয়াছে—তবু ওটুকু সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়াই আছে। তা মা, আজকের মতো তুমিই রাঁধো—দুই-চারি দিন যাক, ক্রমে সমস্ত ভার আপনিই তোমার হাতে পড়িবে—আমিও ভগবানে মন দিবার সময় পাইব। বন্ধন একেবারেই তো কাটে না—এখনো দুই-চারি দিন মন চঞ্চল হইয়া থাকিবে—ভাঁড়ার-ঘরের সিংহাসনটি কম নয়।"

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী, কী রাঁধিতে হইবে, কী করিতে হইবে, কমলাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন। ক্ষেমংকরীর কাছে আজ কমলার ঘরকন্নার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কমলা তাহার স্বাভাবিক তৎপরতার সহিত রন্ধনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া, কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় এলোচুল ঝুঁটি করিয়া লইয়া রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনাক্ষ বাহির হইতে বাড়িতে ফিরিলেই প্রথমে তাহার মাকে দেখিতে যাইত। তাহার মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে কখনোই ছাড়িত না। আজ বাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র রান্নাঘরের শব্দ এবং গন্ধ তাহাকে আক্রমণ করিল। মা এখন

রান্নায় প্রবৃত্ত আছেন মনে করিয়া নলিনাক্ষ রান্নাঘরের দরজার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদশব্দে চকিত কমলা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে নলিনাক্ষের সহিত তাহার চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতাটা রাখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিল—কোমরে আঁচল জড়ানো ছিল—টানাটানি করিয়া ঘোমটা যখন মাথার কিনারায় উঠিল, বিস্মিত নলিনাক্ষ তখন সেখান হইতে চলিয়া গেছে। তাহার পর কমলা যখন হাতা তুলিয়া লইল, তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে।

পূজা সকাল সকাল সারিয়া ক্ষেমংকরী যখন রান্নাঘরে গেলেন, দেখিলেন, রান্না সারা হইয়া গেছে। ঘর ধুইয়া কমলা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে—কোথাও পোড়াকাঠ বা তরকারির খোসা বা কোনোপ্রকার অপরিচ্ছন্নতা নাই। দেখিয়া ক্ষেমংকরী মনে মনে খুশি হইলেন, কহিলেন, "মা, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে।"

নলিনাক্ষ আহারে বসিলে ক্ষেমংকরী তাহার সম্মুখে বসিলেন—আর-একটি সংকুচিত প্রাণী কান পাতিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, উঁকি মারিতে সাহস করিতেছিল না—ভয়ে মরিয়া যাইতেছিল, পাছে তাহার রান্না খারাপ হইয়া থাকে।

ক্ষেমংকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিন, আজ রান্নাটা কেমন হইয়াছে?"

নলিনাক্ষ ভোজ্যপদার্থ সম্বন্ধে সমজদার ছিল না, তাই ক্ষেমংকরী এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্ন কখনো তাহাকে করিতেন না—আজ বিশেষ কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলিনাক্ষ যে অন্ধকার রান্নাঘরের নূতন রহস্যের পরিচয় পাইয়াছে, তাহা তাহার মা জানিতেন না। ইদানীং মাতার শরীর খারাপ হওয়াতে নলিনাক্ষ রাঁধিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে মাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করিতে পারে নাই। আজ নূতন লোককে রন্ধনে নিযুক্ত দেখিয়া সে মনে মনে খুশি হইয়াছ। রান্না কিরূপ হইয়াছে, তাহা সে বিশেষ মনোযোগ করে নাই—কিন্তু উৎসাহের সহিত কহিল, "রান্না চমৎকার হইয়াছে মা।"

আড়াল হইতে এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া কমলা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে পাশের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার চঞ্চল বক্ষকে দুই বাহুর দ্বারা পীড়ন করিয়া ধরিল।

আহারান্তে নলিনাক্ষ আপনার মনের মধ্যে কী একটা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুসারে নিভৃত অধ্যয়নে চলিয়া গেল।

বৈকালে ক্ষেমংকরী কমলাকে লইয়া নিজে তাহার চুল বাঁধিয়া সীমন্তে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন—তাহার মুখ এক বার এপাশে, এক বার ওপাশে ফিরাইয়া ভালো

করিয়া দেখিলেন—কমলা লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী মনে মনে কহিলেন, "আহা, আমি যদি এইরকমের একটি বউ পাইতাম।"

সেই রাত্রেই ক্ষেমংকরীর আবার জ্বর আসিল। নলিনাক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, তোমাকে আমি কিছুদিন কাশী হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাইব। এখানে তোমার শরীর ভালো থাকিতেছে না।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সেটি হবে না বাছা। দু-চার দিন বাঁচাইয়া রাখিবার আশায় আমাকে যে কাশী ছাড়িয়া অন্য কোথাও লইয়া মারিবি, সেটি হবে না। ও কী মা, তুমি যে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছ? যাও যাও, শুতে যাও। সমস্ত রাত অমন জাগিয়া কাটাইলে চলিবে না। আমি যে-কয়দিন ব্যামোতে আছি, তোমাকেই তো সব দেখিতে শুনিতে হইবে। রাত জাগিলে পারিবে কেন? যা তো নলিন, একবার ও-ঘরে যা তো।"

নলিনাক্ষ পাশের ঘরে যাইতেই কমলা ক্ষেমংকরীর পদতলে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আর-জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার মা ছিলে মা। নহিলে কোথাও কিছু নাই, তোমাকে এমন করিয়া পাইব কেন? দেখো, আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা সহিতে পারি না কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা যেন জুড়াইয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, মনে হইতেছে, তোমাকে আমি যেন কতকাল ধরিয়া জানি। তোমাকে তো একটুও পর মনে হয় না। তা শোনো মা, তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে যাও। পাশের ঘরে নলিন রহিল—মার সেবা সে আর কারো হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না—তা হাজার বারণ করি আর যাই করি—ওর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে বলো। কিন্তু ওর একটি গুণ আছে, রাত জাগুক আর যাই করুক, ওর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যাইবে না—তার কারণ, ও কখনো কিছুতে অস্থির হয় না। আমার ঠিক তার উল্‌টা। মা, তুমি বোধ করি মনে মনে হাসিতেছ। ভাবিতেছ, নলিনের কথা আরম্ভ হইল, এবারে আর কথা থামিবে না। তা মা, এক ছেলে থাকিলে ওইরকমই হয়। আর নলিনের মতো ছেলেই বা কজন মায়ের হয়। সত্য বলিতেছি, আমি এক-এক বার ভাবি—নলিন তো আমার বাপ—ও আমার জন্যে যতটা করিয়াছে, আমি কি উহার জন্যে ততটা করিতে পারি।—ওই দেখো, আবার নলিনের কথা। কিন্তু আর নয়—যাও মা, তুমি শুইতে যাও। না না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না, তুমি যাও—তুমি থাকিলে আমার ঘুম আসিবে না। বুড়োমানুষ, লোক কাছে থাকিলেই কেবল বকিতে ইচ্ছা করে।"

পরদিন কমলাই ঘরকন্নার সমুদয় ভার গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ পূর্বদিকের বারান্দায় এক অংশ ঘিরিয়া লইয়া মার্বেল দিয়া বাঁধাইয়া একটি ছোটো ঘর করিয়া লইয়াছিল— ইহাই তাহার উপাসনাগৃহ ছিল—এবং মধ্যাহ্নে এইখানেই সে আসনের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিত। সেদিন প্রাতে সে-ঘরে নলিনাক্ষ প্রবেশ করিয়াই দেখিল, ঘরটি ধৌত, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন—ধুনা জ্বালাইবার জন্য একটি পিতলের ধুনুচি ছিল, সেটি আজ সোনার মতো ঝকঝক করিতেছে। শেলফের উপরে তাহার কয়েকখানি বই ও পুঁথি সুসজ্জিত করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গৃহখানির যত্নমার্জিত নির্মলতার উপরে মুক্তদ্বার দিয়া প্রভাতরৌদ্রের উজ্জ্বলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দেখিয়া স্নান হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত নলিনাক্ষের মনে বিশেষ একটি তৃপ্তির সঞ্চার হইল।

কমলা প্রভাতে ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ক্ষেমংকরীর বিছানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহার স্নাতমূর্তি দেখিয়া কহিলেন, "এ কী মা, তুমি একলাই ঘাটে গিয়াছিলে? আমি আজ ভোর হইতে ভাবিতেছিলাম, আমার অসুখ, তুমি কাহার সঙ্গে স্নানে যাইবে। কিন্তু তোমার অল্প বয়স, এমন করিয়া একলা—"

কমলা কহিল, "মা, আমার বাপের বাড়ির একটা চাকর থাকিতে পারে নাই, আমাকে দেখিতে কাল রাত্রেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আহা, তোমার খুড়ীমা বোধ হয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, চাকরটাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তা বেশ হইয়াছে—সে তোমার কাছেই থাক্ না— তোমার কাজে-কর্মে সাহায্য করিবে। কোথায় সে, তাহাকে ডাকো না।"

কমলা উমেশকে লইয়া হাজির করিল। উমেশ গড় হইয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কী রে?"

সে কহিল, "আমার নাম উমেশ।" বলিয়া অকারণ-বিকশিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া গেল।

ক্ষেমংকরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমেশ, তোর এই বাহারে কাপড়খানা তোকে কে দিল রে?"

উমেশ কমলাকে দেখাইয়া কহিল, "মা দিয়াছেন।"

ক্ষেমংকরী কমলার দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, "আমি বলি, উমেশ বুঝি ওর শাশুড়ীর কাছ হইতে জামাইষষ্ঠী পাইয়াছে।

ক্ষেমংকরীর স্নেহ লাভ করিয়া উমেশ এইখানেই রহিয়া গেল।

উমেশকে সহায় করিয়া কমলা দিনের বেলাকার সমস্ত কাজকর্ম শেষ করিয়া ফেলিল।

স্বহস্তে নলিনাক্ষের শোবার ঘর ঝাঁট দিয়া, তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া, সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নলিনাক্ষের ময়লা ছাড়া-ধুতি ঘরের এক কোণে পড়িয়া ছিল। কমলা সেখানি ধুইয়া শুকাইয়া, ভাঁজ করিয়া আলনার উপরে ঝুলাইয়া রাখিল। ঘরের যে-সব জিনিস কিছুমাত্র অপরিষ্কার ছিল না, তাহাও সে মুছিবার ছলে বার বার নাড়াচাড়া করিয়া লইল। বিছানার শিয়রের কাছে দেয়ালে একটা গা-আলমারি ছিল—সেটা খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল নিচের থাকে নলিনাক্ষের একজোড়া খড়ম আছে। তাড়াতাড়ি সেই খড়মজোড়াটি তুলিয়া লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল, এবং ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বারবার তাহার ধুলা মুছাইয়া দিল।

বৈকালে কমলা ক্ষেমংকরীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন-সময় হেমনলিনী একটি ফুলের সাজি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল।

ক্ষেমংকরী উঠিয়া বসিয়া কহিল, "এস এস, হেম এস, বসো। অন্নদাবাবু ভালো আছেন?"

হেমনলিনী কহিল, "তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া কাল আসিতে পারি নাই, আজ তিনি ভালো আছেন।"

কমলাকে দেখাইয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এই দেখো বাছা,—শিশুকালে আমার মা মারা গেছেন; তিনি আবার জন্ম লইয়া এতদিন পরে কাল পথের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়াছেন। আমার মার নাম ছিল হরিভাবিনী—এবারে হরিদাসী নাম লইয়াছেন। কিন্তু হেম, এমন লক্ষ্মীর মূর্তি আর কোথাও দেখিয়াছ? বলো তো।"

কমলা লজ্জায় মুখ নিচু করিল। হেমনলিনীর সঙ্গে আস্তে আস্তে তাহার পরিচয় হইয়া গেল।

হেমনলিনী ক্ষেমংকরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনার শরীর কেমন আছে?"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "দেখো, আমার যে-বয়স হইয়াছে, এখন আমাকে আর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। আমি যে এখনো আছি, এই ঢের। কিন্তু তাই বলিয়া কালকে চিরদিন ফাঁকি দেওয়া তো চলিবে না। তা তুমি যখন কথাটা পাড়িয়াছ, ভালোই হইয়াছে—তোমাকে কিছুদিন হইতে বলিব বলিব করিতেছি, সুবিধা হইতেছে না। কাল রাত্রে আবার যখন আমাকে জ্বরে ধরিল, তখন ঠিক করিলাম, আর বিলম্ব করা ভালো হইতেছে না। দেখো বাছা, ছেলেবয়সে আমাকে যদি কেহ বিবাহের কথা বলিত তো লজ্জায় মরিয়া যাইতাম—কিন্তু তোমাদের তো সে-রকম শিক্ষা নয়। তোমরা

লেখাপড়া শিখিয়াছ—বয়সও হইয়াছে—তোমাদের কাছে এ-সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চলে। সেই জন্যই কথাটা পাড়িতেছি, তুমি আমার কাছে লজ্জা করিয়ো না। আচ্ছা বলো তো বাছা, সেদিন তোমার বাপের কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি কি তোমাকে বলেন নি।"

হেমনলিনী নতমুখে কহিল, "হাঁ, বলিয়াছিলেন।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "কিন্তু তুমি বাছা সে-কথায় নিশ্চয়ই রাজি হও নাই। যদি রাজি হইতে, তবে অন্নদাবাবু তখনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। তুমি ভাবিলে আমার নলিন সন্ন্যাসী-মানুষ, দিবারাত্রি কী-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন? হ'ক আমার ছেলে, তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়। উহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, উহার যেন কিছুতেই কোনোদিন আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল;—আমি উহাকে জন্মকাল হইতে জানি, আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়ো। ও এত বেশি ভালোবাসিতে পারে যে, সেই ভয়েই ও আপনাকে এত করিয়া দমন করিয়া রাখে। উহার এই সন্ন্যাসের খোলা ভাঙিয়া যে উহার হৃদয় পাইবে, সে বড়ো মধুর জিনিসটি পাইবে, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। মা হেম, তুমি বালিকা নও, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমার নলিনের কাছ হইতেই দীক্ষা লইয়াছ, তোমাকে নলিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যদি মরিতে পারি তবে বড়ো নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব। নহিলে, আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরিলে ও আর বিবাহই করিবে না। তখন ওর কী দশা হইবে ভাবিয়া দেখো দেখি। একেবারে ভাসিয়া বেড়াইবে। যাই হ'ক, বলো তো বাছা, তুমি তো নলিনকে শ্রদ্ধা কর আমি জানি, তবে তোমার মনে আপত্তি উঠিতেছে কেন?"

হেমনলিনী নতনেত্রে কহিল, "মা, তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে কর, তবে আমার কোনো আপত্তি নাই।"

শুনিয়া ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। এ-সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলিলেন না।

"হরিদাসী, এ ফুলগুলো"—বলিতে বলিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন, হরিদাসী নাই। সে নিঃশব্দপদে কখন উঠিয়া গেছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পর ক্ষেমংকরীর কাছে হেমনলিনী সংকোচ বোধ করিল—ক্ষেমংকরীরও বাধো-বাধো করিতে লাগিল। তখন হেম কহিল, "মা, আজ তবে সকাল-সকাল যাই। বাবার শরীর ভালো নাই।" বলিয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল। ক্ষেমংকরী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "এস, মা, এস!"

হেমনলিনী চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, "নলিন, আর আমি দেরি করিতে পারিব না।"

নলিনাক্ষ কহিল, "ব্যাপারখানা কী ?"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আমি আজ হেমকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম—সে তো রাজি হইয়াছে, এখন তোমার কোনো ওজর আমি শুনিতে চাই না। আমার শরীর তো দেখিতেছিস। তোদের একটা স্থিতি না করিয়া আমি কোনোমতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমি ওই কথাই ভাবি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "আচ্ছা মা, ভাবিয়ো না, তুমি ভালো করিয়া ঘুমাইয়ো, তুমি যেমন ইচ্ছা কর, তাহাই হইবে।"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী ডাকিলেন, "হরিদাসী।"

কমলা পাশের ঘর হইতে চলিয়া আসিল। তখন অপরাহ্ণের আলোক ম্লান হইয়া ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। হরিদাসীর মুখ ভালো করিয়া দেখা গেল না। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "বাছা, এই ফুলগুলিতে জল দিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখো।" বলিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ তুলিয়া ফুলের সাজিটি কমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

কমলা তাহার মধ্যে কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটি থালায় সাজাইয়া নলিনাক্ষের উপাসনাগৃহের আসনের সম্মুখে রাখিল। আর কতকগুলি একটি বাটিতে করিয়া নলিনাক্ষের শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাকি কয়েকটি ফুল লইয়া সেই দেয়ালের গায়ের আলমারিটা খুলিয়া এবং সেই খড়মজোড়ার উপর ফুলগুলি রাখিয়া তাহার উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই তাহার চোখ দিয়া আজ ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই খড়ম ছাড়া জগতে তাহার আর কিছুই নাই—পদসেবার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছে।

এমন-সময়ে হঠাৎ ঘরে কে প্রবেশ করিতেই কমলা ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আলমারির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ। কোনোদিকে কমলা পালাইবার পথ পাইল না—লজ্জায় কমলা সেই আসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল না কেন।

নলিনাক্ষ ঘরের মধ্যে কমলাকে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলাও আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তখন নলিনাক্ষ পুনর্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি আলমারি খুলিয়া কী করিতেছিল—তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিলই বা কেন? কৌতূহলবশত নলিনাক্ষ আলমারি খুলিয়া

দেখিল—তাহার খড়মজোড়ার উপর কতকগুলি গন্ধসিক্ত ফুল রহিয়াছে। তখন সে আবার আলমারির দরজা বন্ধ করিয়া শয়নগৃহের জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শীতসূর্যাস্তের ক্ষণকালীন আভা মিলাইয়া আসিয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

৫৬

হেমনলিনী নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে সম্মতি দিয়া মনকে বুঝাইতে লাগিল, 'আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে।' মনে মনে সহস্রবার করিয়া বলিল, 'আমার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে—আমার জীবনের আকাশকে বেষ্টন করিয়া যে ঝড়ের মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একেবারে কাটিয়া গেছে। এখন আমি স্বাধীন, আমার অতীতকালের অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত।' এই কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল। শ্মশানে দাহকৃত্যের পর এই প্রকাণ্ড সংসার তাহার বিপুল ভার পরিহার করিয়া যখন খেলার মতো হইয়া দেখা দেয়, তখন কিছুকালের মতো মন যেমন লঘু হইয়া যায়—হেমনলিনীর ঠিক সেই অবস্থা হইল—সে নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ-অবসান-জনিত শান্তি লাভ করিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া হেমনলিনী ভাবিল, 'মা যদি থাকিতেন, তবে তাঁহাকে আজ আমার এই আনন্দের কথা বলিয়া আনন্দিত করিতাম—বাবাকে কেমন করিয়া সব কথা বলিব।'

শরীর দুর্বল বলিয়া আজ অন্নদাবাবু যখন সকাল সকাল শুইতে গেলেন, তখন হেমনলিনী একখানি খাতা বাহির করিয়া রাত্রে তাহার নির্জন শয়নগৃহে টেবিলের উপর লিখিতে লাগিল, "আমি মৃত্যুজালে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আবার যে এক দিন আমাকে নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা আমি মনেও করিতে পারিতাম না। আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি কোনোমতেই যে-সৌভাগ্যের উপযুক্ত নই, তাহাই লাভ করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে তাহাই চিরজীবন রক্ষা করিবার জন্য বলদান করুন। যাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র জীবন মিলিত হইতে চলিল, তিনি আমাকে সর্বাংশে পরিপূর্ণতা দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি; সেই পরিপূর্ণতার সমস্ত

ঐশ্বর্য আমি যেন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

তাহার পরে খাতা বন্ধ করিয়া হেমনলিনী সেই নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে নিস্তব্ধ শীতের রাত্রে কাঁকর-বিছানো বাগানের পথে অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্ত আকাশ তাহার অশ্রুধৌত অন্তঃকরণের মধ্যে নিঃশব্দ শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিল।

পরদিন অপরাহ্ণে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া নলিনাক্ষের বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন-সময় তাঁহার দ্বারের কাছে এক গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। কোচবাক্সের উপর হইতে নলিনাক্ষের এক চাকর নামিয়া আসিয়া খবর দিল, "মা আসিয়াছেন।"

অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেই ক্ষেমংকরী গাড়ি হইতে নামিয়া আসিলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আজ আপনার মেয়ে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া যাইব, তাই আসিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্নদাবাবু তাঁহাকে বসিবার ঘরে যত্নপূর্বক একটা সোফার উপরে বসাইয়া কহিলেন, "আপনি বসুন, আমি হেমকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

হেমনলিনী বাহিরে যাইবার জন্য সাজিয়া প্রস্তুত হইতেছিল—ক্ষেমংকরী আসিয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল—ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সৌভাগ্যবতী হইয়া তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করো। দেখি মা, তোমার হাতখানি দেখি।" বলিয়া একে একে তাহার দুই হাতে মকরমুখো মোটা সোনার বালা দুইগাছি পরাইয়া দিলেন। হেমনলিনীর কৃশ হাতে মোটা বালাজোড়া ঢলঢল করিতে লাগিল। বালা পরানো হইলে হেমনলিনী আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল—ক্ষেমংকরী দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। এই আশীর্বাদে ও আদরে হেমনলিনীর হৃদয় একটি সুগম্ভীর মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "বেয়াইমশায়, কাল আমার ওখানে আপনাদের দুজনেরই সকালে নিমন্ত্রণ রহিল।"

পরদিন প্রাতঃকালে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু যথানিয়মে বাহিরে চা খাইতে বসিয়াছেন। অন্নদাবাবুর রোগক্লিষ্ট মুখ এক রাত্রির মধ্যেই আনন্দে সরস ও নবীন হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে হেমনলিনীর শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিতেছেন,

আর তাঁহার মনে হইতেছে, আজ যেন তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর মঙ্গলমধুর আবির্ভাব তাঁহার কন্যাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, এবং সুদূরব্যাপ্ত অশ্রুজলের আভাসে সুখের অত্যুজ্জ্বলতাকে স্নিগ্ধগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।

অন্নদাবাবুর আজ কেবলই মনে হইতেছে, ক্ষেমংকরীর নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় হইয়াছে—আর দেরি করা উচিত নহে। হেমনলিনী তাঁহাকে বার বার করিয়া স্মরণ করাইতেছে, এখনো অনেক সময় আছে—এখনো সবে আটটা। অন্নদাবাবু কহিতেছেন, "নাহিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে তো সময় চাই। দেরি করার চেয়ে বরঞ্চ একটু সকাল-সকাল যাওয়া ভালো।"

ইতিমধ্যে কতকগুলি তোরঙ্গ-বিছানা প্রভৃতি বোঝাইসমেত এক ভাড়াটে গাড়ি আসিয়া বাগানের প্রবেশপথের সম্মুখে থামিল।

সহসা হেমনলিনী "দাদা আসিয়াছেন" বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। যোগেন্দ্র হাস্যমুখে গাড়ি হইতে নামিল—কহিল, "কী হেম, ভালো আছ তো?"

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গাড়িতে আর কেহ আছে নাকি?"

যোগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আছে বই কি। বাবার জন্য একটি ক্রিস্টমাসের উপহার আনিয়াছি।"

ইতিমধ্যে রমেশ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। হেমনলিনী এক বার মুহূর্তকাল চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র ডাকিল, "হেম, যেয়ো না, কথা আছে, শোনো।"

এ-আহ্বান হেমনলিনীর কানেও পৌঁছিল না—সে যেন কোন্ প্রেতমূর্তির অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দ্রুতবেগে চলিল।

রমেশ ক্ষণকালের জন্য এক বার থমকিয়া দাঁড়াইল—অগ্রসর হইবে, কি ফিরিয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না। যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশ, এস, বাবা এইখানে বাহিরেই বসিয়া আছেন।" বলিয়া রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে অন্নদাবাবুর কাছে আনিয়া উপস্থিত করিল।

অন্নদাবাবু দূর হইতেই রমেশকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেছেন। তিনি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিলেন, এ আবার কী বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

রমেশ অন্নদাবাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু তাহাকে বসিবার চৌকি দেখাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রকে কহিলেন, "যোগেন, তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ। আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব মনে করিতেছিলাম।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমের সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ স্থির হইয়া গেছে। কাল নলিনাক্ষের মা হেমকে আশীর্বাদ করিয়া দেখিয়া গেছেন।"

যোগেন্দ্র। বল কী বাবা, বিবাহ একেবারে পাকাপাকি স্থির হইয়া গেছে? আমাকে এক বার জিজ্ঞাসা করিতেও নাই?

অন্নদাবাবু। যোগেন্দ্র, তুমি কখন কী বল, তার কিছুই স্থির নাই। আমি যখন নলিনাক্ষকে জানিতামও না, তখন তোমরাই তো এই বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী ছিলে।

যোগেন্দ্র। তখন তো ছিলাম, কিন্তু তা যাই হ'ক, এখনো সময় যায় নাই। ঢের কথা বলিবার আছে। আগে সেইগুলো শোনো, তার পরে যা কর্তব্য হয় করিয়ো।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "সময়মতো এক দিন শুনিব—কিন্তু আজ আমার তো অবকাশ নাই। এখনি আমাকে বাহির হইতে হইবে।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "নলিনাক্ষের মার ওখানে আমার আর হেমের নিমন্ত্রণ আছে। যোগেন্দ্র, তোমার তা হইলে এখানেই আহারের—"

যোগেন্দ্র কহিল, "না না। আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নাই। আমি রমেশকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কোনো হোটেলে খাওয়াদাওয়া করিয়া লইব। সন্ধ্যার মধ্যে তোমরা ফিরিবে তো? তখনি আমরা আসিব।"

অন্নদাবাবু কোনোমতেই রমেশের প্রতি কোনোপ্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমেশও এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া, যাইবার সময় অন্নদাবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৫৭

ক্ষেমংকরী কমলাকে গিয়া কহিলেন, "মা, কাল হেমকে আর তার বাপকে দুপুর-বেলায় এখানে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করা গেছে। কী রকম আয়োজনটা করা যায় বলো দেখি? বেয়াইকে এমন করিয়া খাওয়ানো দরকার যে, তিনি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে, এখানে তাঁহার মেয়েটির খাওয়ার কষ্ট হইবে না। কী বল মা? তা, তোমার যে-রকম রান্নার হাত, অপযশ হইবে না, তা জানি। আমার ছেলে

আজ পর্যন্ত কোনো রান্না খাইয়া কোনো দিন ভালোমন্দ কিছুই বলে নাই—কাল তোমার রান্নার প্রশংসা তাহার মুখে ধরে না মা। কিন্তু তোমার মুখখানি আজ বড়ো শুকনো দেখাইতেছে যে? শরীর কি ভালো নাই?"

মলিন মুখে একটুখানি হাসি আনিয়া কমলা কহিল, "বেশ আছি মা।"

ক্ষেমংকরী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না না, বোধ করি তোমার মন কেমন করিতেছে। তা তো করিতেই পারে, সেজন্য লজ্জা কিসের। আমাকে পর ভাবিয়ো না মা। আমি তোমাকে আপন মেয়ের মতোই দেখি—এখানে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয়, বা তুমি আপনার লোক কাহাকেও দেখিতে চাও তো আমাকে না বলিলে চলিবে কেন?"

কমলা ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না মা, তোমার সেবা করিতে পারিলে আমি আর কিছুই চাই না।"

ক্ষেমংকরী সে-কথায় কান না দিয়া কহিলেন, "না হয় কিছুদিনের জন্য তোমার খুড়ার বাড়িতে গিয়া থাকো, তার পরে যখন ইচ্ছা হয়, আবার আসিবে।"

কমলা অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল, "মা, আমি যতক্ষণ তোমার কাছে আছি, সংসারে কাহারও জন্য ভাবি না। আমি যদি কখনো তোমার পায়ে অপরাধ করি, আমাকে তুমি যেমন খুশি শাস্তি দিয়ো, কিন্তু এক দিনের জন্যও দূরে পাঠাইয়ো না।"

ক্ষেমংকরী কমলার দক্ষিণ কপোলে দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "তাই তো বলি মা, আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে। নহিলে দেখিবামাত্র এমন বন্ধন কী করিয়া হয়। তা যাও মা, সকাল সকাল শুইতে যাও। সমস্তদিন তো এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে জান না।"

কমলা তাহার শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া অন্ধকারে মাটির উপরে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, এই কথা সে মনে বুঝিল, "কপালের দোষে যাহার উপরে আমার অধিকার হারাইয়াছি, তাহাকে আমি আগলাইয়া বসিয়া থাকিব, এ কেমন করিয়া হয়। সমস্তই ছাড়িবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে—কেবল সেবা করিবার সুযোগটুকু, যেমন করিয়া হউক, প্রাণ-পণে বাঁচাইয়া চলিব। ভগবান করুন, সেটুকু যেন হাসিমুখে করিতে পারি—তাহার বেশি আর কিছুতে যেন দৃষ্টি না দিই। অনেক দুঃখে যেটুকু পাইয়াছি, সেটুকুও যদি প্রসন্নমনে না লইতে পারি, যদি মুখ ভার করি, তবে সবসুদ্ধই হারাইতে হইবে।"

এই বুঝিয়া একাগ্রমনে বার বার করিয়া সে সংকল্প করিতে লাগিল, "আমি কাল হইতে যেন কোনো দুঃখকে মনে স্থান না দিই, যেন এক মুহূর্ত মুখ বিরস না করি, যাহা

আশার অতীত, তাহার জন্য যেন কোনো কামনা মনের মধ্যে না থাকে। কেবল সেবা করিব, যতদিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব, আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।"

তাহার পর কমলা শুইতে গেল। এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে দুই-তিন বার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভাঙিবামাত্রই সে মন্ত্রের মতো আওড়াইতে লাগিল, "আমি কিছুই চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।" ভোরের বেলায় সে বিছানা হইতে উঠিয়াই জোড়হাত করিয়া বসিল, এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া কহিল, "আমি আমরণকাল তোমার সেবা করিব, আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া, বাসি কাপড় ছাড়িয়া নলিনাক্ষের সেই ক্ষুদ্র উপাসনাঘরের মধ্যে গেল; নিজের আঁচলটি দিয়া সমস্ত ঘর মুছিয়া পরিষ্কার করিল এবং যথাস্থানে আসনটি বিছাইয়া রাখিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাস্নান করিতে গেল। আজকাল নলিনাক্ষের একান্ত অনুরোধে ক্ষেমংকরী সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করিতে যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই উমেশকেই এই দুঃসহ শীতের ভোরে কমলার সহিত স্নানে যাইতে হইল।

স্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কমলা ক্ষেমংকরীকে প্রফুল্লমুখে প্রণাম করিল। তিনি তখন স্নানে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। কমলাকে কহিলেন, "এত ভোরে কেন নাহিতে গেলে? আমার সঙ্গে গেলেই তো হইত।"

কমলা কহিল, "আজ যে কাজ আছে মা। কাল সন্ধ্যাবেলায় যে তরকারি আনানো হইয়াছে তাহাই কুটিয়া রাখি—আর যা-কিছু বাজার করা বাকি আছে, উমেশ সকাল সকাল সারিয়া আসুক।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "বেশ বুদ্ধি ঠাওরাইয়াছ মা। বেয়াই যেমনি আসিবেন অমনি খাবার প্রস্তুত পাইবেন।"

এমন সময় নলিনাক্ষ বাহির হইয়া আসিবামাত্র কমলা ভিজা চুলের উপর তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ কহিল, "মা, আজই তুমি স্নান করিতে চলিলে? সবে কাল একটু ভালো ছিলে।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "নলিন, তোর ডাক্তারি রাখ। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান না করিলেও লোকে অমর হয় না। তুই এখন বাহির হইতেছিস বুঝি? একটু সকাল-সকাল ফিরিস।"

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

ক্ষেমংকরী। কাল তোকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আজ অন্নদাবাবু তোকে আশীর্বাদ করিতে আসিবেন।

নলিনাক্ষ। আশীর্বাদ করিতে আসিবেন? কেন, হঠাৎ আমার উপরে এত বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন যে? তাঁর সঙ্গে তো রোজই আমার দেখা হয়।

ক্ষেমংকরী। আমি যে কাল হেমনলিনীকে একজোড়া বালা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিলাম, এখন অন্নদাবাবু তোকে না করিলে চলিবে কেন? যা হ'ক, ফিরিতে দেরি করিস নে—তাঁরা এখানেই খাইবেন।

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী স্নান করিতে গেলেন। নলিনাক্ষ মাথা নিচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

৫৮

হেমনলিনী রমেশের নিকট হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রথম আবেগটা শান্ত হইবামাত্র একটা লজ্জা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। "কেন আমি রমেশবাবুর সঙ্গে সহজভাবে দেখা করিতে পারিলাম না? যাহা আশা করি না, তাহাই হঠাৎ কেন আমার মধ্য হইতে এমন অশোভন ভাবে দেখা দেয়? বিশ্বাস নাই, কিছুই বিশ্বাস নাই। এমন করিয়া টলমল করিতে আর পারি না।"

এই বলিয়া সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল, বাহির হইয়া আসিল—মনে মনে কহিল, "আমি পলায়ন করিব না, আমি জয় করিব।" পুনর্বার রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। হঠাৎ কী মনে পড়িল। আবার সে ঘরের মধ্যে গেল। তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ক্ষেমংকরীর প্রদত্ত বালাজোড়া বাহির করিয়া পরিল, এবং অস্ত্র পরিয়া যুদ্ধে যাইবার মতো সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া মাথা তুলিয়া বাগানের দিকে চলিল।

অন্নদাবাবু আসিয়া কহিলেন, "হেম, তুমি কোথায় চলিয়াছ?"

হেমনলিনী কহিল, "রমেশবাবু নাই—দাদা নাই?"

অন্নদা। না, তাঁহারা চলিয়া গেছেন।

আশু আত্মপরীক্ষাসম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হেমনলিনী আরাম বোধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "এখন তবে—"

হেমনলিনী কহিল, "হাঁ বাবা, আমি চলিলাম—আমার স্নান করিয়া আসিতে দেরি হইবে না, তুমি গাড়ি ডাকিতে বলিয়া দাও।"

এইরূপে হেমনলিনী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য হঠাৎ তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিল। এই উৎসাহের আতিশয্যে অন্নদাবাবু ভুলিলেন না, তাঁহার মন আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়া কহিল, "বাবা, গাড়ি আসিয়াছে কি?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "না, এখনো আসে নাই।"

ততক্ষণ হেমনলিনী বাগানের রাস্তায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্নদাবাবু বারান্দায় বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাড়ি গিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন সাড়ে দশটার অধিক হইবে না। তখনো নলিনাক্ষ কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই অন্নদাবাবুর অভ্যর্থনাভার ক্ষেমংকরীকেই লইতে হইল।

ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর শরীর ও সংসারের নানা কথা লইয়া প্রশ্ন ও আলোচনা উত্থাপিত করিলেন—মাঝে মাঝে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাঁহার কটাক্ষ ধাবিত হইল। সে-মুখে কোনো উৎসাহের লক্ষণ নাই কেন? আসন্ন শুভঘটনার সম্ভাবনা সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণরশ্মিচ্ছটার মতো তাহার মুখে দীপ্তিবিকাশ করে নাই তো। বরঞ্চ হেমনলিনীর অন্যমনস্ক দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ভাবনার অন্ধকার যেন দেখা যাইতেছিল।

অল্পেই ক্ষেমংকরীকে আঘাত করে। হেমনলিনীর এইরূপ ম্লানভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মন দমিয়া গেল। "নলিনের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই শিক্ষামদমত্তা মেয়েটি আমার নলিনকে কি তাঁহার যোগ্য বলিয়াই মনে করিতেছেন না? এত চিন্তা, এত দ্বিধাই বা কিসের জন্য? আমারই দোষ। বুড়া হইয়া গেলাম, তবু ধৈর্য ধরিতে পারিলাম না। যেমনি ইচ্ছা হইল, অমনি আর সবুর সহিল না। বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে নলিনের বিবাহ স্থির করিলাম, অথচ তাহাকে ভালো করিয়া চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। হায় হায়, চিনিয়া দেখিবার মতো সময় যে হাতে নাই—এখন সংসারের সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইবার জন্য তলব আসিয়াছে।"

অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ক্ষেমংকরীর মনের ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত চিন্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কথাবার্তা কহা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি অন্নদাবাবুকে কহিলেন, "দেখুন, বিবাহের সম্বন্ধে বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই। এঁদের দুজনেরই বয়স হইয়াছে, এখন এঁরা নিজেরাই বিচার

করিয়া কাজ করিবেন, আমাদের তাগিদ দেওয়াটা ভালো হইতেছে না। হেমের মনের ভাব আমি অবশ্য বুঝি না—কিন্তু আমি নলিনের কথা বলিতে পারি, সে এখনো মন স্থির করিতে পারে নাই।"

এ-কথাটা ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে বিশেষ করিয়া শুনাইবার জন্যই বলিলেন। হেমনলিনী অপ্রসন্নমনে চিন্তা করিতেছে, আর তাঁর ছেলেই যে বিবাহের প্রস্তাবে একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, এ-ধারণা তিনি অপর পক্ষের মনে জন্মিতে দিতে পারেন না।

হেমনলিনী আজ এখানে আসিবার সময় খুব একটা চেষ্টাকৃত উৎসাহ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল—সেই জন্য তাহার বিপরীত ফল হইল। ক্ষণিক উত্তেজনা একটা গভীর অবসাদের মধ্যে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন ক্ষেমংকরীর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ তাহার মনকে একটা আশঙ্কা আক্রমণ করিয়া ধরিল,—যে নূতন জীবনযাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার সম্মুখে অতিদূর-বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন ক্ষেমংকরী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন, তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত ভাবের উদয় হইল। বিবাহবন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিয়া নিজের সংশয়দোলায়িত দুর্বল অবস্থা হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা তাহার থাকাতে প্রস্তাবটাকে সে অনতিবিলম্বে পাকা করিয়া ফেলিতে চায়—অথচ প্রস্তাবটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া উপস্থিতমতো সে একটা আরামও পাইল।

ক্ষেমংকরী কথাটা বলিয়াই হেমনলিনীর মুখের ভাব কটাক্ষপাতের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন এতক্ষণ পরে হেমনলিনীর মুখের উপরে একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল। তাহাতে তাঁহার মনটা তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "আমার নলিনকে আমি এত সস্তায় বিলাইয়া দিতে বসিয়াছিলাম।" নলিনাক্ষ আজ যে আসিতে দেরি করিতেছে, ইহাতে তিনি খুশি হইলেন। হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখেছ নলিনাক্ষের আক্কেল। তোমরা আজ এখানে আসিবে সে জানে, তবু তাহার দেখা নাই। আজ না হয় কাজ কিছু কমই করিত। এই তো আমার একটু ব্যামো হলেই সে কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বাড়িতেই থাকে—তাহাতে এতই কী লোকসান হয়।"

এই বলিয়া আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার উপলক্ষে কিছুক্ষণের ছুটি লইয়া ক্ষেমংকরী উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, হেমনলিনীকে তিনি কমলার উপর ভিড়াইয়া দিয়া নিরীহ বৃদ্ধটিকে লইয়াই কথাবার্তা কহিবেন।

তিনি দেখিলেন, প্রস্তুত অন্ন মৃদু আগুনের আঁচে বসাইয়া রাখিয়া কমলা রান্নাঘরের এক কোণে চুপটি করিয়া এমন গভীরভাবে কী-একটা ভাবিতেছিল যে, ক্ষেমংকরীর হঠাৎ আবির্ভাবে সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "ওমা, আমি বলি, তুমি বুঝি রান্নার কাজে ভারি ব্যস্ত হইয়া আছ।"

কমলা কহিল, "রান্না সমস্ত সারা হইয়া গেছে মা।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তা, এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন মা? অন্নদাবাবু বুড়োমানুষ, তাঁর সামনে বাহির হইতে লজ্জা কী? হেম আসিয়াছে, তাহাকে তোমার ঘরে ডাকিয়া লইয়া একটু গল্পসল্প করো'সে। আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে বসাইয়া রাখিয়া তাহাকে দুঃখ দিব কেন?"

হেমনলিনীর নিকট হইতে প্রত্যাহত হইয়া কমলার প্রতি ক্ষেমংকরীর স্নেহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কমলা সংকুচিত হইয়া কহিল, "মা, আমি তাঁর সঙ্গে কী গল্প করিব। তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই জানি না।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সে কী কথা। তুমি কাহারও চেয়ে কম নও মা। লেখাপড়া শিখিয়া যিনি আপনাকে যত বড়োই মনে করুন, তোমার চেয়ে বেশি আদর পাইবার যোগ্য কয়জন আছে? বই পড়িলে সকলেই বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু তোমার মতো অমন লক্ষ্মীটি হওয়া কি সকলের সাধ্য? এস মা এস। কিন্তু তোমার এ-বেশে চলিবে না। তোমার উপযুক্ত সাজে তোমাকে আজ সাজাইব।"

সকল দিকেই ক্ষেমংকরী আজ হেমনলিনীর গর্ব খাটো করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রূপেও তিনি তাহাকে এই অল্পশিক্ষিতা মেয়েটির কাছে ম্লান করিতে চান। কমলা আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে ক্ষেমংকরী নিপুণহস্তে মনের মতো করিয়া সাজাইয়া দিলেন, ফিরোজা রঙের রেশমি শাড়ি পরাইলেন, নূতন ফ্যাশানের খোঁপা রচনা করিলেন — বার বার কমলার মুখ এদিকে ফিরাইয়া ওদিকে ফিরাইয়া দেখিলেন এবং মুগ্ধচিত্তে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আহা, এ রূপ রাজার ঘরে মানাইত।"

কমলা মাঝে মাঝে কহিল, "মা উঁহারা একলা বসিয়া আছেন—দেরি হইয়া যাইতেছে।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তা, হ'ক দেরি। আজ আমি তোমাকে না সাজাইয়া যাইব না।"

সাজ সারা হইলে তিনি কমলাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, "এস এস মা—লজ্জা করিয়ো না। তোমাকে দেখিয়া কালেজে-পড়া বিদুষী রূপসীরা লজ্জা পাইবেন, তুমি সকলের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পার।"

এই বলিয়া যে-ঘরে অন্নদাবাবুরা বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে ক্ষেমংকরী জোর করিয়া কমলাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, নলিনাক্ষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কমলা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু ক্ষেমংকরী তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন—কহিলেন, "লজ্জা কী মা, লজ্জা কিসের! সব আপনার লোক।"

কমলার রূপে এবং সজ্জায় ক্ষেমংকরী নিজের মনে একটা গর্ব অনুভব করিতে-ছিলেন—তাহাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হউক, এই তাঁহার ইচ্ছা। পুত্রাভিমানিনী জননী তাঁহার নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া আজ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ নলিনাক্ষের কাছেও হেমনলিনীকে খর্ব করিতে পারিলে তিনি খুশি হন।

কমলাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হেমনলিনী প্রথম দিন যখন তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছিল, তখন কমলার সাজসজ্জা কিছুই ছিল না—সে মলিনভাবে সংকুচিত হইয়া এক ধারে বসিয়া ছিল, তাও বেশিক্ষণ ছিল না। তাহাকে সেদিন ভালো করিয়া দেখাই হয় নাই। আজ মুহূর্তকাল সে বিস্মিত হইয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিতা কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার পাশে বসাইল।

ক্ষেমংকরী বুঝিলেন, তিনি জয়লাভ করিয়াছেন—উপস্থিত-সভায় সকলকেই মনে মনে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এমন রূপ দৈবপ্রসাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তিনি কমলাকে কহিলেন, "যাও তো মা, তুমি হেমকে তোমার ঘরে লইয়া গল্পসল্প করো গে যাও। আমি ততক্ষণ খাবারের জায়গা করি গে।"

কমলার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "হেমনলিনীর আমাকে কেমন লাগিবে কে জানে।"

এই হেমনলিনী এক দিন এই ঘরের বধূ হইয়া আসিবে, কর্ত্রী হইয়া উঠিবে—

ইহার স্নেহদৃষ্টিকে কমলা উপেক্ষা করিতে পারে না। এ-বাড়ির গৃহিণীপদ তাহারই ছিল কিন্তু সে-কথা সে মনেও আনিতে চায় না—ঈর্ষাকে সে কোনোমতেই অন্তরে স্থান দিবে না—তাহার কোনো দাবি নাই। তাই হেমনলিনীর সঙ্গে যাইবার সময় তাহার পা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।

হেমনলিনী আস্তে আস্তে কমলাকে কহিল, "তোমার সব কথা আমি মার কাছে শুনিয়াছি। শুনিয়া বড়ো কষ্ট হইল। তুমি আমাকে তোমার বোনের মতো দেখিয়ো ভাই। তোমার কি বোন কেহ আছে?"

কমলা হেমনলিনীর সস্নেহ সকরুণ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "আমার আপন বোন কেহ নাই, আমার একটি খুড়তুতো বোন আছে।"

হেমনলিনী কহিল, "ভাই, আমার বোন কেহ নাই। আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন আমার মা মারা গেছেন। কতবার কত সুখদুঃখের সময় ভাবিয়াছি,—মা তো নাই, তবু যদি আমার একটি বোন থাকিত। ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কোনো কথা বলিতেই পারি না। লোকে মনে করে, আমার ভারি দেমাক—কিন্তু তুমি ভাই এমন কথা কখনো মনে করিয়ো না। আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে।"

কমলার মন হইতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল—সে কহিল, "দিদি, আমাকে কি তোমার ভালো লাগিবে? আমাকে তো তুমি জান না, আমি ভারি মূর্খ।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "আমাকে যখন তুমি ভালো করিয়া জানিবে, দেখিবে, আমিও ঘোর মূর্খ। আমি কেবল গোটাকতক বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি, আর কিছুই জানি না। তাই আমি তোমাকে বলি, যদি আমার এ-বাড়িতে আসা হয়, তুমি আমাকে কখনো ছাড়িয়ো না ভাই। কোনোদিন সংসারের ভার আমার একলার হাতে পড়িয়াছে মনে করিলে আমার ভয় হয়।"

কমলা শিশুর মতো সরলচিত্তে কহিল, "ভার তুমি সমস্ত আমার উপর দিয়ো। আমি ছেলেবেলা হইতে কাজ করিয়া আসিয়াছি, আমি কোনো ভার লইতে ভয় করি না। আমরা দুই বোনে মিলিয়া সংসার চালাইব, তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।"

হেমনলিনী কহিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামীকে তো তুমি ভালো করিয়া দেখ নাই, তাঁহাকে তোমার মনে পড়ে?"

কমলা কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল, "স্বামীকে যে মনে করিতে হয়, তাহা

আমি জানিতাম না দিদি। খুড়ার বাড়িতে যখন আসিলাম, তখন আমার খুড়তুতো বোন শৈলদিদির সঙ্গে আমার ভালো করিয়া পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার স্বামীকে যে-রকম করিয়া সেবা করেন, তাহা চক্ষে দেখিয়া আমার প্রথম চৈতন্য জন্মিল। আমি যে-স্বামীকে কখনো দেখি নাই বলিলেই হয়, আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, তিনি আমাকে গ্রহণ না-ই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।"

কমলার এই ভক্তিসিঞ্চিত কথা কয়টি শুনিয়া হেমনলিনীর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া গেল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অমনি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া—তাহা নষ্ট হইয়া যায়।"

কমলা এ-কথা সম্পূর্ণ বুঝিল কি না, বলা যায় না;—সে হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া রহিল,—খানিক বাদে কহিল, "তুমি যাহা বলিতেছ দিদি, তা সত্যই হইবে। আমি মনে কোনো দুঃখ আসিতে দিই না—আমি ভালোই আছি ভাই। আমি যেটুকু পাইয়াছি, তাই আমার লাভ।"

হেমনলিনী কমলার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "যখন ত্যাগ এবং লাভ একেবারে সমান হইয়া যায়, তখনই তাহা যথার্থ লাভ, এই কথা আমার গুরু বলেন। সত্য বলিতেছি বোন, তোমার মতো অমনি সমস্ত নিবেদন করিয়া দিয়া যে-সার্থকতা, তাহাই যদি আমার ঘটে, তবে আমি ধন্য হইব।"

কমলা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন দিদি, তুমি তো সবই পাইবে, তোমার তো কোনো অভাবই থাকিবে না।"

হেমনলিনী কহিল, "যেটুকু পাইবার মতো পাওয়া, সেটুকু পাইয়াই যেন সুখী হইতে পারি—তার চেয়ে বেশি যতটুকুই পাওয়া যায়, তার অনেক ভার, অনেক দুঃখ। আমার মুখে এ-সব কথা তোমার আশ্চর্য লাগিবে—আমার নিজেরও আশ্চর্য লাগে—কিন্তু এ-সব কথা ঈশ্বর আমাকে ভাবাইতেছেন। জান না বোন, আজ আমার মনে কী ভার চাপিয়া ছিল—তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয় হালকা হইল—আমি বল পাইলাম—তাই আমি এত বকিতেছি। আমি কখনো কথা কহিতে পারি না—তুমি কেমন করিয়া আমার সব কথা টানিয়া লইতেছ ভাই?"

৫৯

ক্ষেমংকরীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমনলিনী তাহাদের বসিবার ঘরের টেবিলের উপর একখানা মস্ত ভারি চিঠি পাইল। লেফাফার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, চিঠিখানি রমেশের লেখা। স্পন্দিতবক্ষে চিঠিখানি হাতে করিয়া শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠিতে রমেশ কমলা-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছে। উপসংহারে লিখিয়াছে,

"তোমার সহিত আমার যে-বন্ধন ঈশ্বর দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন, সংসার তাহা ছিন্ন করিয়াছে। তুমি এখন অন্যের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছ—সেজন্য আমি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারি না—কিন্তু তুমিও আমাকে দোষ দিয়ো না। যদিও আমি এক দিনের জন্যও কমলার প্রতি স্ত্রীর মতো ব্যবহার করি নাই তথাপি ক্রমশ সে যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, এ-কথা তোমার কাছে আমার স্বীকার করা কর্তব্য। আজ আমার হৃদয় কী অবস্থায় আছে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করিতে, তবে তোমার মধ্যে আমি আশ্রয় লাভ করিতে পারিতাম। সেই আশ্বাসেই আমি আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ যখন স্পষ্ট দেখিলাম—তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার নিকট হইতে বিমুখ হইয়াছ, যখন শুনিলাম—অন্যের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে তুমি সম্মতি দিয়াছ, তখন আমারও মন আবার দোলায়িত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এখনো কমলাকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। ভুলি বা না ভুলি, তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর কাহারও কোনো ক্ষতি নাই। আমারই বা ক্ষতি কিসের! সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ। আজ প্রাতে যখন তোমার সহিত ক্ষণিক সাক্ষাতের বিদ্যুদ্‌বৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন এক বার মনে মনে বলিলাম, 'আমি হতভাগ্য।' কিন্তু আর আমি সে-কথা স্বীকার করিব না। আমি সবলচিত্তে আনন্দের সহিত তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি—

আমি পরিপূর্ণ-হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিব—তোমাদের কল্যাণে, বিধাতার কল্যাণে আমি অন্তরের মধ্যে এই বিদায়কালে যেন কিছুমাত্র দীনতা অনুভব না করি। তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে তুমি ঘৃণা করিয়ো না—আমাকে ঘৃণা করিবার কোনো কারণ তোমার নাই।"

অন্নদাবাবু চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। হঠাৎ হেমনলিনীকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন—কহিলেন, "হেম, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

হেমনলিনী কহিল, "অসুখ করে নাই। বাবা, রমেশবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছি। এই লও, পড়া হইলে আবার আমাকে ফেরত দিয়ো।"

এই বলিয়া চিঠি দিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল। অন্নদাবাবু চশমা লইয়া চিঠিখানি বারদুয়েক পড়িলেন—তাহার পরে হেমনলিনীর নিকট ফেরত পাঠাইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, "এ একপ্রকার ভালোই হইয়াছে। পাত্র হিসাবে রমেশের চেয়ে নলিনাক্ষ অনেক বেশি প্রার্থনীয়। ক্ষেত্র হইতে রমেশ যে আপনিই সরিয়া পড়িল, এ হইল ভালো।"

এই কথা ভাবিতেছেন, এমন-সময় নলিনাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া অন্নদাবাবু একটু আশ্চর্য হইলেন। আজ পূর্বাহ্ণে নলিনাক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে, আবার কয়েক ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই সে কী মনে করিয়া আসিল? বৃদ্ধ মনে মনে একটুখানি হাসিয়া স্থির করিলেন, "হেমনলিনীর প্রতি নলিনাক্ষের মন পড়িয়াছে।"

কোনো ছুতো করিয়া হেমনলিনীর সহিত নলিনাক্ষের দেখা করাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া যাইবেন কল্পনা করিতেছেন, এমন-সময় নলিনাক্ষ কহিল, "অন্নদাবাবু, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। কথাটা বেশিদূর অগ্রসর হইবার পূর্বে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিতে ইচ্ছা করি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "ঠিক কথা, সে তো বলাই কর্তব্য।"

নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি জানেন না, পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়াছে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "জানি। কিন্তু--"

নলিনাক্ষ। আপনি জানেন শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ আপনি অনুমান করিতেছেন। নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমন কি, তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "ঈশ্বর করুন, তাহাই যেন সত্য হয়। হেম হেম।"

হেমনলিনী আসিয়া কহিল, "কী বাবা।"

অন্নদাবাবু। রমেশ তোমাকে যে-চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে অংশটুকু—

হেমনলিনী সেই চিঠিখানি নলিনাক্ষের হাতে দিয়া কহিল, "এ-চিঠির সমস্তটাই উঁহার পড়িয়া দেখা কর্তব্য।" এই বলিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল।

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া নলিনাক্ষ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "এমন শোচনীয় ঘটনা সংসারে প্রায় ঘটে না। চিঠিখানি পড়িতে দিয়া আপনার মনে আঘাত দেওয়া হইল—কিন্তু ইহা আপনার কাছে গোপন করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হইত।"

নলিনাক্ষ একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া উঠিল। চলিয়া যাইবার সময় উত্তরের বারান্দায় অদূরে হেমনলিনীকে দেখিতে পাইল।

হেমনলিনীকে দেখিয়া নলিনাক্ষের মনে আঘাত লাগিল। ওই যে নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার স্থির-শান্ত মূর্তিটি উহার অন্তঃকরণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে? এই মুহূর্তে উহার মন যে কী করিতেছে, তাহা ঠিকমতো জানিবার কোনো উপায় নাই—নলিনাক্ষকে তাহার কোনো প্রয়োজন আছে কি না, সে-প্রশ্নও করা যায় না, তাহার উত্তর পাওয়াও কঠিন। নলিনাক্ষের পীড়িত চিত্ত ভাবিতে লাগিল, "ইহাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি না? কিন্তু মানুষে মানুষে কী দুর্ভেদ্য ব্যবধান। মন জিনিসটা কী ভয়ংকর একাকী।"

নলিনাক্ষ একটু ঘুরিয়া ওই বারান্দার সামনে দিয়া গাড়িতে উঠিবে স্থির করিল —মনে করিল, যদি হেমনলিনী তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে; বারান্দার সম্মুখে যখন আসিল, দেখিল, হেমনলিনী বারান্দা ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে সরিয়া গেছে। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ সহজ নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সরল নহে, এই কথা চিন্তা করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে নলিনাক্ষ গাড়িতে উঠিল।

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী যোগেন, একলা যে?"

যোগেন্দ্র কহিল, "দ্বিতীয় আর কোন্ ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করিতেছ শুনি?"

অন্নদা কহিলেন, "কেন? রমেশ?"

যোগেন্দ্র। তাহার প্রথম দিনের অভ্যর্থনাটাই কি ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। কাশীর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিয়া যদি তাহার শিবত্বলাভ না হইয়া থাকে, তবে আর কী হইয়াছে, আমি নিশ্চয় জানি না। কাল হইতে এ পর্যন্ত তাহার

আর দেখা নাই, টেবিলে একখানা কাগজে লেখা আছে—"পালাই—তোমার রমেশ।" এ-সব কবিত্ব আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। সুতরাং আমাকেও এখান হইতে পালাইতে হইল—আমার হেডমাস্টারিই ভালো—তাহাতে সমস্তই খুব স্পষ্ট—ঝাপসা কিছুই নাই।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমের জন্য তো একটা কিছু স্থির—"

যোগেন্দ্র। আর কেন? আমিই কেবল স্থির করিব, আর তোমরা অস্থির করিতে থাকিবে, এ-খেলা বেশি দিন ভালো লাগে না। আমাকে আর কিছুতে জড়াইয়ো না—আমি যাহা ভালো বুঝিতে পারি না, সেটা আমার ধাতে সয় না। হঠাৎ দুর্বোধ হইয়া পড়িবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা হেমের আছে, সেটা আমাকে কিছু কাবু করে। কাল সকালের গাড়িতে আমি বিদায় হইব, পথে বাঁকিপুরে আমার কাজ আছে।

অন্নদাবাবু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সংসারের সমস্যা আবার দুরূহ হইয়া আসিয়াছে।

৬০

শৈলজা এবং তাহার পিতা নলিনাক্ষের বাড়িতে আসিয়াছেন। শৈলজা কমলাকে লইয়া একটা কোণের ঘরে বসিয়া ফিসফিস করিতেছিল, চক্রবর্তী ক্ষেমংকরীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন।

চক্রবর্তী। আমার তো ছুটি ফুরাইয়া আসিল—কালই গাজিপুরে যাইতে হইবে। যদি হরিদাসী আপনাদের কোনোরকমে বিরক্ত করিয়া থাকে—বা যদি আপনাদের পক্ষে—

ক্ষেমংকরী। ও আবার কী রকম কথা চক্রবর্তীমশায়? আপনার মনের ভাবটা কী শুনি? আপনি কি কোনো ছুতা করিয়া আপনাদের মেয়েটিকে ফিরাইয়া লইতে চান?

চক্রবর্তী। আমাকে তেমন লোক পান নাই। আমি দিয়া ফিরাইয়া লইবার পাত্র নই—কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়—

ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীমশায়, ওটা আপনার সরল কথা নয়—মনে মনে বেশ জানেন, হরিদাসীর মতো অমন লক্ষ্মী মেয়েটিকে কাছে রাখিলে সুবিধার সীমা নাই, তবু—

চক্রবর্তী। না না, আর বলিতে হইবে না—আমি ধরা পড়িয়া গেছি। ওটা একটা ছলমাত্র—আপনার মুখে হরিদাসীর গুণ শুনিবার জন্যই কথাটা আমার পাড়া।

কিন্তু একটা ভাবনা আছে—পাছে নলিনাক্ষবাবু মনে করেন যে, এ আবার একটা উপসর্গ কোথা হইতে ঘাড়ে পড়িল। আমাদের মেয়েটি অভিমানী—যদি নলিনাক্ষের লেশমাত্র বিরক্তিভাব ও দেখিতে পায়, তবে উহার পক্ষে বড়ো কঠিন হইবে।

ক্ষেমংকরী। হরি বলো। নলিনের আবার বিরক্তি! ওর সে ক্ষমতাই নাই।

চক্রবর্তী। সে-কথা ঠিক। কিন্তু দেখুন, হরিদাসীকে আমি নাকি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, তাই তার সম্বন্ধে আমি অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। নলিনাক্ষ যে ওর 'পরে বিরক্ত হইবেন না, উদাসীনের মতো থাকিবেন, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। তাঁর বাড়িতে যখন হরিদাসী আছে, তখন তাকে তিনি আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করিবেন, এ না হইলে মনে বড়ো সংকোচ বোধ হয়। ও তো ঘরের দেয়াল নয়, ও একটা মানুষ—ওর প্রতি বিরক্তও হইবেন না, স্নেহও করিবেন না, ও আছে তো আছে, এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ, সেটা যেন কেমন—

ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীমশায়, আপনি বেশি ভাবিবেন না — কোনো লোককে আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করা আমার নলিনের পক্ষে শক্ত নয়। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার জো নাই, কিন্তু এই যে হরিদাসী আমার এখানে আছে, ও কিসে স্বচ্ছন্দে থাকে, ওর কিসে ভালো হয়, সে-চিন্তা নিশ্চয়ই নলিনের মনে লাগিয়া আছে, খুব সম্ভব, সে-রকম ব্যবস্থাও সে কিছু-না-কিছু করিতেছে, আমরা তাহা জানিতেও পারিতেছি না।

চক্রবর্তী। শুনিয়া বড়ো নিশ্চিন্ত হইলাম। তবু আমি যাইবার আগে এক বার বিশেষ করিয়া নলিনাক্ষবাবুকে বলিয়া যাইতে চাই। একটি স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারে, এমন পুরুষ জগতে অল্পই মেলে—ভগবান যখন নলিনাক্ষবাবুকে সেই যথার্থ পৌরুষ দিয়াছেন, তখন তিনি যেন মিথ্যা সংকোচে হরিদাসীকে তফাতে রাখিয়া না চলেন, তিনি যেন যথার্থ আত্মীয়ের মতো তাহাকে নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করেন তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাটি জানাইতে চাই।

নলিনাক্ষের প্রতি চক্রবর্তীর এই বিশ্বাস দেখিয়া ক্ষেমংকরীর মন গলিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "পাছে আপনারা কিছু মনে করেন এই ভয়েই হরিদাসীকে আমি নলিনাক্ষের সামনে তেমন করিয়া বাহির হইতে দিই নাই—কিন্তু আমার ছেলেকে আমি তো জানি, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

চক্রবর্তী। তবে আপনার কাছে সব কথা খোলসা করিয়াই বলি। শুনিয়াছি, নলিনাক্ষবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে—বধূটির বয়সও নাকি অল্প নয় এবং তাঁহার

শিক্ষাদীক্ষা আমাদের সমাজের সঙ্গে মেলে না। তাই ভাবিতেছিলাম, হয়তো হরিদাসীর—

ক্ষেমংকরী। সে আর আমি বুঝি না। সে হইলে ভাবনা ছিল বই কি। কিন্তু সে-বিবাহ হইবে না—

চক্রবর্তী। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে ?

ক্ষেমংকরী। গড়েই নি, তার ভাঙিবে কী। নলিনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, আমিই জেদ করিতেছিলাম। কিন্তু সে-জেদ ছাড়িয়াছি। যাহা হইবার নয়, তাহা জোর করিয়া ঘটাইয়া মঙ্গল নাই। ভগবানের কী ইচ্ছা জানি না—মরিবার পূর্বে বুঝি আর বউ দেখিয়া যাইতে পারিলাম না।

চক্রবর্তী। অমন কথা বলিবেন না। আমরা আছি কী করিতে ? ঘটক-বিদায় এবং মিষ্টান্ন আদায় না করিয়া ছাড়িব বুঝি ?

ক্ষেমংকরী। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্তীমশায়। আমার মনে বড়ো দুঃখ আছে যে, নলিন এই বয়সে আমারই জন্যে সংসারধর্মে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাই আমি বড়ো ব্যস্ত হইয়া সকল দিক না ভাবিয়া একটা সম্বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম —সে-আশা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনারা একটা দেখিয়া দিন। দেরি করিবেন না—আমি বেশি দিন বাঁচিব না।

চক্রবর্তী। ও-কথা বলিলে শুনিবে কেন। আপনাকে বাঁচিতেও হইবে, বউয়েরও মুখ দেখিবেন। আপনার যে-রকম বউটি দরকার, সে আমি ঠিক জানি ; নিতান্ত কচি হইলেও চলিবে না, অথচ আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, বাধ্য হইয়া চলিবে—এ নহিলে আমাদের পছন্দ হইবে না। তা সে আপনি কিছুই ভাবিবেন না—ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সে ঠিক হইয়াই আছে। এখন যদি অনুমতি করেন, এক বার হরিদাসীকে তার কর্তব্যসম্বন্ধে দু-চারটে কথা উপদেশ করিয়া আসি—অমনি শৈলকেও এখানে পাঠাইয়া দিই—আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনার কথা তাহার মুখে আর ধরে না।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "না, আপনারা তিন জনেই এক ঘরে গিয়া বসুন, আমার একটু কাজ আছে।"

চক্রবর্তী হাসিয়া কহিলেন, "জগতে আপনাদের কাজ আছে বলিয়াই আমাদের কল্যাণ কাজের পরিচয় নিশ্চয়ই যথাসময়ে পাওয়া যাইবে। নলিনাক্ষবাবুর বধূর কল্যাণে ব্রাহ্মণের ভাগ্যে মিষ্টান্নের পালা শুরু হউক।"

চক্রবর্তী, শৈল ও কমলার কাছে আসিয়া দেখিলেন, কমলার দুটি চক্ষু চোখের

জলের আভাসে এখনো ছলছল করিতেছে। চক্রবর্তী শৈলজার পাশে বসিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে এক বার চাহিলেন। শৈল কহিল, "বাবা, আমি কমলকে বলিতেছিলাম যে, নলিনাক্ষবাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার এখন সময় হইয়াছে, তাই লইয়া তোমার এই নির্বোধ হরিদাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।"

কমলা বলিয়া উঠিল, "না দিদি, না, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—তুমি এমন কথা মুখে আনিয়ো না। সে কিছুতেই হইবে না।"

শৈল কহিল, "কী তোমার বুদ্ধি। তুমি চুপ করিয়া থাক, আর হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষবাবুর বিবাহ হইয়া যাক। বিবাহের পরদিন হইতে আর আজ পর্যন্ত কেবলই তো যত রাজ্যের অঘটন-ঘটনার মধ্যে পাক খাইয়া মরিলি, আবার আর একটা নূতন অনাসৃষ্টির দরকার কী ?"

কমলা কহিল, "দিদি, আমার কথা কাহাকেও বলিবার নয়, আমি সব সহিতে পারিব, সে-লজ্জা সহিতে পারিব না। আমি যেমন আছি, বেশ আছি, আমার কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া দাও, তবে আমি কোন্ মুখে আর এক-দণ্ড এ-বাড়িতে থাকিব ? তবে আমি বাঁচিব কেমন করিয়া ?"

শৈল এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ হইয়া যাইবে, ইহা চুপ করিয়া সহ্য করা তাহার পক্ষে বড়ো কঠিন।

চক্রবর্তী কহিলেন, "যে-বিবাহের কথা বলিতেছ, সেটা ঘটিতেই হইবে, এমন কী কথা আছে।"

শৈল। বল কী বাবা, নলিনাক্ষবাবুর মা যে আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছেন।

চক্রবর্তী। বিশ্বেশ্বরের আশীর্বাদে সে-আশীর্বাদ ফাঁসিয়া গেছে। মা কমল, তোমার কোনো ভয় নাই, ধর্ম তোমার সহায় আছেন।

কমলা সব কথা স্পষ্ট না বুঝিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুড়ামশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি কহিলেন, "সে-বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে। এ-বিবাহে নলিনাক্ষবাবুও রাজি নহেন এবং তাঁহার মার মাথায়ও সুবুদ্ধি আসিয়াছে।"

শৈলজা ভারি খুশি হইয়া কহিল, "বাঁচা গেল বাবা। কাল এই খবরটা শুনিয়া রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি নাই। কিন্তু সে যাই হ'ক, কমল কি নিজের ঘরে চিরদিন এমনি পরের মতো কাটাইবে ? কবে সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে ?"

চক্রবর্তী। ব্যস্ত হ'স কেন শৈল ? যখন ঠিক সময় আসিবে, তখন সমস্ত সহজ হইয়া যাইবে।

কমলা কহিল, "এখন যা হইয়াছে, এই সহজ—এর চেয়ে সহজ আর কিছু হইতে পারে না। আমি বেশ সুখে আছি, আমাকে এর চেয়ে সুখ দিতে গিয়া আবার আমার ভাগ্যকে ফিরাইয়া দিয়ো না খুড়ামশায়। আমি তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না, আমাকে এই ঘরের একটা কোণে ফেলিয়া আমার কথা ভুলিয়া যাও। আমি খুব সুখে আছি।" বলিতে বলিতে কমলার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চক্রবর্তী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "ও কী মা, কাঁদ কেন? তুমি যাহা বলিতেছ, আমি বেশ বুঝিতেছি। তোমার এই শান্তিতে আমরা কি হাত দিতে পারি। বিধাতা আপনি যাহা ধীরে ধীরে করিতেছেন, আমরা নির্বোধের মতো তার মধ্যে পড়িয়া কি সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দিব? কোনো ভয় নাই। আমার এত বয়স হইয়া গেল, আমি কি স্থির হইয়া থাকিতে জানি না?"

এমন-সময় উমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার আকর্ণবিস্ফারিত হাস্য লইয়া দাঁড়াইল।

খুড়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে উমশে খবর কী?"

উমেশ কহিল, "রমেশবাবু নিচে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

কমলার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন—কহিলেন, "ভয় নাই মা, আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।"

খুড়া নিচে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আসুন রমেশবাবু, রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সঙ্গে গোটা-ছয়েক কথা কহিব।"

রমেশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "খুড়ামশায়, আপনি এখানে কোথা হইতে?"

খুড়া কহিলেন, "আপনার জন্যই আছি—দেখা হইল, বড়ো ভালো হইল। আসুন, আর দেরি নয়, কাজের কথাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক।" বলিয়া রমেশকে রাস্তায় টানিয়া লইয়া কিছুদূর গিয়া কহিলেন, "রমেশবাবু, আপনি এ-বাড়িতে কেন আসিয়াছেন?"

রমেশ কহিল, "নলিনাক্ষ ডাক্তারকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে কমলার কথা আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলা উচিত স্থির করিয়াছি। আমার এক-এক বার মনে হয়, হয়তো কমলা বাঁচিয়া আছে।"

খুড়া কহিলেন, "যদি কমলা বাঁচিয়াই থাকে এবং যদি নলিনাক্ষের সঙ্গে তার দেখা হয়, তবে আপনার মুখে নলিনাক্ষ সমস্ত ইতিহাস শুনিলে কি সুবিধা হইবে?

তাঁহার বৃদ্ধা মা আছেন, তিনি এ-সব কথা জানিতে পারিলে কমলার পক্ষে কি ভালো হইবে ?”

রমেশ কহিল, “সামাজিক হিসাবে কী ফল হইবে, জানি না, কিন্তু কমলাকে যে কোনো অপরাধ স্পর্শ করে নাই, সেটা তো নলিনাক্ষের জানা চাই। কমলার যদি মৃত্যুই হইয়া থাকে, তবে নলিনাক্ষবাবু তাঁহার স্মৃতিকে তো সম্মান করিতে পারিবেন।”

খুড়া কহিলেন, “আপনাদের ও-সব একেলে কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না—কমলা যদি মরিয়াই থাকে, তবে তাহার একরাত্রির স্বামীর কাছে তাহার স্মৃতিটাকে লইয়া টানাটানি করিবার কোনো দরকার দেখি না। ওই যে বাড়িটা দেখিতেছেন, ওই বাড়িতে আমার বাসা। কাল সকালে যদি এক বার আসিতে পারেন, তবে আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবেন না, এই আমার অনুরোধ।”

রমেশ বলিল, “আচ্ছা।”

খুড়া ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে কহিলেন, “মা, কাল সকালে তোমাকে আমাদের বাড়িতে যাইতে হইবে। সেখানে তুমি নিজে রমেশবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে, এই আমি স্থির করিয়াছি।”

কমলা মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, “আমি নিশ্চয় জানি, তাহা না হইলে চলিবে না—একেলে ছেলেদের কর্তব্যবুদ্ধি সেকেলে লোকের কথায় ভোলে না। মা, মন হইতে সংকোচ দূর করিয়া ফেলো—এখন তোমার যেখানে অধিকার, অন্য লোককে আর সেখানে পদার্পণ করিতে দিবে না, এ তো তোমারই কাজ। এ-সম্বন্ধে আমাদের তো তেমন জোর খাটিবে না।”

কমলা তবু মুখ নিচু করিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, “মা, অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, এখন এই ছোটোখাটো জঞ্জালগুলো শেষবারের মতো ঝাঁটাইয়া ফেলিতে সংকোচ করিয়ো না।”

এমন-সময় পদশব্দ শুনিয়া কমলা মুখ তুলিয়াই দেখিল—দ্বারের সম্মুখে নলিনাক্ষ। একেবারে তাহার চোখের উপরেই নলিনাক্ষের দুই চোখ পড়িয়া গেল—অন্যদিন নলিনাক্ষ যেমন তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিয়া যায়, আজ যেন তেমন তাড়া করিল না। যদিও ক্ষণকালমাত্র কমলার দিকে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই ক্ষণকালের দৃষ্টি কমলার মুখ হইতে কী যেন আদায় করিয়া লইল, অন্যদিনের মতো অনধিকারের সংকোচে দেখিবার জিনিসটিকে প্রত্যাখ্যান করিল না। পরমুহূর্তেই শৈলজাকে

দেখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই খুড়া কহিলেন, "নলিনাক্ষবাবু, পালাইবেন না— আপনাকে আমরা আত্মীয় বলিয়াই জানি। এটি আমার মেয়ে শৈল, এরই মেয়েকে আপনি চিকিৎসা করিয়াছেন।" শৈল নলিনাক্ষকে নমস্কার করিল এবং নলিনাক্ষ প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মেয়েটি ভালো আছে?"

শৈল কহিল, "ভালো আছে।"

খুড়া কহিলেন, "আপনাকে যে পেট ভরিয়া দেখিয়া লইব এমন অবসর তো আপনি দেন না—এখন, আসিলেন যদি তো একটু বসুন।"

নলিনাক্ষকে বসাইয়া খুড়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে কমলা কখন সরিয়া পড়িয়াছে। নলিনাক্ষের সেই একমুহূর্তের দৃষ্টিটি লইয়া সে পুলকিত বিস্ময়ে আপনার ঘরে মনটাকে সংবরণ করিতে গেছে।

ইতিমধ্যে ক্ষেমংকরী আসিয়া কহিলেন, "চক্রবর্তীমশায়, কষ্ট করিয়া এক বার উঠিতে হইতেছে।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "যখনই আপনি কাজে গেলেন, তখন হইতেই এটুকু কষ্টের জন্য আমি পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম।"

আহার সমাধা হইলে পর বসিবার ঘরে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, "একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" বলিয়া পরক্ষণেই অন্য ঘর হইতে কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে নলিনাক্ষ ও ক্ষেমংকরীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শৈলজাও আসিল।

চক্রবর্তী কহিলেন, "নলিনাক্ষবাবু, আপনি আমাদের হরিদাসীকে পর মনে করিয়া সংকোচ করিবেন না—এই দুঃখিনীকে আপনাদেরই ঘরে আমি রাখিয়া যাইতেছি— ইহাকে সম্পূর্ণই আপনাদের করিয়া লইবেন। ইহাকে আর কিছু দিতে হইবে না, আপনাদের সকলের সেবা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিবেন—আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনাদের কাছে জ্ঞানপূর্বক এ এক দিনের জন্যও অপরাধিনী হইবে না।"

কমলা লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া নতশিরে বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "চক্রবর্তীমশায়, আপনি কিছুই ভাবিবেন না, হরিদাসী আমাদের ঘরের মেয়েই হইল। ওকে আমাদের কোনো কাজ দিবার জন্য আমাদের তরফ হইতে আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা করিবার দরকারই হয় নাই। এ-বাড়ির রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে এতদিন আমার শাসনই একমাত্র প্রবল ছিল, এখন আমি সেখানে কেহই না। চাকরবাকররাও আমাকে আর বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্যই করে না। কেমন করিয়া যে আস্তে আস্তে আমার এমন অবস্থাটা হইল, তাহা আমি টেরও পাইলাম না। আমার গোটাকয়েক

চাবি ছিল, সেও কৌশল করিয়া হরিদাসী আত্মসাৎ করিয়াছে—চক্রবর্তীমশায়, আপনার এই ডাকাত মেয়েটির জন্যে আপনি আর কী চান বলুন দেখি? এখন সব চেয়ে বড়ো ডাকাতি হয়, যদি আপনি বলেন, এই মেয়েটিকে আমরা লইয়া যাইব।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আমি যেন বলিলাম, কিন্তু মেয়েটি কি নড়িবে? তা মনেও করিবেন না। উহাকে আপনারা এমন ভুলাইয়াছেন যে, আজ আপনারা ছাড়া ও আর পৃথিবীতে কাহাকেও জানে না। দুঃখের জীবনে এতদিন পরে ও আপনাদের কাছেই আজ শান্তি পাইয়াছে—ভগবান ওর সেই শান্তি নির্বিঘ্ন করুন, আপনারা চিরদিন ওর 'পরে প্রসন্ন থাকুন, আমরা উহাকে সেই আশীর্বাদ করি।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নলিনাক্ষ কিছু না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চক্রবর্তীর কথা শুনিতেছিল; যখন সকলে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন ধীরে ধীরে সে আপনার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন শীতের সূর্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই রক্ত-বর্ণের আভা নলিনাক্ষের সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে যেন রাঙাইয়া তুলিল।

আজ সকালে নলিনাক্ষের এক হিন্দুস্থানি বন্ধুর কাছ হইতে এক টুকরি গোলাপ আসিয়াছিল। ঘর সাজাইবার জন্য সেই গোলাপের টুকরি ক্ষেমংকরী কমলার হাতে দিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের শয়নঘরের প্রান্তে একটি ফুলদানি হইতে সেই গোলাপের গন্ধ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ ঘরের বাতায়নে আরক্ত সন্ধ্যার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ মিশিয়া নলিনাক্ষের মনকে কেমন যেন উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন তাহার বিশ্বে চারিদিকে সংযমের শান্তি, জ্ঞানের গম্ভীরতা ছিল, আজ সেখানে হঠাৎ এমন নানাসুরের নহবত বাজিয়া উঠিল কোথা হইতে—কোন্ অদৃশ্য নৃত্যের চরণক্ষেপে ও নূপুরঝংকারে আজ আকাশতল এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

নলিনাক্ষ জানলা হইতে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহার বিছানার শিয়রের কাছে কুলুঙ্গির উপরে গোলাপফুলগুলি সাজানো রহিয়াছে। এই ফুলগুলি জানি না কাহার চোখের মতো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নিঃশব্দ আত্মনিবেদনের মতো তাহার হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে নত হইয়া পড়িল।

নলিনাক্ষ ইহার মধ্যে একটি ফুল তুলিয়া লইল—সেটি কাঁচা সোনার রঙের হলদে গোলাপ, পাপড়িগুলি খোলে নাই, কিন্তু গন্ধ লুকাইতে পারিতেছে না। সেই গোলাপটি হাতে লইতেই যেন সে কাহার আঙুলের মতো তাহার আঙুলকে স্পর্শ

করিল, তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্তুকে রিম্‌ঝিমি করিয়া বাজাইয়া তুলিল। নলিনাক্ষ সেই স্নিগ্ধকোমল ফুলটিকে নিজের মুখের উপরে, চোখের পল্লবের উপরে বুলাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাশ হইতে অস্তসূর্যের আভা মিলাইয়া আসিল। নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বে এক বার তাহার বিছানার কাছে গিয়া শয্যার আচ্ছাদনটি তুলিয়া ফেলিল এবং মাথার বালিশের উপর সেই গোলাপফুলটি রাখিল। রাখিয়া উঠিয়া আসিবে, এমন সময় খাটের ওপাশে মেঝের উপরে ও কে অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চাহিল। হায় রে কমলা, লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই। সে আজ কুলুঙ্গিতে গোলাপ সাজাইয়া স্বহস্তে নলিনাক্ষের বিছানা করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ নলিনাক্ষের পায়ের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ওপাশে গিয়া লুকাইয়াছিল—এখন পালানোও অসম্ভব, লুকানোও কঠিন। তাহার রাশীকৃত-লজ্জা-সমেত এই ধূলির উপরে সে এমন একান্তভাবে ধরা পড়িয়া গেল।

নলিনাক্ষ এই লজ্জিতাকে মুক্তি দিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। দরজা পর্যন্ত গিয়া এক বার দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ কী ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল—কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি ওঠো, আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই।"

৬১

পরদিন সকালেই কমলা খুড়ামশায়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। যখনই নির্জনে একটু অবকাশ পাইল, অমনি সে শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিল—শৈল কমলার চিবুক ধরিয়া কহিল, "কী বোন, এত খুশি কিসের ?"

কমলা কহিল, "আমি জানি না দিদি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যেন আমার জীবনের সমস্ত ভার চলিয়া গেছে।

শৈল। বল্ না, সব কথা বল্ না আমাকে। এই তো কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ছিলাম, তার পরে তোর হইল কী ?

কমলা। এমন কিছুই হয় নাই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে, আমি যেন তাঁহাকে পাইয়াছি—ঠাকুর যেন আমার 'পরে সদয় হইয়াছেন।

শৈল। তাই হ'ক বোন, কিন্তু আমার কাছে কিছু লুকোস নে।

কমলা। আমার লুকাইবার কিছুই নাই দিদি, কী যে বলিবার আছে, তাও খুঁজিয়া পাই না। রাত পোহাইতেই সকালে উঠিয়া মনে হইল আমার জীবনটা সার্থক—আমার সমস্ত দিনটা এমন মিষ্ট, আমার সমস্ত কাজ এমন হালকা হইয়া গেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ইহার চেয়ে আর বেশি কিছুই চাই না—কেবল ভয় হয় পাছে এটুকু নষ্ট হয়—আমি যে প্রতিদিন এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারিব, আমার ভাগ্য যে এত প্রসন্ন হইবে, তাহা আমি মনে করিতেই পারি না।

শৈল। আমি তোকে বলিতেছি বোন, তোর ভাগ্য তোকে এইটুকু দিয়াই ফাঁকি দিবে না, তোর যাহা পাওনা আছে, তার সমস্তই শোধ হইবে।

কমলা। না না দিদি, ও-কথা বলিয়ো না—আমার সমস্ত শোধ হইয়াছে, আমি বিধাতাকে কোনো দোষ দিই না, আমার কোনো অভাব নাই।

এমন সময় খুড়া আসিয়া কহিলেন, "মা, তোমাকে তো এক বার বাহিরে আসিতে হইতেছে—রমেশবাবু আসিয়াছেন।"

খুড়া এতক্ষণ রমেশের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলেন। রমেশকে বলিতেছিলেন, "আপনার সঙ্গে কমলার কী সম্বন্ধ, তাহা আমি সমস্তই জানিয়াছি। এখন আপনার প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, আপনার জীবন এখন পরিষ্কার হইয়া গেছে, এখন আপনি কমলার সমস্ত প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করুন। কমলা সম্বন্ধে যদি কোনো গ্রন্থি কোথাও মোচন করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে বিধাতার উপর সে-ভার দিন, আপনি আর হাত দিবেন না।"

রমেশ ইহার উত্তরে কহিতেছিল, "কমলা সম্বন্ধে সকল কথা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবার পূর্বে নলিনাক্ষের কাছে সকল ঘটনা না জানাইয়া আমার নিষ্কৃতি হইতেই পারে না। এ-পৃথিবীতে কমলার কথা তুলিবার সমস্ত প্রয়োজন হয়তো শেষ হইয়া গেছে, হয়তো শেষ হয় নাই—যদি না হইয়া থাকে, তবে আমার যেটুকু বক্তব্য, সেটুকু সারিয়া ছুটি পাইতে চাই।"

খুড়া কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি একটুখানি বসুন, আমি আসিতেছি।"

রমেশ ঘুরিয়া বসিয়া জানলা হইতে শূন্যদৃষ্টিতে লোকপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিল—কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দে সতর্ক হইয়া দেখিল, একটি রমণী ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। যখন সে প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন রমেশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কমলা!" কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়া কহিলেন, "রমেশবাবু, কমলার সমুদয় দুঃখকে সৌভাগ্যে পরিণত করিয়া

ঈশ্বর তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাকে পরম সংকটের সময় যেমন রক্ষা করিয়াছেন, তাহার জন্য যে বিষম দুঃখ আপনাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদনের সময় কোনো কথা না বলিয়া কমলা বিদায় লইতে পারে না। আপনার কাছে ও আজ আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছে।"

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সবলে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "তুমি সুখী হও কমলা—আমি না জানিয়া এবং জানিয়া তোমার কাছে যা-কিছু অপরাধ করিয়াছি, সব মাপ করিয়ো।"

কমলা ইহার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না—দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, "যদি কাহাকেও কিছু বলিবার জন্য, কোনো বাধা দূর করিবার জন্য, আমাকে তোমার প্রয়োজন থাকে তো বলো।"

কমলা জোড়হাত করিয়া কহিল, "আমার কথা কাহারও কাছে বলিবেন না, আমার এই মিনতি রাখিবেন।"

রমেশ কহিল, "অনেকদিন তোমার কথা কাহারও কাছে বলি নাই—খুব গোলমালে পড়িলেও চুপ করিয়া কাটাইয়াছি। অল্পদিন হইল, যখন মনে করিয়াছিলাম, তোমার কথা বলিলে তোমার কোনো ক্ষতি হইবে না, তখনই কেবল একটি পরিবারের কাছে তোমার কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতেও বোধ হয় তোমার অনিষ্ট না হইয়া ভালোই হইতে পারে। খুড়ামশায় বোধ হয় খবর পাইয়া থাকিবেন—অন্নদাবাবু, যাঁহার মেয়ের সঙ্গে—"

খুড়া কহিলেন, "হেমনলিনী, জানি বই কী। তাঁহারা সব শুনিয়াছেন?"

রমেশ কহিল, "হাঁ। তাঁহাদের কাছে আর কিছু বলা যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি যাইতে পারি—কিন্তু আমার আর ইচ্ছা নাই—আমার অনেক সময় গেছে এবং আরও আমার অনেক গেছে, এখন আমি মুক্তি চাই—হাতনাগাদ সমস্ত দেনা-পাওনা শোধ করিয়া দিয়া এখন বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।"

খুড়া রমেশের হাত ধরিয়া সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, "না রমেশবাবু, আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। আপনাকে অনেক বহন করিতে হইয়াছে, এখন ভারমুক্ত হইয়া নিজেকে স্বাধীনভাবে চালনা করুন, সুখী হউন, সার্থক হউন, এই আমার আশীর্বাদ।"

যাইবার সময় রমেশ কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তবে চলিলাম।"

কমলা কোনো কথা না কহিয়া আর-এক বার ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া রমেশকে প্রণাম করিল।

রমেশ পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল; "কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালোই হইল, দেখা না হইলে এ পালাটা ভালো করিয়া শেষ হইত না। যদিও ঠিক জানিলাম না, কমলা কী জানিয়া কী বুঝিয়া সে-রাত্রে হঠাৎ গাজিপুরের বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ইহা বুঝা গেছে, আমি এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া—এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম—আমার আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।"

৬২

কমলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর কাছে বসিয়া আছে। কমলাকে দেখিয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এই যে হরিদাসী তোমার বন্ধুকে তোমার ঘরে লইয়া যাও বাছা। আমি অন্নদাবাবুকে চা খাওয়াইতেছি।"

কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়াই হেমনলিনী কমলার গলা ধরিয়া কহিল, "কমলা।"

কমলা খুব বেশি বিস্মিত না হইয়া কহিল, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমার নাম কমলা।"

হেমনলিনী কহিল, "একজনের কাছে আমি তোমার জীবনের ঘটনা সব শুনিয়াছি। যেমনি শুনিলাম, অমনি তখনই আমার মনে সন্দেহ রহিল না, তুমিই কমলা। কেন যে, তা বলিতে পারি না।"

কমলা কহিল, "ভাই, আমার নাম যে কেহ জানে, সে আমার ইচ্ছা নয়। আমার নিজের নামে একেবারে ধিক্‌কার জন্মিয়া গেছে।"

হেমনলিনী কহিল, "কিন্তু ওই নামের জোরেই তো তোমাকে তোমার অধিকার পাইতে হইবে।"

কমলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "ও আমি বুঝি না। আমার জোর কিছুই নাই, আমার অধিকার কিছুই নাই, আমি জোর খাটাইতেই চাই না।"

হেমনলিনী কহিল, "কিন্তু তোমার স্বামীকে তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবে কী বলিয়া। তোমার ভালোমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না? তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে?"

হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল—সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায়ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আস্তে আস্তে কমলা

মেজের মাদুরের 'পরে বসিয়া পড়িল,—কহিল, "ভগবান তো জানেন, আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকে এমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন? যে-পাপ আমার নয়, তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন? আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সব কথা প্রকাশ করিব?"

হেমনলিনী কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "শাস্তি নয় ভাই, তোমার মুক্তি হইবে। যতদিন তুমি তোমার স্বামীর কাছে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতেছ—ততদিন তুমি আপনাকে একটা মিথ্যার বন্ধনে জড়িত করিতেছ—তাহা তেজের সহিত ছিঁড়িয়া ফেলো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেনই।"

কমলা কহিল, "আবার পাছে সব হারাই, এই ভয় যখন মনে আসে, তখন সব বল চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি যা বলিতেছ, আমি তা বুঝিয়াছি—অদৃষ্টে যা থাকে তা হ'ক, কিন্তু তাঁর কাছে আপনাকে লুকানো আর চলিবে না—তিনি আমার সবই জানিবেন।" এই বলিতে বলিতে সে আপনার দুই হাত দৃঢ়বলে বদ্ধ করিল।

হেমনলিনী সকরুণচিত্তে কহিল, "তুমি কি চাও,—আর কেহ তোমার কথা তাঁহাকে জানায়?"

কমলা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না না, আর কাহারও মুখ হইতে তিনি শুনিবেন না—আমার কথা আমিই তাঁহাকে বলিব—আমি বলিতে পারিব।"

হেমনলিনী কহিল, "সেই কথাই ভালো। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না, জানি না। আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?"

হেমনলিনী কহিল, "কলিকাতায়। তোমাদের সকালে কাজকর্ম আছে—আমরা আর দেরি করিব না। আমি তবে আসি ভাই। বোনকে মনে রাখিয়ো।"

কমলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমাকে চিঠি লিখিবে না?"

হেমনলিনী কহিল, "আচ্ছা, লিখিব।"

কমলা কহিল, "কখন কী করিতে হইবে, আমাকে তুমি উপদেশ দিয়া লিখিয়ো; আমি জানি, তোমার চিঠি পাইলে আমি বল পাইব।"

হেমনলিনী একটু হাসিয়া কহিল, "আমার চেয়ে ভালো উপদেশ দিবার লোক তুমি পাইবে, সেজন্য কিছুই ভাবিয়ো না।"

আজ হেমনলিনীর জন্য কমলা মনের মধ্যে বড়োই একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কী-একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া কমলার

চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল। কিন্তু হেমনলিনীর কেমন-একটা দূরত্ব আছে—তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কী রাখিয়া গেল, যাহা বিলীয়মান গোধূলির মতো অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।

গৃহকর্মের অবকাশকালে আজ সমস্ত দিন কেবলই হেমনলিনীর কথাগুলি এবং তাহার শান্ত-সকরুণ চোখের দৃষ্টি কমলার মনকে আঘাত দিতে লাগিল। কমলা হেমনলিনীর জীবনের আর কোনো ঘটনা জানিত না—কেবল জানিত, নলিনাক্ষের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া গেছে। হেমনলিনী তাহাদের বাগান হইতে আজ এক সাজি ফুল আনিয়া দিয়াছিল। বৈকালে গা ধুইয়া আসিয়া কমলা সেই ফুল-গুলি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মাঝে এক বার ক্ষেমংকরী আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আহা মা, আজ হেম যখন আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, আমার মনের মধ্যে যে কী করিতে লাগিল, বলিতে পারি না। যে যাই বলুক, হেম মেয়েটি বড়ো ভালো। আমার এখন কেবলই মনে হইতেছে, উহাকে যদি আমাদের বউ করিতাম তো বড়ো সুখের হইত। আর একটু হইলেই তো হইয়া যাইত—কিন্তু আমার ছেলেটিকে তো পারিবার জো নাই—ও যে কী ভাবিয়া বাঁকিয়া বসিল, তা সে ও-ই জানে।"

শেষকালে তিনিও যে এই বিবাহের প্রস্তাবে বিমুখ হইয়াছিলেন, সে-কথা ক্ষেমংকরী আর মনের মধ্যে আমল দিতে চান না।

বাহিরে পায়ের শব্দ শুনিয়া ক্ষেমংকরী ডাকিলেন, "ও নলিন, শুনে যা।"

কমলা তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে ফুল ও মালা ঢাকিয়া ফেলিয়া মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিলে ক্ষেমংকরী কহিলেন, "হেমেরা যে আজ চলিয়া গেল—তোর সঙ্গে কি দেখা হয় নাই ?"

নলিন কহিল, "হাঁ, আমি যে তাঁহাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "যাই বলিস বাপু, হেমের মতো মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।" যেন নলিনাক্ষ এ-সম্বন্ধে বরাবর তাহার প্রতিবাদ করিয়াই আসিয়াছে। নলিনাক্ষ চুপ করিয়া একটুখানি হাসিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "হাসলি যে বড়ো! আমি তোর সঙ্গে হেমের সম্বন্ধ করিলাম, আশীর্বাদ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম, আর তুই যে জেদ করিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিলি, এখন তোর মনে কি একটু অনুতাপ হইতেছে না ?"

নলিনাক্ষ এক বার চকিতের মতো কমলার মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, দেখিল, কমলা উৎসুকনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র কমলা লজ্জায় মাটি হইয়া চোখ নিচু করিল।

নলিনাক্ষ কহিল, "মা তোমার ছেলে কি এমনই সৎপাত্র যে, তুমি সম্বন্ধ করিলেই হইল? আমার মতো নীরস গম্ভীর লোককে সহজে কি কারও পছন্দ হইতে পারে।"

এই কথায় কমলার চোখ আপনি আবার উপরে উঠিল—উঠিবামাত্র নলিনাক্ষের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপরেই পড়িয়াছে,—এবার কমলার মনে হইতে লাগিল, ঘর হইতে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচি।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "যা যা, আর বকিস নে, তোর কথা শুনিলে আমার রাগ ধরে।"

এই সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে পর কমলা হেমনলিনীর সব কটি ফুল লইয়া একটি বড়ো মালা গাঁথিল। ফুলের সাজির উপরে সেই মালাটি লইয়া জলের ছিটা দিয়া সেটি নলিনাক্ষের উপাসনাঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ বিদায় হইয়া যাইবার দিনে এইজন্যই হেমনলিনী সাজি ভরিয়া ফুল আনিয়াছিল—মনে করিয়া তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

তাহার পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে নলিনাক্ষের সেই দৃষ্টিপাত কমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ কমলাকে কী মনে করিতেছে? কমলার মনের কথা যেন নলিনাক্ষের কাছে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা পূর্বে যখন নলিনাক্ষের সম্মুখে বাহির হইত না, তখন সে একরকম ছিল ভালো। এখন প্রতিদিন কমলা তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। আপনাকে গোপন করিয়া রাখিবার এই তো শাস্তি। কমলা ভাবিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ মনে মনে বলিতেছেন, 'এই হরিদাসী মেয়েটিকে মা কোথা হইতে আনিলেন, এমন নির্লজ্জ তো দেখি নাই।' নলিনাক্ষ যদি এক মুহূর্তও এমন কথা মনে করে, তবে তো সে অসহ্য।"

কমলা রাত্রে বিছানায় শুইয়া মনে মনে খুব জোর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "যেমন করিয়া হউক, কালই আপনার পরিচয় দিতে হইবে, তাহার পরে যাহা হয় তাহা হউক।

পরদিন কমলা প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নানের পর প্রতিদিন সে একটি ছোটো ঘটিতে গঙ্গাজল আনিয়া নলিনাক্ষের উপাসনাঘরটি ধুইয়া মার্জনা করিয়া তবে অন্য কাজে মন দিত। আজও সে তার দিবসের প্রথম কাজটি সারিতে গিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ আজ সকাল-সকাল তাহার উপাসনাঘরে প্রবেশ করিয়াছে—এমন

তো কোনোদিন হয় নাই। কমলা তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কাজের একটা ভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। খানিকটা দূর গিয়া সে হঠাৎ থামিল—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কী-একটা ভাবিল। তার পরে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া উপাসনাঘরের দ্বারের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে যে কিসে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, তাহা সে জানে না ; সমস্ত জগৎ তাহার কাছে ছায়ার মতো হইয়া আসিল, সময় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল, তাহা তাহার বোধ রহিল না। হঠাৎ এক সময় দেখিল, নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা মুহূর্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখনি ভূতলে হাঁটু গাড়িয়া একেবারে নলিনাক্ষের পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—তাহার সদ্যস্নানে আর্দ্র চুলগুলি নলিনের পা ঢাকিয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল—তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে—সে যেন দেখিতেই পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, সে একটি অন্তরের চৈতন্য-আভায় অপূর্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, "আমি কমলা।"

এই কথাটি বলিবার পরেই তাহার আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল—তাহার একাগ্র চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল। তখন তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—মাথা নত হইয়া গেল—সেখান হইতে নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল—সে তাহার সমস্ত বল, সমস্ত পণ, "আমি কমলা" এই একটি কথায় নলিনাক্ষের পায়ের কাছে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে—নিজের কাছে নিজের লজ্জা রক্ষা করিবার কোনো উপায় সে আর হাতে রাখে নাই, এখন সমস্তই নলিনাক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর। নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল, "আমি জানি, তুমি আমার কমলা। এস, আমার ঘরে এস।"

উপাসনাঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল, "এস, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।" দুইজনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেতপাথরের মেজের উপরে নত হইল, জানলা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুই জনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া আর-এক বার নলিনাক্ষের পায়ের ধুলা লইয়া যখন কমলা দাঁড়াইল, তখন তাহার দুঃসহ লজ্জা আর তাহাকে পীড়ন করিল না। হর্ষের উল্লাস নহে, কিন্তু একটি বৃহৎ মুক্তির অচঞ্চল শান্তি তাহার অস্তিত্বকে প্রভাতের অকুণ্ঠিত

উদার-নির্মল আলোকের সহিত ব্যাপ্ত করিয়া দিল। একটি গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার অন্তরের পূজা সমস্ত বিশ্বকে ধূপের পুণ্য গন্ধে বেষ্টন করিল। দেখিতে দেখিতে কখন অজ্ঞাতসারে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তাহার দুই কপোল দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, আর থামিতে চাহিল না, তাহার অনাথ জীবনের সমস্ত দুঃখের মেঘ আজ আনন্দের জলে ঝরিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ তাহাকে আর কোনো কথা না বলিয়া একবার কেবল দক্ষিণ হস্তে তাহার ললাট হইতে সিক্ত কেশ সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

কমলা তাহার পূজা এখনো শেষ করিতে পারিল না—তাহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ধারা এখনো সে ঢালিতে চায়—তাই সে নলিনাক্ষের শোবার ঘরে গিয়া আপনার গলার মালা দিয়া সেই খড়মজোড়াকে জড়াইল এবং তাহা আপনার মাথায় ঠেকাইয়া যত্নপূর্বক যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল।

তার পরে সমস্ত দিন তাহার গৃহকর্ম যেন দেবসেবার মতো মনে হইতে লাগিল। প্রত্যেক কর্মই যেন আকাশে এক-একটি আনন্দের তরঙ্গের মতো উঠিল পড়িল। ক্ষেমংকরী তাহাকে কহিলেন, "মা, তুমি করিতেছ কী? এক দিনে সমস্ত বাড়িটাকে ধুইয়া মাজিয়া মুছিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিবে না কি?"

বৈকালের অবকাশের সময় আজ আর সেলাই না করিয়া কমলা তাহার ঘরের মেজের উপরে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় নলিনাক্ষ একটি টুকরিতে গুটিকয়েক স্থলপদ্ম লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—কহিল, "কমলা, এই ফুল কটি তুমি জল দিয়া তাজা করিয়া রাখো, আজ সন্ধ্যার পর আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করিতে যাইব।"

কমলা মুখ নত করিয়া কহিল, "কিন্তু আমার সব কথা তো শোন নাই।"

নলিনাক্ষ কহিল, "তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি সব জানি।"

কমলা দক্ষিণ করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া কহিল, "মা কি—" বলিয়া কথা শেষ করিতে পারিল না।

নলিনাক্ষ তাহার মুখ হইতে হাত নামাইয়া ধরিয়া কহিল, "মা তাঁহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে, তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।"

প্রবন্ধ

বিচিত্র প্রবন্ধ

এই গ্রন্থের পরিচয় আছে "বাজে কথা" প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।

বিচিত্র প্রবন্ধ

লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে— কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এস এখানে এস, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন— তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ-বিদেশ হইতে অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব। সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে। জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব।

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় এক বার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

১২৯২

মা ভৈঃ

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালোবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালোবাস তাহারও চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাসমার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে-লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে এক বার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব, এ-কথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না, এ-কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে, "চাই।" নয়, বীর্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে, "চাই না।" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই;—এমন ধিক্‌কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুশকিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্তা যতই বড়ো হ'ক, কাহারও কাছে সে খাতির দাবি করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর এবং নাকিসুর লাগে। না মরিলে সেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালোমন্দ কোনো-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সংগতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড়ো দুর্ভাগ্য, এত-বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে।

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধ্‌জাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জান; যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস করিতে যাইবে!"

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য, যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসংগত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অতএব, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া পোলিটিক্যাল সুখস্বপ্নে যখন কল্পনা করি—সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছে, তখন মাঝখানে এই একটা দুশ্চিন্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গে শিখ আপন ভাইয়ের মতো মিশিবে কেন? বাঙালি বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় পাস হইয়াছে বলিয়া? কিন্তু যখন তাহার চেয়ে কড়া পরীক্ষার

কথা উঠিবে, তখন সার্টিফিকেট বাহির করিব কোথা হইতে? শুদ্ধমাত্র কথায় অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন চিঁড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে পারে না; তেমনি যেখানে রক্তের প্রয়োজন সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনো দেশেই লোকনির্বিশেষে নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প এক দল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব করিতে হয়, তবে, আমার সাহস আছে, এই মিথ্যা গর্বই সব চেয়ে মার্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মতো এত-ছোটো আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে-লোক মিথ্যা অহংকারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে, এ সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিযাছিলেন, এ-কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল,—লজ্জায় হ'ক, প্রেমে হ'ক, ধর্মোৎসাহে হ'ক, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে-জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে

আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনো স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতিদ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমর স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসন-খানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।

১৩০৯

পাগল

পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খ'ড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং প'ড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই শহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরি লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে ; তা হউক, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে

হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধু-হাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবি লোক--সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্র-মেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরি কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্তমানের কাছে বিকাইলাম।

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবি করে না ;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিব্য গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহূর্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত খেই হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা কাজের পক্ষে বড়োই মুশকিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়োদিন ; এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়,—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর এক-একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের খ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খ্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কি না, এ-কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ-কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা খ্যাপামি বই কী, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলটপালট করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার

ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্তি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—সুন্দর শান্তচ্ছবি।

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে এক ফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এই জন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "সেন্ট্রিফ্যুগল"—তিনি কেবলই নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই, তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইহার নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা

হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইহারই কীর্তি এবং প্রতিভাও ইহারি কীর্তি। ইহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব স্বরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান! পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবানও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর, তাহার জলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার এক-টানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ওই রাস্তা, ওই খ'ড়ো চাল দেওয়া মুদির দোকান, ওই ভাঙা ভিটা, ওই সরু গলি, ওই গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই কটা জিনিসের মধ্যেই নজরবন্দি করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ব, অপরিচিত, অপরূপ, এই মুদির দোকানের খ'ড়ো চালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, যে-আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে-আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য এই যে, ওই সম্মুখের দৃশ্য, ওই কাছের জিনিস আমার কাছে একটি বহুসুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশংকরের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এমনি করিয়া হঠাৎ এক দিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতি-মুহূর্তের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাহার মতো দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিস কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালোরূপ জানি মনে করিয়া তাহার চারি দিকে সীমানা আঁকিয়া-দিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিয়াছিলাম, সে দেখি, কখন এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক দিয়া, স্থিতির দিক দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তরসংগত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক হইতে, ওই শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না—আশ্চর্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই এ কে। যে এক দিকে ঘরের, সে আর-এক দিকে অন্তরের, যে এক দিকে কাজের সে আর-এক দিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে এক দিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর-এক দিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত—যে এক দিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-এক দিকে ভয়ংকর খাপছাড়া, আপনাতে আপনি।

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারি দিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিতেছিলাম, আপিসের বড়ো সাহেবের মতো অত্যন্ত এক জন সুগম্ভীর হিসাবি লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়ো সাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো, সেই মস্ত বে-হিসাবি পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে-স্থলে-আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল; আমার জরুরি কাজের বোঝা ওই সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম—তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণ চূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক।

১৩১১

রঙ্গমঞ্চ

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সতিনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতিন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত সে-সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়; রাগিণী-হিসাবে সে-বেচারার কোনোকালে পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য, তাহা আপনার সংগীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সংগীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ-অঙ্গের সংগীত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে; তাহা কথার জন্য কালিদাস-মিলটনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে—কিন্তু সে কতকটা খেলা-হিসাবে—তাহা হাটের জিনিস—তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে স্বষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ-কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ-কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে-অভিনয়ে যে-কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না, সে-কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ-কথা বলিতে পার যে, অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব করে, তবে সে-ও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, "আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনোই ক্ষতি নাই।"

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্ম-প্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয়, সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে;—তাহার বেশি সে যাহা কিছু অবলম্বন করে, তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়া যে-দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজের সম্বল কানা-কড়াও নাই? সে কি শিশু? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই

নির্ভর করিবার জো নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।

এ তো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবি বন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ।

দুষ্মন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত—সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্তমান দেখিতে পাই, তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়—কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওইজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে—একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে?

শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটানো বন্ধ করিতেন। অবশ্য, তিনি বড়ো কবি—রথ বন্ধ হইলেও যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত, তাহা নহে—কিন্তু আমি বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্য যাহা বড়ো তাহা কেন নিজেকে কোনো অংশে খর্ব করিতে যাইবে? ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে-রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই।

সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকরের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব যখন দুষ্মন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়;—অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য ত্রুটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জনা করেন এবং নিজের চিত্ত-ক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাটো হইতে হইত, তবে ওই কয়েকটা হতভাগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত?

শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কণ্বাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর কাহারও উপর কোনো বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কি চরিত্রসৃজনে, কি স্বভাবচরিত্রে নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই—তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ—অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিত-ভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা—সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিসটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য;—তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া

আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরব-দান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এবং যেখানে অজীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব, সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য ক্রমশই ভীষণরূপে বাড়িয়া চলে—অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাটনিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।

১৩০৯

কেকাধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—আমি ওই ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা, দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি বা কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লীর ঝংকারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্ঋতুর মহাসংগীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের

লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে—ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে;—বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলই মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার, এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে; মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে-লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না,—আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুশি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন, ঢের হইয়াছে।

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে, তাহা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না—এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে। আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না!

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ-আনন্দ ভোগ করিবার উপায়

নাই। উপর হইতেই চট করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর, তাহা আপাতত বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে এক বার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। "পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা"—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে—সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ব-বাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়;—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতি-মধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানারঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো,—ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

> মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
> ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই,—শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ওই বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরও ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লীরব ভালোরূপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লীরবও আর-একটা আচ্ছাদনবিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষা-নিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

১৩০৮

বাজে কথা

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে-রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে-পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে, সে-পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে; আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত

উক্ত ভদ্রলোক তাবচ্চ শোভতে যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তখনি তাঁহার বিপদ, যখনি তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে-লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না; হয় বেদবাক্য বলে, নয় চুপ করিয়া থাকে; হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

পৃথিবীতে জিনিসমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝকঝক করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝলমল করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না—সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এত ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে-জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে ছুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইহাদিগকে যে-সকল নামে অভিহিত করিয়াছে, আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইহাদিগকে যাহা মনে করি, তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু

প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না—তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে, সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিসের মূল্যনির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য ও উজ্জলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন—কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্বেলিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে-অবস্থায় মানুষের চেতন অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী ;—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘনির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে idle tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না—এ-সকল কথার আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ওই যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো,—কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। ওই ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন—এখন আমরা ওই ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, "রম্যাণি

বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্” মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন ;—আষাঢ়ের প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব, যাহা অকারণ যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক—যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদদারের অভাব হইবে না।

১৩০৯

পনেরো-আনা

যে-লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড়ো হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিং আছে, তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ূরের লেজ যে কেবল রংচঙে জিতিয়াছে, তাহা নহে—তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক-খঞ্জন-ফিঙার পুচ্ছ লজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে-মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, সে-ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না;—যদি করিত তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত,

যাহার বিচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে-লোক উপকার করে, তাহাকে ভালো না বলিয়া থাকিবার জো নাই, কিন্তু যে-লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাহাকে ভালোবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সংকীর্ণ দিক দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে;—সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা; কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি কোনো কাজের নহে, তাই তাহার কোনো প্রাচীর নাই। সে আমাদের সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গীমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জন করিয়া আনি, এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী, সে-ই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ূরের পুচ্ছের মতো সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্তি গড়িবার নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকেই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্যই পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেনের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কী হইত? একে তো বড়োলোকেরা একাই এক-শ—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন—তাহার পরে, আবার, মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দূরে যাক, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটিরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সংকীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্যে লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক, অন্য পাঁচ জনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জালজালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে উদ্যত। এই যে জীবিতে জীবিতে লড়াই, ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড়ো কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা কল্পলোকবিহারী—আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, এবং বহুবিধ আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্ত্যমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন? এইজন্যই বিধাতা অধিকাংশ

মৃতকেই বিস্মৃতিলোকে নির্বাসন দিয়া থাকেন,—সেখানে কাহারও স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়ো-বড়ো মৃতের আওতায় আমাদের মতো ছোটো-ছোটো জীবিতকে নিতান্ত বিমর্ষ-মলিন, নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্তলোভনীয় হইল কী কারণে?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন—উঠ, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না।

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশী যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খ্রীস্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন-ধানের খেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে-জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি, তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করে না; তাহার যে-জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি, তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলোছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি ; বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি ; স্বজনের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ করি ; দিনের অধিকাংশ সময়ই চারিপাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোনো খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ ; আমাদের ছোটো-খাটো হাসিকৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝলমল করিতেছে, আমাদের ছোটোখাটো আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্যকিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যন্ত টেঁকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে-ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর-কোনো কাজে লাগি না ; সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোনো দোষ না দিয়া, ছটফট না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য ; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি, তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই—অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারি হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম ;—দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড় জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে—সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চির-

প্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধ করি সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পর-পরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন, স্নিগ্ধ-সুন্দর, বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভালো।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পনেরো-আনা এবং বাকি এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির শান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যখন কোনো এক দল পনেরো-আনা, এক-আনার মতোই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে, তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

১৩০৯

নববর্ষা

যৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেরও অন্ত ছিল না। আমি কী যে হইব, না হইব, কী করিতে পারি, না পারি, কাজে ভাবে অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই, সংসারও অনির্দিষ্ট রহস্যপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; পৃথিবীও সেই সঙ্গে সংকুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমারই আপিসঘর-বৈঠকখানা-দরদালানের শামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেইভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যস্ত পরিচিত হইয়া গেছে যে, ভুলিয়া গেছি এমন কত আপিসঘর-বৈঠকখানা-দরদালান, ছায়ার মতো এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেছে, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারে নাই। কত প্রৌঢ় নিজের মামলা-মকদ্দমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেন্দ্রস্থল গণ্য করিয়া তাকিয়া'র উপর ঠেসান দিয়া

বসিয়া ছিল, তাহাদের নাম তাহাদের ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই—তবু পৃথিবী সমান বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনই আসে, তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংকোচের সঙ্গে সে সংকুচিত হয় না। যখন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শত্রুর দ্বারা পীড়িত, দুরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে, যে-পৃথিবী আমার চারিদিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ষত, আমার দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যখন অস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আমার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায় নাই, শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া বারংবার আমার সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেছে।

মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশানৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

এইজন্য, কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে-অবন্তী, সে-বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে-উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ" সুখীলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্যলোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া, মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডির বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা-চেষ্টা-কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—একটা বহুদূরকালের এবং বহুদূরদেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ-কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ-কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোনো রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া সজলমেঘ-মেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়,—পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গিহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর, এবং আমার কোনো এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদীকল-ধ্বনিত,

সানুমৎপর্বতবন্ধুর, জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার, নববারিসিঞ্চিত-যূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎসুক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্বমেঘে বৃহৎ পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষের অর্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর, গোলা-বাড়ির বহুদূরে যে আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকটে যে চৈত্যবট শুককাকলীতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিরসত্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মুগ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্যে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে-পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন – আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্‌', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে-পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীরদ্বারা কল্পনা কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন ওই মেঘ, তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই সুখদুঃখ-ক্লান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢ়বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্বমেঘ। নবমেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরমনিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, "জননান্তরসৌহৃদানি" মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোনো একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

পূর্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান; এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। এক বার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্যগহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এই জন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

১৩০৮

পরনিন্দা

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ-কথা শিশুও জানে—কিন্তু যখন দেখি সাত সমুদ্রের জল নুনে পরিপূর্ণ ; যখন দেখি, এই নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ-কথা বলিতে কোনোমতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভালো হইত। নিশ্চয়ই ভালো হইত না—হয়তো লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।

তেমনি, পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মতো সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, "বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।"

এ-কথা যদি পুরাতন হয়, তবে আনন্দের বিষয়। আমি তো বলিয়াছি, যাহা পুরাতন, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কী থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভালো কাজের দাম কী! একটা ভালো কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে। জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল।

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে, তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

নিন্দা-বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে। কোনো সহৃদয় লোক তো বলিতে পারে না। যাহার হৃদয় বেশি, তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে, সংসারে সেই লোকই কাজের মতো কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মতো কাজ দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন,

সেইখানেই দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক। নিন্দা দুঃখ বিরোধ যেন ভালো লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায়। অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দা-বেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়।

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন, "জানি, নিন্দায় উপকার আছে। যে-লোক দোষ করে, তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভালো; কিন্তু যে করে না, তাহার নিন্দায় সংসারে ভালো হইতেই পারে না। মিথ্যা জিনিসটা কোনো অবস্থাতেই ভালো নয়।"

এ হইলে তো নিন্দা টিঁকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে তো হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারও গরজ নাই। যদি থাকিত, তবে পরের পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য হইত। নিন্দুককে সহ্য করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারও হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কে?

বস্তুত আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত। নিন্দার রায় চূড়ান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকিল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজন হিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারও অভাব নাই।

পূর্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, "তুচ্ছ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত—নিন্দায় সুখ পাওয়া উচিত নহে।"

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায়, আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে দুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে। তাহা হইলে নিমন্ত্রণসভা নিস্তব্ধ, বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মাণ, সমা-

লোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্‌গহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়।

তা ছাড়া সুখও পাইব না অথচ নিন্দাও করিব, এমন ভয়ংকর নিন্দুক মনুষ্যজাতিও নহে। মানুষকে বিধাতা এতই শৌখিন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে, তখনো ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে-সুখ, সেটুকুও তাহার চাই—সেই মানুষ ট্রামভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ি গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে অথচ তাহাতে সুখ পাইবে না, যে-ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কারমাত্রেরই মধ্যে সুখের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পলাইয়া না যাইত। মৃগের উপরে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজন্যই নিন্দার এত সুখ। আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুখে এ-কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে-ব্যক্তি জাতশিকারি। তুমি তোমার যে-অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি, আকাশের পাখিকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি—ইহা কত সুখের। যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্যে মানুষ কী না করে।

দুর্লভতার প্রতি মানুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে, যাহা সুলভ তাহা খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা লুকাইয়া আছে তাহাই আসল। এইজন্যই গোপনের পরিচয় পাইলে সে আর-কিছু বিচার না করিয়া প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম বলিয়া হঠাৎ খুশি হইয়া উঠে। এ-কথা সে মনে করে না যে, উপরের সত্যের চেয়ে নিচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে;—এ-কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা আছে সেটা যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য অপেক্ষা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া মনে করিতে ভালোবাসে এবং বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব

অনুভব করে। এইজন্য মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয় তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমাকে ঘরকন্না করিতে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচয় লইয়া আমার লাভটা কী? কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম—সেটা মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ—অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না;—কেবল যখন দুঃখ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তখন এই ভাবি যে, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মতো বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আসে বলিয়াই বুদ্ধিমান মানুষ ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে না। ঠকাই কি সংসারে চরম ঠকা। না ঠকাই কি চরম লাভ।

কিন্তু এ-সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই,—মনুষ্যচরিত্র আমি জন্মিবার বহুপূর্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায়, তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনোই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে-বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভালো লোক, নিরীহ লোককেও নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে যে, সংসারে ভালো লোক, নিরীহ লোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নয়।

কিন্তু বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ-কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে-নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ, সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।

১৩০৯

বসন্তযাপন

এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচিপাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিযুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হু হু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি, না, দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি—আমাদের সর্বাঙ্গ ঝরঝর মরমর করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে—আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহি ছিল না।

যদি বল, অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত—সে-কথা মানি। যেদিনকার যাহা, সেদিনকার তাহা এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশদিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ-সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে, তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া পড়িয়া, সম্মুখে চাহিয়া চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে, সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে

পৃথিবীর যে-সমস্ত তাগিদ ছিল, আজও ঠিক সেই সব তাগিদই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কী বাহাদুরি আছে! মন মস্ত লোক—সে কী না পারে। সে দক্ষিণা হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হনহন করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে। তাহাতে দক্ষিণা বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই তো অল্পদিন হইল, আমাদের আমলকী, মউল ও শালের ডাল হইতে খসখস করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল—ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মতো যেমনি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁপ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অমনি আমাদের বনশ্রেণী পাতা-খসানোর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারিদিকেই যখন হাওয়া বদল, পাতা বদল, রং বদল, আমরা তখনো গরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো যে-লড়ি লইয়া পাজরে ঠেলিতেছিল,—এখনো সেই লড়ি।

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই—অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় ১৫ই কি ১৬ই হইবে—বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে—পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্ন তন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়োলাট-ছোটোলাট, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতিবৎসরের সেই চিরন্তন বার্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল,—বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। বাদলার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ-কথা বলিতে পারি না—মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জড়প্রকৃতির আঁচলধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা

স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিণা হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেসুরের মতো বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন, শিম, কুষ্মাণ্ড নিষিদ্ধ আছে—আরও কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার,—কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসন্তের দিনে যে বিরহিণীর প্রাণ হা হা করে, এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন এ-কথা লিখিতে আমাদের সংকোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এমনি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসন্তে সমস্ত বনে উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়—তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে—তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না; যেখানে দুটা ফল ধরিবে, সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে? সে আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না, কেবলই কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে—ও যাহাদের সে-বালাই নাই, তাহারা বেলা চারটে পর্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে? আমরা কি এতই একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ়রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে, আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব—কোনো অনির্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না?

আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গে বহুপ্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা, এ-কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়দিদি বনলক্ষ্মীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মতো মিশিতে হইবে—আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্তদিন কাটিবে—মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে—বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে, তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হু হু করিয়া বহিয়া যাইতে দিই—সেখানে সে যেন এমনতরো কোনো ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে, গাছ-

পালারা যে-ভাষা না বোঝে। এমনি করিয়া চৈত্রের শেষ পর্যন্ত মাটি, বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব—আলোতে ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু, হায়, কোনো কাজই বন্ধ হয় নাই—হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে কর্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি—এখন বসন্ত আসিলেই কী, আর গেলেই কী।

মনুষ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ-অবস্থাটা ঠিক নহে। ইহার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব, তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কী হইবে? এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ-কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার এ-কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে এ-কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

হায় রে সমাজদাঁড়ের পাখি। আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল—তবু তোর পাখা দুটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম।

১৩০৯

রুদ্ধ গৃহ

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে— তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে-ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে-ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে।

সে-ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সমুখ দিয়া চলিতে গা ছমছম করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না, সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনা হয়, সেই পবিত্র স্থানে ভয় আর আসিতে পারে না।

দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ-ঘর বিধবা। এক জন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ-গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ-জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে-কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাইবোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোনো ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে

সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্তরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার দ্বার খুলিব খুলিব করে কিনা কে বলিতে পারে। পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না? এ ঘর কী ভাবে চাহে, কী ভাবে শোনে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে এক দিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে-সকল স্নেহ-প্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে, সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে,—এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ-প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসারক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিয়ো না—দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া মানুষের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

পথপ্রান্তে

আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, তাই কী লিখি ভাবিয়া পাই না।

ছায়াময় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। ভোরের বেলায় সূর্যের প্রথম কিরণ অশোকশাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে, আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে, এবং যখন চলিয়া যায় তখন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়, আমার লেখার উপরে তাহার কনক-চুম্বনের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমার লেখার চারিধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রং, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে, অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারিদিকে লতাইয়া উঠে।

আমার সমুখ দিয়া কত লোক আসে কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্বাদ করিতেছে, স্নেহভরে বলিতেছে তোমাদের যাত্রা শুভ হউক, পাখিরা কল্যাণগান করিতেছে, পথের আশেপাশে ফুটো-ফুটো ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা-আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে ভয় নাই, ভয় নাই। প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ শুভযাত্রার গান গাহিতেছে। অনন্ত নীলিমার উপর দিয়া সূর্যের জ্যোতির্ময় রথ ছুটিয়াছে। নিখিল চরাচর যেন এইমাত্র বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইল। সহাস্য প্রভাত আকাশে বাহুবিস্তার করিয়া আছে, অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগৎকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রভাত, জগতের আশা, আশ্বাস, প্রতিদিবসের নান্দী। প্রতিদিন সে পূর্বের কনকদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতে স্বর্গ হইতে মঙ্গলবার্তা আনিয়া দেয়, সমস্ত দিনের মতো অমৃত আহরণ করিয়া আনে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসিয়া পৃথিবীর ফুলের গন্ধ জাগাইয়া তোলে। প্রভাত জগতের যাত্রা-আরম্ভের আশীর্বাদ—সে-আশীর্বাদ মিথ্যা নহে।

আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ-দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতিনিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসিকান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

আর কিছুই থাকে না কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহারা সমস্ত পথ

কেবল ভালোবাসিতে বাসিতে চলে। পথের যেখানেই তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালোবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়—তাহাদের বিদায়ের অশ্রুজলে সে-জায়গাটুকু উর্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিকদিগকে তাহারা ভালোবাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়; প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতিপদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। জননীর স্নেহের ন্যায় জগতের শোভা সমস্ত পথ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃপুর হইতে তাহাদিগকে বাহিরে ডাকিয়া আনে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া যায়।

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে নহিলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

পথিকেরা যখন চলে আমি বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কান্না শুনি। যে-প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোখের জল মুছাইয়া দেয়, হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে অশ্রুতে, আলোতে বৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে সৌন্দর্যের উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে-প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আর পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয়—প্রেম বলে, "এক বার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখো, যে গেছে ইহারা তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।" কিন্তু তুমি অশ্রুজলে অন্ধ, তুমি আর কাহাকেও দেখিতে পাও না তাই ভালোবাসিতে পার না। তুমি তখন মরিতে চাও, সংসারের কাজ করিতে পার না। তুমি পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাক, জগতে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মুখ গুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পার না।

প্রভাতে যাহারা প্রফুল্লহৃদয়ে যাত্রা করিয়া বাহির হয় তাহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। অনেক, অনেক দূর। পথের উপরে যদি তাহাদের ভালোবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘ পথ চলিতে পারিত না। পথ ভালোবাসে বলিয়াই

প্রতিপদক্ষেপেই তাহাদের তৃপ্তি। এই পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। তাহারা পা উঠাইতে চাহে না। প্রতিপদে তাহাদের ভ্রম হয়, "যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না"— কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। প্রতিপদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে। তাহারা আগেভাগে আশঙ্কা করিয়া বসে বলিয়াই কাঁদে, নহিলে কাঁদিবার কোনো কারণ নাই।

ওই দেখো, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ওই ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে। ওই ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে? —কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়—সেখানে শতকোটি সন্তান। সেখানে বিশ্বের কচি মুখগুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দনবন করিয়া রাখিয়াছে। আকাশের চাঁদকে কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার জন্য আগ্রহ। সেখানে স্খলিত মধুর ভাষার কল্লোল। আবার ওদিকে শোনো—সুকুমার অসহায়েরা কী কান্নাই কাঁদিতেছে। শিশুদেহে রোগ প্রবেশ করিয়া ফুলের পাপড়ির মতো কোমল তনুগুলি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কোমল কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছে না; ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে চেষ্টা করিতেছে, কান্না কণ্ঠের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। আর ওই শিশুদের প্রতি বর্বর বয়স্কদের কত অত্যাচার।

একটি ছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই, তার কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ, ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়; তারপর তুমি চলিয়া যাও, সে-ও চলিয়া যাক। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর-একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি—সে যদি আলেয়ার আলো হইত তবে সে পথ ভুলাইয়া ঘাড় ভাঙিয়া তোমাকে যা-হ'ক একটা-কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত, আর সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিত, সেই একটা-কিছুর মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনন্তযাত্রার অবসান হইত—অন্য পথিকেরা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবার জো নাই।

একটিকে ভালোবাসিলেই আর-একটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে—অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে নাই। এইজন্য কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর-কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া যে-ব্যক্তি নিজের চারিদিকে দেয়াল গাঁথিয়া তোলে, কালের প্রবাহ ক্রমাগত আঘাত করিয়া তাহার সে-দেয়াল এক দিন ভাঙিয়া দেয়, তাহাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দেয়। তখন সে আবরণের অভাবে হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। জগৎকে দ্বিধা হইতে বলে। ধূলির মধ্যে আচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি, অনন্ত শক্তিমান যদি এই অনন্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র বলপূর্বক লইয়া যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত তবে আমরা দুর্বলেরা কী করিতে পারিতাম। কিন্তু যাত্রার আরম্ভে শাসনের বজ্রধ্বনি শুনিতেছি না, প্রভাতের আশ্বাসবাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু ভালোবাসা সহস্র দিক হইতে তাহার বাহু বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালোবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য করিয়া চলিতে শিখি, মোহে জড়াইয়া না পড়ি, অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ ও আনন্দধ্বনির ধারে বসিয়া আছি। আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভালোবাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে বলিতেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তোমাদিগকে পাথেয় স্বরূপে দিতেছি। কারণ, পথ চলিতে আর কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

১২৯২

ছোটোনাগপুর

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে, খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকা-রেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ওই দেখো, পাথরের মতো কালো, ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটিবাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয় নাই, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার তকতক করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারিদিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকাচুলের মতো দেখাইতেছে। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক-একটা তালগাছ ছোট্টো মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা অশথগাছ আমগাছও দেখা যায়। শুষ্কক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটিরের চালশূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই।

এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। একে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা মাত্র।

সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যতদূরে চাই, ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটির ঢেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারিদিকে চাহিয়া কী যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাইতেছে। আর-একটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট পট করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। এক বার কষ্টে স্রেষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, এক বার গাড়ি গড়গড় করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড়গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচট খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল "বড়াকর নদী।" টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার-পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক-এক বার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই; চারিদিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো ধু ধু করিতেছে। দিগ্‌দিগন্তরের উপরে

গোধূলির চিকচিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্ এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীলশিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ; তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূরবিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিংবা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ শহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলিঘুঁজি, আবর্জনা, নর্দামা, ঘেঁষাঘেঁষি, গোলমাল, গাড়িঘোড়া, ধুলোকাদা, মাছি-মশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই। মাঠ-পাহাড়-গাছপালার মধ্যে শহরটি তকতক করিতেছে।

এক দিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুরবেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুইখণ্ড শীর্ণ মেঘ সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো মেঠো ঘেসো ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিখ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গোরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া কেউ কাঁধে মোট লইয়া কেউ দু-একটা গোরু তাড়াইয়া কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরেসুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁসফাঁস করিয়া অথবা

গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুলকুল করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ওই আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি, তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতিঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে, "আর কেহ জাগুক না জাগুক আমি জাগিয়া আছি।" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

১২৯২

সরোজিনী প্রয়াণ

অসমাপ্ত বিবরণ

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরেজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরমপরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরানীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময় শুনা গেল তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে আমরা যে-পথে যাইতেছি, সে-পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পাছে সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোটো ছোটো সরু সরু আঙুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নখাগ্র

হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষত চিতপুর রোড। সকালবেলাকার প্রথম সূর্যকিরণ পড়িয়াছে, শ্যাকরা গাড়ির আস্তাবলের মাথায়,—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড়ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্যের আলো এমনি চিকমিক করিতেছে সেদিকে চাহিবার জো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকালবেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চকচকে মহত্ত্ব-লাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিস দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনো যাত্রী বেশি জোটে নাই। ম্যুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুটপাথের পার্শ্বে সারি সারি শ্যাকরা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে, তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম খাসির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড়ো বড়ো হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুস নির্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুন জ্বালানো হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত-মুখ ধুইতেছে, কেহ বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ বা লাল কলপ দেওয়া দাড়ি লইয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানা পারসি কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মসজিদ; এক জন অন্ধ ভিক্ষুক মসজিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌঁছানো গেল। সমুখ হইতে ছাউনিওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট চট করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। এক বার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে

অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কী মনে করিয়া আত্মসংবরণপূর্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। এ বলে আমার নৌকায়, ও বলে আমার নৌকায়, এইরূপে মাঝির তরঙ্গে আমাদের তনুর তরী এক বার দক্ষিণে, এক বার বামে, এক বার মাঝখানে আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্বজন্মের বিশেষ একটা কী কর্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশি ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোটো ছোটো নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে; আপনার দেমাকে আপনি কাত হইয়া পড়ে বা। একটা মস্ত স্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোটোখাটো নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূম নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ—রাখ্ রাখ্ থাম্ থাম্। মাঝি কহিল, "মহাশয় ভয় করিবেন না, এমন ঢের বার জাহাজ ধরিয়াছি।" বলা বাহুল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠানো গেল, তাহার পর আমার ভাজ ঠাকুরানী যখন বহুকষ্টে তাঁহার স্থলপদ্ম-পা-দুখানি জাহাজের উপর তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মতো তাহারই পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

২

যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্ধ্বশুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশৎ তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয় জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্তা বাবু এই সাত জনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর ফর আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তাহারা না কি জাত-সাপিনীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী-বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরানীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান

করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি উর্ধ্বমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎসব বাধাইয়া দিল; কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, শত শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নির্জীবভাবে খোঁপা আকারে ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কখন এক সময়ে দাদা কাঁধের দিকে মাথা নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বউঠাকুরানীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। ঢেউগুলি চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে—গর্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে—স্পর্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে সূর্যকিরণ দীপ্তিমান চোখের মতো জ্বলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাত করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কী আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, মুহূর্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানি দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আপিসের ছিপছিপে পানসিগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে; তাহারা মহৎ মাস্তুল-কিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য উপেক্ষা করে, স্টীমারের বিষাণধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড়ো বড়ো জাহাজের মুখের উপর পাল দুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়; জাহাজও তাহাতে বড়ো অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিন ঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মতো—তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্ধা অসহ্য বোধ হয়।

এক সময় শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব-রাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। শুনিয়া আমার ভাজঠাকুরানীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—তাঁহার সহসা মনে হইল যে, কাপ্তেন যখন নাই তখন নোঙরের অচল-শরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়। দাদা বলিলেন তাহার আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নিচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নহে। কর্তাবাবুরও সেইরূপ মত। বাকি সকলে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আর, হাঁকডাকেও কাপ্তেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়াছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়ের ধুক ধুক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর ফেলো, নোঙর ফেলো বলিয়া

শব্দ উঠিল—নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে দশটা, দেড়টার পূর্বে মেরামত সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটির—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকি কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিকচিক করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নিচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা-মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পইঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া

গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়-গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক-এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো-কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই-চারিটি গোরু চরিতেছে, গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের খেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নিচে হইতে নদী-স্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে, ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর-এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে-কারণেই হউক গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে;—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে প'ড়ো জায়গা এবড়োখেবড়ো—ইতস্তত কতকগুলা ইট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেক-গুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট, নহবতখানা হইতে নহবত বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটিরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তকতক করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর এক দিকে তুলসীতলা। সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম-পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের

গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মতো সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো পশ্চিম-দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝরঝর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছলছল করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভালো দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে, আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরও রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ওপারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর-খানিকটা আলো পড়ে—সেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ওপারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এপারে নিদ্রার রাজ্য আর ওপারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ-জন্মে দেখিতে পাইব না।

মেরামত শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বামে মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। ডান দিকে শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। বেলা দুটো-তিনটের সময় ফলমূল সেবন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় কোথায় গিয়া থামা যাইবে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল আসিল—তাহাদের সগর্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল। বাতাস যদিও উল্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত আমাদের অনুকূল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। জাহাজ বেশ দুলিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক

একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের পাশে নিষ্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্তাবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ রব উঠিল, এই এই—রাখ্ রাখ্, থাম্ থাম্। গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে-জিনিসটা মহিষের মতো ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

৩

কোথায় সেই অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্বসিত বিচিত্র তরুতরঙ্গ, কোথায় সেই প্রকৃতির শ্যামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোকালয়গুলি—ঊর্ধ্বে সেই চিরস্থির আকাশের নিম্নে সেই চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী। চিরস্তব্ধের সহিত চিরকোলাহলময়ের, সর্বত্রসমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্বিকারের সহিত চিরপরিবর্তনশীলের অবিচ্ছেদ প্রেমের মিলন কোথায়। এখানে সুরকিতে ইটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, চাপকানের সহিত বোতামের আঁটাআঁটি মিলন।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরে-জমিনে লেখা চলিতেছিল—সরে-জমিনে না হউক সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙায় ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেখানকার কথা এখানে, পূর্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে—সুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ন। আমার সমুখে একটা ডেস্ক, পাপোশে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে—বারান্দায় শিকলি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং এক-এক বার খপ করিয়া

বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক চঞ্চু লইয়া ছাদের উপরে উড়িয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হারমোনিয়ম-বাক্সের মধ্যে গোটাকতক ইঁদুর খট খট করিতেছে। কলিকাতা শহরের ইমারতের একটি শুষ্ক কঠিন কামরা, ইহারই মধ্যে আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি—তপঃক্ষীণ জহ্নুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশি স্থান আছে। আর, স্থানসংকীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখো—বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশ-পরম্পরা। আমি যে ওই স্টীফেন সাহেবের এক বোতল ব্লুব্লাক কালি কিনিয়া আনিয়াছি, উহারই প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে। এই কালির বোতল দৈবক্রমে যদি সুযোগ্য হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, সৃষ্টির পূর্ববর্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল, তেমনি ওই এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নূতন সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে স্টীফেন সাহেবের কালির কারখানা সেখানে দাঁড়াইয়া এক বার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামি, কত ফাঁসির হুকুম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে। ওই স্রোত যখন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—তখন—দূর হউক কালি যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, স্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে ;—এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে।—স্রোত ফিরানো যাক। এস এবার গঙ্গার স্রোতে এস।

সত্য ঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে, তাহার সাক্ষ্য দেখো, আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু ডুবিল না—পরমবীরত্বসহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না—প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না ; পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা। অতএব আমার প্রতি কেহ না রুষ্ট হন এই আমার প্রার্থনা।

মরিলাম না বটে কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমত ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। সুতরাং সেই ঝাঁকানির কথাটা স্মরণ-ফলকে খোদিত হইয়া রহিল। খানিকক্ষণ অবাক ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করা গেল—সকলেরই মুখে এক ভাব, সকলেই বাক্যব্যয় করা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। বউঠাকরুন বৃহৎ

একটা চৌকির মধ্যে কেমন একরকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক আমার দুই পার্শ্ব জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্তাবাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন—সমস্তই মাঝির দোষ, মাঝি কহিল—তাহার অধীনে যে-ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল—হালের দোষ। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল—গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এইখানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল—সকালবেলায় যেমনতরো মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলের নিচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ-সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না-যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত এ-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাদের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্যকৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু বর্ষাকালের দেশলাই-কাঠির মতো সেগুলা ভালো করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গাগর্ভের পঙ্কিল বিশ্রাম-শয্যায় চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তখন খবরের কাগজের **sad accident**এর কোঠায় একটিমাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটিমাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিব সে-বিষয়ে নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সংবাদটি এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটি বটিকার মতো কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন, "আহা কত বড়ো মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো,—এমন আর হইবে না।" এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন, "আহা, দোষে গুণে জড়িত মানুষটা ছিল—যেমন তেমন হ'ক তবু তো ঘরটা জুড়ে ছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বউঠাকুরানীর চাপা ঠোঁটজোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল—দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। খালাসিদের নমাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন খ্যাপা খালাসি তাহার তারের যন্ত্র বাজাইয়া, এক মাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম—মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন-পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মতো তা দিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' যদি এমনই হয়—কোনো সুযোগে যদি একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি, যদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পরপারের ঘাটে গিয়াই থামে—তবে বাজনা বাজাইয়া দাও—চিত্রগুপ্তের মজলিসে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই। আর, যদি সে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এখান হইতে অন্ধকার সঙ্গে করিয়া রানীগঞ্জে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইবার বিড়ম্বনা কেন? তবে বাজাও। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটি সেতারে ঝংকার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমনকল্যাণ বাজিতে লাগিল।

তাহার পরদিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিসেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছুদিন এইখানেই স্থিতি।

গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-এক বার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য গতির সৌন্দর্য। চারিদিকে মধুর চঞ্চলতা, জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা, তরঙ্গের উত্থান-পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব—গঙ্গার মাঝখানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ-সব ভালো করিয়া দেখা যায় না। আর জাহাজের হাঁসফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন-উদ্‌গার—এ-সকল, গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অতিসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্য হয় না। এ যেন আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। যেন গঙ্গাযাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের সূচীপত্র গলাধঃকরণ করা।

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খরপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনো তরঙ্গসংকুল, কখনো শান্ত, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কূলকিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুরবন, আমবাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক-একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালনপূর্বক একটি বড়ো স্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানবসন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে-চর্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশি পোশাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটিরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর-মন সমর্পণ করিলাম।

১২৯১

প্রাচীন সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্য

রামায়ণ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "রামায়ণী কথা"র ভূমিকা স্বরূপে রচিত

রামায়ণ-মহাভারতকে যখন জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে "এপিক"। আমরা এপিক শব্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য। এখন আমরা রামায়ণ-মহাভারতকে মহাকাব্যই বলিয়া থাকি।

মহাকাব্য নামটি ভালোই হইয়াছে। নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ বলিয়া এখন যদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় না।

অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অলংকারশাস্ত্রের এপিক শব্দের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া না মিলিলেই মহাকাব্যনামধারীকে কৈফিয়ত দিতে হয়। এরূপ জবাবদিহির মধ্যে থাকা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব? প্যারাডাইস লস্টকেও তো সাধারণে এপিক বলে, তা যদি হয় তবে রামায়ণ-মহাভারত এপিক নহে—উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান হইতে পারে না।

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহা আর-কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা,

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর-এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন--ইহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই—ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।

বস্তুত ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারও নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ-জোড়া দুইটি কাব্য তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে, কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড এনিড ছিল। তাহা সমস্ত গ্রীসের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর ও ভার্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মতো স্ব স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক না কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে,—তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।

অতএব গুটিকয়েকমাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন—ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে।

প্রাচীন আর্যসভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে।

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও রোম তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

এইজন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে—মুদীর দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্রধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলিমৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিয়াছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে ; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে—রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ-ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে, রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস-প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কী বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার কারণ যে-দেশে যে-কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে সে-দেশে সে-কালে স্বভাবতই এপিক বীররসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে-রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে

তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই—যুদ্ধ-ঘটনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার বিষয় নহে।

দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ-কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই; এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত—সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং।

কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন?

তখন নারদ কহিলেন—

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগুর্ণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।

এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শচরিতবর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামীস্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই—সে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার

উপলক্ষ্যমাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি, ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য সুবিধার জন্য ছিল না—গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে-সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে-আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয় না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যতসংখ্যক শব্দ-তরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব উদ্‌ভাবন সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে।

এ যদি সত্য হয় তবে এ-কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে রামায়ণ-কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণকথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে—

আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে—ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে—ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে ইহা কখনোই সম্ভব হইত না যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ—এবং মহাভারতকেও—আমি বিশেষত এই ভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্রবৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণচরিত্র-সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজারদর যাচাই করা—কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক। এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পূজা আচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের

দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোনো ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ-কথা বলে নাই যে, বড়ো বাড়াবাড়ি হইতেছে—এ-কথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তবসত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।

যে-জাতি খণ্ডসত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তবসত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন—তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন, মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকে, যাঁহারা বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ," যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধন করিয়াছেন তাঁহাদেরও ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানব-সভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানাঘরের জনতামধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়নমধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

৫ পৌষ, ১৩১০

মেঘদূত

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল। আর সেই যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত, তাহারাই বা কোথায়। আর সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী। অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে—আমরা কেবল সেই যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল, তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত, তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুলচরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে, তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে,—তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনকরেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।

আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর। অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা-সিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

অতএব, যক্ষের যে মেঘ নগনদীনগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধলোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই, এবং পুরবধূদিগের

ভ্রূলতাবিভ্রমে পরিচিত নিবিড়পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহলদৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি, এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।

মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে প্রবাসীরা আপন আপন পথিকবধূর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহাচ্ছন্ন এই বর্তমান মর্ত্যলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।

কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে। আজ কেবল ভাষায় ভাবে আভাসে ইঙ্গিতে ভুলভ্রান্তিতে আলো আঁধারে দেহে মনে জন্মমৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে, তবে সেই আমার বহুভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না ; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর!

কিন্তু এ-কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় "হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির!" এ কী হইল। যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন। ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরাম দাস বলিতেছেন "তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির।" যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না—বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

হে নির্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে। তোমার তো চেতন-অচেতনে পার্থক্য জ্ঞান নাই, কী জানি, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক।

১২৯৮

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

কালিদাস একান্তই সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এ-মত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো। এই গল্পগুলি জনসাধারণকর্তৃক কালিদাসের কাব্যসমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।

মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি

বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগদ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে। রামায়ণেও তাহাই ;— পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে,—সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ত্ব ও পৌরুষের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।

সেইরূপ কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কালিদাস কোথায় থামিয়াছেন এবং কোথায় থামেন নাই, সেইটে এখনকার আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিবার বিষয়। পথের কোনো একটা অংশে থামিয়া তাঁহাকে বিচার করা যায় না, তাঁহার গম্যস্থান কোথায়, তাহা দেখিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্যন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে, তাহা য়ুরোপের নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্যঘটনীয় নহে। কারণ শকুন্তলা নাটকের আরম্ভে যে বীজবপন হইয়াছে, এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার পরেও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন বাহ্য উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের অন্তর্গত কোনো ঘটনাসূত্রে, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কোনো ব্যবহারে এ মিলন ঘটিবার কোনো পথ ছিল না।

তেমনি, এখনকার কবি কুমারসম্ভবে হতমনোরথ পার্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন। অকালবসন্তে রক্তবর্ণ অশোককুঞ্জে মদনমথনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন,—অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘেরিয়া থাকিত। এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম সূর্যাস্ত, তাহার পরে বিবাহের রাত্রি অত্যন্ত বর্ণচ্ছটাহীন।

বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা; তাহা নিয়মবদ্ধ সমাজের অঙ্গ। বিবাহ এমন একটি পথ নির্দেশ করে, যাহার লক্ষ্য একমাত্র ও সরল, এবং যাহাতে প্রবল প্রবৃত্তি দস্যুতা করিতে প্রবল নিষেধ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এখনকার কবিরা বিবাহ-ব্যাপারকে তাঁহাদের কাব্যে বড়ো করিয়া দেখাইতে চান না। যে-প্রেম উদ্দামবেগে নরনারীকে তাহার চারিদিকের সহস্র বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সংসারের চিরকালের অভ্যস্ত পথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়,—যে-প্রেমের বলে নরনারী মনে করে, তাহারা আপনাতেই আপনারা সম্পূর্ণ, মনে করে যে, যদি সমস্ত সংসার বিমুখ হয়, তবু তাহাদের ভয় নাই, অভাব নাই, যে-প্রেমের উত্তেজনায় তাহারা ঘূর্ণবেগে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত গ্রহের মতো তাহাদের চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠে, সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয়।

কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই—তাহাকে তরুণলাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে, তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত।

কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে-মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে-মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া, আপনার বিচিত্রকারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে-মিলন সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ—তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরল-নির্মল বেশে কল্যাণের শুভদীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্পর্ধিত মদন যে-মিলনের কর্তৃত্বভার লইয়াছিল, তাহার আয়োজন প্রচুর। সমাজবেষ্টনের বাহিরে দুই তপোবনের মধ্যে অহেতুক আকস্মিক নবপ্রেমকে কবি যেমন কৌশলে, তেমনি সমারোহে, সুন্দর অবকাশ দান করিয়াছেন।

যতি কৃত্তিবাস তখন হিমালয়ের প্রস্থে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। শীতল বায়ু মৃগনাভির গন্ধ ও কিন্নরের গীতধ্বনি বহন করিয়া গঙ্গাপ্রবাহসিক্তিত দেবদারু-শ্রেণীকে আন্দোলিত করিতেছিল। সেখানে হঠাৎ অকালবসন্তের সমাগম হইতেই দক্ষিণদিগ্‌বধূ সদ্যঃপুষ্পিত অশোকের নবপল্লবজাল মর্মরিত করিয়া আতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিলেন। ভ্রমরযুগল এক কুসুমপাত্রে মধু খাইতে লাগিল এবং কৃষ্ণসার মৃগ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী হরিণীর গাত্র শৃঙ্গ দ্বারা ঘর্ষণ করিল।

তপোবনে বসন্তসমাগম! তপস্যার সুকঠোর নিয়মসংযমের কঠিন বেষ্টনমধ্যে হঠাৎ প্রকৃতির আত্মস্বরূপবিস্তার! প্রমোদবনের মধ্যে বসন্তের বাসন্তিকতা এমন আশ্চর্যরূপে দেখা দেয় না।

মহর্ষি কণ্বের মালিনীতীরবর্তী আশ্রমেও এইরূপ। সেখানে হুত হোমের ধূমে তপোবনতরুর পল্লবসকল বিবর্ণ, সেখানে জলাশয়ের পথসকল মুনিদের সিক্তবল্কলক্ষরিত জলরেখায় অঙ্কিত এবং সেখানে বিশ্বস্ত মৃগসকল রথচক্রধ্বনি ও জ্যা-নির্ঘোষকে নির্ভয় কৌতূহলের সহিত শুনিতেছে। কিন্তু সেখান হইতেও প্রকৃতি দূরে পলায়ন করে নাই,—সেখানেও কখন রুক্ষবল্কলের নিচে হইতে শকুন্তলার নবযৌবন অলক্ষ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধনকে চারিদিক হইতে ঠেলিতেছিল। সেখানেও বায়ুকম্পিত-পল্লবাঙ্গুলিদ্বারা চূতবৃক্ষ যে সংকেত করে, তাহা সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে এবং নবকুসুমযৌবনা নবমালিকা সহকারতরুকে বেষ্টন করিয়া প্রিয়মিলনের ঔৎসুক্য প্রচার করে।

চারিদিকে অকালবসন্তের অজস্র সমারোহ, তাহারই মাঝখানে গিরিরাজনন্দিনী কী মোহনবেশেই দেখা দিলেন। অশোককর্ণিকারের পুষ্পভূষণে তিনি সজ্জিতা, অঙ্গে বালারুণবর্ণের বসন, কেসরমালার কাঞ্চী পুনঃপুন স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, আর ভয়চঞ্চললোচনা গৌরী ক্ষণে ক্ষণে লীলাপদ্ম সঞ্চালন করিয়া তৃষ্ণার্ত ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতেছেন।

অন্যদিকে দেবদারুদ্রুমবেদিকার উপরে শার্দূলচর্মাসনে ধূর্জটি ভুজঙ্গপাশবদ্ধ জটাকলাপ এবং গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করিয়া ধ্যানস্তিমিতলোচনে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

অস্থানে অকালবসন্তে মদন এই দুই বিসদৃশ পুরুষ-রমণীর মধ্যে মিলনসাধনের জন্য উদ্যত ছিলেন।

কণ্বাশ্রমেও সেইরূপ। কোথায় বল্কলবসনা তাপসকন্যা, এবং কোথায় সসাগরা ধরণীর চক্রবর্তী অধীশ্বর। দেশকালপাত্রকে মুহূর্তের মধ্যেই এমন করিয়া যে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, সেই মীনকেতনের যে কী শক্তি, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কবি সেইখানেই থামেন নাই। এই শক্তির কাছেই তিনি তাঁহার কাব্যের সমস্ত রাজকর নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন ইহার হঠাৎ জয়সংবাদ আনিয়াছেন তেমনি অন্য দুর্জয় শক্তি দ্বারা পূর্ণতর চরম মিলন ঘটাইয়া তবে কাব্য

বদ্ধ করিয়াছেন। স্বর্গের দেবরাজের দ্বারা উৎসাহিত এবং বসন্তের মোহিনী শক্তির দ্বারা সহায়বান্ মদনকে কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার স্থলে যাহাকে জয়ী করিয়াছেন, তাহার সজ্জা নাই, সহায় নাই, তাহা তপস্থায় কৃশ, দুঃখে মলিন। স্বর্গের দেবরাজ তাহার কথা চিন্তাও করেন নাই।

যে-প্রেমের কোনো বন্ধন নাই কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম-দুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত—তখন শকুন্তলার সে-প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে-প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসারধর্মের অকস্মাৎ পরাভবস্বরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্ঝার মতো অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া আনে।

পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মন্দাকিনীর জলে যে পদ্ম ফুটিত, সেই পদ্মের বীজ রৌদ্রকিরণে শুষ্ক করিয়া নিজের হাতে গৌরী যে জপমালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালা তিনি তাঁহার তাম্ররুচি করে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী এক বার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে তাঁহার তিন নেত্রকে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্যস্ত এবং মুখ এক দিকে সাচীকৃত।

কিন্তু অপূর্ব সৌন্দর্যে অকস্মাৎ উদ্‌ভাসমান এই যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না,—সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের ললিতযৌবনের

সৌন্দর্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কণ্বদুহিতাকেও এক দিন তাঁহার যৌবনলাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পদ লইয়া অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। দুর্বাসার শাপ কবির রূপকমাত্র। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপনমিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যই হয়—তাহার পরে অবসাদের, অপমানের, বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান। কালে কালে দেশে দেশে অপমানিতা নারী "ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ" আপনার ললিত দেহকান্তিকে ব্যর্থ জ্ঞান করিয়া, "শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ" শূন্যহৃদয়ে কোনোক্রমে গৃহের দিকে ফিরিয়াছে। ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর পরম গৌরব চরম সৌন্দর্য নহে।

সেইজন্যই "নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী" রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। এবং "ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাম্" তিনি আপনার রূপকে সফল করিতে ইচ্ছা করিলেন। রূপকে সফল করিতে হয় কী করিয়া? সাজে সজ্জায়, বসনে অলংকারে? সে-পরীক্ষা তো ব্যর্থ হইয়া গেছে।

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

তিনি তপস্যাদ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এবারে গৌরী তরুণার্করক্তিমবসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপল্লব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না;—তিনি কঠোর মৌঞ্জীমেখলা দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

শকুন্তলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাগ্লানিকে দুঃখতাপে দগ্ধ করিয়া কল্যাণী তাপসীর বেশে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে একমুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা, শ্লথলম্বিতপিঙ্গলজটাধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণহৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাকৃত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে-সৌন্দর্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা-আশঙ্কা আঘাত-আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।

এতদিন পরে—

ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি।
পূর্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ ॥

ধর্ম যখন মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন, তখন পূর্বাপরাধভীত কামের মন আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ধর্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে, সেখানে মদনের সহিত কাহারও কোনো বিরোধ নাই। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায়, তখনি বিপ্লব উপস্থিত হয়; তখনি প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু ধর্মের অধীনে তাহার যে নির্দিষ্ট স্থান আছে, সেখানে সে-ও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ, সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না। কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য; এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে। সৌন্দর্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে, সেখানে বাহ্যসৌন্দর্যের বিধান তাহাতে আর খাটে না। সেখানে তাহার আর ভূষণের প্রয়োজন কী? প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে-সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাহাকে বাহ্য-সৌন্দর্যের নিয়মে বিচার করাই চলে না। শিবের ন্যায় তপস্বী, গৌরীর ন্যায় কিশোরীর সঙ্গে বাহ্যসৌন্দর্যের নিয়মে ঠিক যেন সংগত হইতে পারেন না। শিব নিজেই ছদ্মবেশে সে-কথা তপস্যারতা উমাকে জানাইয়াছেন। উমা উত্তর দিয়াছেন, "মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্" আমার মন তাঁহাতেই ভাবৈকরস হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এ যে রস, এ ভাবের রস; সুতরাং ইহাতে আর কথা চলিতে পারে না। মন এখানে বাহিরের উপরে জয়ী—সে নিজের আনন্দকে নিজে সৃষ্টি করিতেছে। শম্ভুও এক দিন বাহ্যসৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি মঙ্গলের দৃষ্টি ধর্মের দৃষ্টির দ্বারা যে সৌন্দর্য দেখিলেন, তাহা তপস্যাকৃশ ও আভরণহীন হইলেও, তাঁহাকে জয় করিল। কারণ, সে-জয়ে তাঁহার নিজের মনই সহায়তা করিয়াছে—মনের কর্তৃত্ব তাহাতে নষ্ট হয় নাই।

ধর্ম যখন তাপস-তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল, তখন স্বর্গমর্ত্য এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়রূপে অবতীর্ণ হইল; এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্ষিবৃন্দকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোনো গূঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না। ইহার

যে অম্লানমঙ্গলশ্রী, তাহা সমস্ত সংসারের আনন্দের সামগ্রী। সমস্ত বিশ্ব এই শুভ-মিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।

সপ্তম সর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার।

শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে। কালিদাস তাঁহার কাব্যের রসপ্রবাহকে সেই স্বর্গমর্ত্যব্যাপী সর্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া তাহাকে মহান পরিণাম দান করিয়াছেন, তাহাকে অর্ধপথে "ন যযৌ ন তস্থৌ" করিয়া রাখিয়া দেন নাই। মাঝে তাহাকে যে এক বার বিক্ষুব্ধ করিয়া দিয়াছেন, সে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তিকে গাঢ়তর করিয়া দেখাইবার জন্য,—ইহার স্থিরশুভ্র মঙ্গলমূর্তিকে বিচিত্রবেশী উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্যের তুলনায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য।

মহেশ্বর যখন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পতিব্রতা অরুন্ধতীকে দেখিলেন, তখন তিনি পত্নীর সৌন্দর্য যে কী তাহা দেখিতে পাইলেন।

তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূয়ান্ দারার্থমাদরঃ।
ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্॥

তাঁহাকে দেখিয়া শম্ভুর দারগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আদর জন্মিল। সৎপত্নীই সমস্ত ধর্মকার্যের মূলকারণ।

পতিব্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে, তাহা নিয়ত-আচরিত কল্যাণকর্মের স্থির সৌন্দর্য,—শম্ভুর কল্পনানেত্রে সেই সৌন্দর্য যখন অরুন্ধতীর সৌম্যমূর্তি হইতে প্রতিফলিত হইয়া নববধূবেশিনী গৌরীর ললাট স্পর্শ করিল, তখন শৈলসুতা যে লাবণ্যলাভ করিলেন, অকালবসন্তের সমস্ত পুষ্পসম্ভার তাঁহাকে সে সৌন্দর্যদান করিতে পারে নাই।

বিবাহের দিনে গৌরী—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
গৃহীতপত্যুদ্‌গমনীয়বস্ত্রা।
নিবৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে॥

মঙ্গলস্নানে নির্মলগাত্রী হইয়া যখন পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করিলেন, তখন বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুধার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এই যে মঙ্গলকান্তি নির্মল শোভা, ইহার মধ্যে কী শান্তি, কী শ্রী, কী সম্পূর্ণতা!

ইহার মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান, সমস্ত সজ্জার শেষ পরিণতি। ইহার মধ্যে ইন্দ্রসভার কোনো প্রয়াস নাই, মদনের কোনো মোহ নাই, বসন্তের কোনো আনুকূল্য নাই—এখন ইহা আপনার নির্মলতায় মঙ্গলতায় আপনি অক্ষুব্ধ, আপনি সম্পূর্ণ।

জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শরনিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাঁধ ভাঙিয়া যে-মিলন ঘটাইয়া থাকে, তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে-মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। এইজন্য কবি প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যস্থলে ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্যমোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনভূমির স্থলে আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন, তবে কুমারজন্মের সূচনা হইয়াছে। কুমারজন্ম ব্যাপারটা কী, তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে দেবরোষানলে আহুতি দিয়া অনাথা রতিকে বিলাপ করাইয়াছেন।

শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্মন্তের ব্যর্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরত-জননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্ক চাঞ্চল্যে ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ; তাহাতে উদ্‌বেলযৌবনা ঋষিকন্যা, কৌতুকোচ্ছলিতা সখীদ্বয়, নবপুষ্পিতা বনতোষিণী, সৌরভভ্রান্ত মূঢ় ভ্রমর এবং তরু-অন্তরালবর্তী মুগ্ধ রাজা তপোবনের একটি নিভৃত প্রান্ত আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্যমদমোদিত এক অপরূপ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এই প্রমোদ-স্বর্গ হইতে দুষ্মন্তপ্রেয়সী অপমানে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণরূপিণী ভরতজননী যে দিব্যতর তপোভূমিতে আশ্রয় লইয়াছেন, সেখানকার দৃশ্য অন্যরূপ। সেখানে কিশোরী তাপসকন্যারা আলবালে জল সেচন করিতেছে না, লতাভগিনীকে স্নেহদৃষ্টিদ্বারা অভিষিক্ত করিতেছে না, কৃতকপুত্র মৃগশিশুকে নীবারমুষ্টিদ্বারা পালন করিতেছে না। সেখানে তরুলতাপুষ্প-পল্লবের সমুদয় চাঞ্চল্য একটিমাত্র বালক অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সমস্ত বনভূমির কোল সে ভরিয়া রহিয়াছে; সেখানে সহকারশাখায় মুকুল ধরে কি না, নবমল্লিকায় পুষ্পমঞ্জরী ফোটে কি না, সে কাহারও চক্ষেও পড়ে না। স্নেহব্যাকুলা তাপসী মাতারা দুরন্ত বালকটিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার সহিত পরিচয়

হইবার পূর্বে দূর হইতে তাহার নবযৌবনের লাবণ্যলীলা দুষ্মন্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। শেষ অঙ্কে শকুন্তলার বালকটি শকুন্তলার সমস্ত লাবণ্যের স্থান অধিকার করিয়া লইয়া রাজার অন্তরতম হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিল।

এমন সময়—

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ—

মলিনধূসরবসনা, নিয়মচর্যায় শুষ্কমুখী, একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা শকুন্তলা প্রবেশ করিলেন।

এমন তপস্যার পরে অক্ষয়বরলাভ হইবে না? সুদীর্ঘব্রতচারণে প্রথম সমাগমের গ্লানি দগ্ধ হইয়া পুত্রশোভায় পরমভূষিতা যে করুণকল্যাণচ্ছবি জননীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কে প্রত্যাখ্যান করিবে?

ধূর্জটির মধ্যে গৌরী কোনো অভাব, কোনো দৈন্য দেখিতে পান নাই, তিনি তাঁহাকে ভাবের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে-দৃষ্টিতে ধনরত্ন-রূপযৌবনের কোনো হিসাব ছিল না। শকুন্তলার প্রেম সুতীব্র অপমানের পরেও মিলনকালে দুষ্মন্তের কোনো অপরাধই লইল না, দুঃখিনীর দুই চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে অভাবের, দৈন্যের, কুরূপের সীমা নাই,—যেখানে প্রেম নাই, সেখানে পদে পদে অপরাধ। গৌরীর প্রেম যেমন নিজের সৌন্দর্যে-সম্পদে সন্ন্যাসীকে সুন্দর ও ঈশ্বর করিয়া দেখিয়াছিল, শকুন্তলার প্রেমও সেইরূপ নিজের মঙ্গলদৃষ্টিতে দুষ্মন্তের সমস্ত অপরাধকে দূর করিয়া দেখিয়াছিল। যুবকযুবতীর মোহমুগ্ধ প্রেমে এত ক্ষমা কোথায়? ভরতজননী যেমন পুত্রকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, সহিষ্ণুতাময়ী ক্ষমাকেও তেমনি শকুন্তলা তপোবনে বসিয়া আপনার অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বালক ভরত দুষ্মন্তকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এ কে আমাকে পুত্র বলিতেছে?" শকুন্তলা উত্তর করিলেন, "বাছা, আপনার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা করো।" ইহার মধ্যে অভিমান ছিল না—ইহার অর্থ এই যে, 'যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তবে ইহার উত্তর পাইবে'—বলিয়া রাজার প্রসন্নতার অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। যেই বুঝিলেন, দুষ্মন্ত তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছেন না, তখনি নিরভিমানা নারী বিগলিত চিত্তকে দুষ্মন্তের চরণে পূজাঞ্জলি দান করিলেন, নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাহারও কোনো অপরাধ দেখিতে পাইলেন না। আত্মাভিমানের দ্বারা অন্যকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহার দোষত্রুটি বড়ো হইয়া উঠে—ভাবের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিলে, সে-সমস্ত কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

যেমন শ্লোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলনের জন্য অন্য চরণের অপেক্ষা করে তেমনি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতালাভের জন্য এই দ্বিতীয় মিলনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা রাখে। শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে, কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কী দশা ঘটে? শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের বাহ্যরীতি অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।

দেখা গেল, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনেই যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে,—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা-অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্রসৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।

একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না,—তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে-নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি, তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য শ্রী, হ্রী এবং কল্যাণে উদ্‌ভাসমান; তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একপরায়ণ এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা

ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। এই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এইজন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান ও বিস্ময়কর।

শকুন্তলা

শেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপস-কুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনাস্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ডখণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে একমুহূর্তে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষ-ভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে-পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের

চঞ্চল-সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে, স্বর্গতপোবনে শাশ্বত-আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোনো ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোন চরিত্রের বিকাশ নহে, ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া—প্রেমকে স্বভাব-সৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গল-সৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গটি আমরা অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বর্গ ও মর্ত্যের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্ত্যের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারও চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্ত্যের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই; তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান, তাহা দুষ্যন্ত শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবনমত্ততার হাবভাব-লীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার—গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না, তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমতো চিনিত না—এইজন্যই তাহার মর্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্মন্তকে কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই। যেমন, যে-অরণ্যে সর্বদাই শিকার হইয়া থাকে, সেখানে ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে-সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্বদাই সহজেই মিলন হইয়া থাকে, সেখানে মীনকেতুকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত, তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।

শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি সেই পরাভব-সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায়, তাহার ধুলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিন্তু অরণ্যফুলের ধুলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না—সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধুলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধুলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে

নাই—সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্যদিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একদিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্মের অনুগতা, আবার অন্যদিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, সে একাগ্র-তপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা; ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন, যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান। গান্ধর্ববিবাহ ব্যাপারটিও তেমনি; তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখ-দুঃখ মিলন-বিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসা-চক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত, শকুন্তলার সে-নির্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্ধিত,—তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদানপ্রদানে হাস্যে-পরিহাসে-কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত, তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে, তাহাতে

এইরূপ সংগত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে-সম্বন্ধে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও শিখিয়াছে। কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিস। তাহার সরলতা গভীরতর, তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোনো অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কবি তাহা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জানে না, তাহা নহে; কারণ, তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত। বাহিরের সম্বন্ধে শকুন্তলা অনভিজ্ঞ বটে, তবু অজ্ঞ নহে, কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে; দারুণতম বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্যে, ক্ষমায়, কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসারজ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই;—আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন।

এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশব-ধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সম্বন্ধে সে-কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায়, তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার

চতুর্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয়ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়; আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরও অনেক ব্যাপক। দুষ্মন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন-অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জল-সেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেমন মিলন, মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তি দ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহবিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন—শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্‌ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষ-আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল—"ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ" তখন কাব্যের একটি

মূল স্বর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমমৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন,

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর ?
কোথা হে মহারাজ,
মৃগের প্রাণ,
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ।

এ-কথা শকুন্তলা সম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়শরনিক্ষেপ নিদারুণ। প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন—কত কঠিন, অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে—আর এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই সুকুমার ও সকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতরবাক্যে রক্ষণীয়, শকুন্তলাও তেমনি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।

মৃগের প্রতি এই করুণা-বাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতেই দেখি, বল্কলবসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহসেবার কর্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসন নহে, ভাবে ভঙ্গীতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্মন্ত বলিয়াছেন,

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্যসংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন, নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। তাহা এমনি অখণ্ড এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলই আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়। দুষ্মন্তকে দুই উদ্যত বাহু দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না।—এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যটি ভাঙিয়ো না।

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে, তখন

প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্তরব উঠিল—"ভো ভো তপস্বিগণ তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও। মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।"

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন—এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে, তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন,—

"ওগো সন্নিহিত তপোবন-তরুগণ—

তোমাদের জল না করি' দান
যে আগে জল না করিত পান;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে-জন মাতিত মহোৎসবে;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়।"

চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন।

শকুন্তলা কহিল, "হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।" প্রিয়ংবদা কহিল, "তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর, তাহা নহে, তোমার আসন্নবিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা—

মৃগের গলি' পড়ে মুখের তৃণ
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।"

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, "তাত, এই যে কুটিরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূ, এ যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করিবে, তখন সেই প্রিয় নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।"

কণ্ব কহিলেন, "আমি কখনো ভুলিব না।"

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, "আরে কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে!"

কণ্ব কহিলেন, "বৎসে,—

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।"

শকুন্তলা তাহাকে কহিল, "ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস। প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল তখন হইতে আমিই তোকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা।"

এইরূপে সমুদয় তরুলতা-মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি এক জন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।

উত্তরচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেস্ট নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত

করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই—বিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সেখানে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কোনো-মতে রক্ষা পাইয়া যে কয়জন প্রাণী তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই শূন্য-প্রায় দ্বীপের ভিতরে আধিপত্য লইয়া ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপনহত্যার চেষ্টা। পরিণামে তাহার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু শেষ হইল, এ-কথা কেহই বলিতে পারে না। দানবপ্রকৃতি ভয়ে, শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল। যাহার যাহা প্রাপ্য সম্পত্তি, সে তাহা পাইল। কিন্তু সম্পত্তিলাভ তো বাহ্যলাভ—তাহা বিষয়ী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতে পারে, কাব্যের তাহা চরম পরিণাম নহে।

টেম্পেস্ট নাটকের নামও যেমন, তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ—এবং সে-বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্বাধ প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন-পীড়নের দ্বারা এই সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্র পশুর মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু, এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমতো কাজ চালাইবার প্রণালী মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধাব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। ফলাফল-নির্ণয় ও বিভীষিকা দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ—তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে—কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়;—তাহা স্বভাব-নিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্কক্ষালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন

নাই—তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন, এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্ত নিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখবেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন, যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়-রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি',
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি ?

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে তাহার পূর্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষিবৃদ্ধ কণ্বের আশীর্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিগ্ধকরুণ, বড়ো পবিত্রমধুর ভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে-প্রেমের যে-গৃহের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে, পরবর্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে-চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল, "এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি ?" রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,"সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ"—আমরা এক বার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য, তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বলো, বড়ো নিপুণভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ। * * * যাও, বেশ নাগরিকবৃত্তি দ্বারা এই কথাটি তাঁহাকে বলিবে।"

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে

কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে, স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম—সেখানকার যে-নিয়ম, এখানকার সে-নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কী করিয়া? সেখানে যে-ব্যাপারটি সহজ সুন্দরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার কী দশা হইবে, তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। ঋষিশিষ্য শার্ঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।" শারদ্বত কহিলেন, "তৈলাক্তকে দেখিয়া স্নাত ব্যক্তির, অশুচিকে দেখিয়া শুচি ব্যক্তির, সুপ্তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের এবং বদ্ধকে দেখিয়া স্বাধীন পুরুষের যে-ভাব মনে হয়, এই সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে।" একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন যাহাতে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ অতিমাত্র আঘাত না করে। হংসপদিকার সরল করুণগীত এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল, তখন এই তপোবনের দুহিতা বিশ্বস্ত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো বিস্ময়ে, ত্রাসে, বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে-বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে একটি তপোবন লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল, এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দিক হইতে চিরদিনের জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল, শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গৌতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কোথায় সেই সকল তরুলতা-পশুপক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ মাধুর্যের যোগ, সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্মল জীবন! এই এক মুহূর্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সংগীতধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল।

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা। যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাহার চারিদিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত, সে আজ কী একাকিনী। তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার এক-মাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্ব-পরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্যন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে-বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারিদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব—কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্যন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে, শকুন্তলা-লাভের কোনো গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া, তাহা পাওয়া নহে—লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণ-ভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয় তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘদুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্যন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করি-

তেন, তবে শকুন্তলা হংসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত স্খলদ্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে। "সকৃৎকৃত-প্রণয়োহয়ং জনঃ।"

শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠুরতার প্রত্যভিঘাতেই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না। অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তরবাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই—তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়া এ-সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন—এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন—বাহির হইতে তাহাকে ছাইচাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসংকার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে,—পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তি লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখ-খনিত পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্য এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে বাহিরের ক্লেশ। কেবল কাঠের বোঝা বহন করিয়া পরীক্ষার শেষ হয় না। আভ্যন্তরিক কী উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিমাকে নিজের ভিতর হইতেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি ভঙ্গুরতাকে চাপপ্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই—সংসারে বিধাতার বিধানে পাপও যে কী মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত আছে, কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম—সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল—এবং স্বর্গসৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিদীর্ণ, স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একটি **Paradise Lost** এবং **Paradise Regained** বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত—যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভালো—ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই। অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল—আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল, বাকী রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা তপস্যার দ্বারা সেই স্বর্গ যখন জিত হইল, তখন আর কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবন এইরূপ—শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে, তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণতবয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয় এবং অনুতাপে-বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য সংযম আমরা আর কোনো নাটকেই দেখি নাই। প্রবৃত্তির প্রবলতাপ্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তি যে কতদূর পর্যন্ত যাইতেপারে, তাহা অতিশয়োক্তিদ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালোবাসেন। শেক্‌সপীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত-গভীর এমন সংযত-সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌সপীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু

প্রেমালাপ আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাহার অধিকাংশই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আলগা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত, তিনি সেখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোনো খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষ্যে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থা আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়কালে কী সকরুণ গাম্ভীর্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনি অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে ভয়, লজ্জা, অভিমান, অনুনয়, ভৎর্সনা, বিলাপ সমস্তই আছে, অথচ কত অল্পের মধ্যে। যে শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জন দিয়াছিল, দুঃখের সময় দারুণ অপমানকালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্‌ভ মর্যাদা এমন আশ্চর্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল? এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর। কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীর-তপোবন নীরব, সর্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর কোনো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে? দুষ্মন্তের অপরাধকে দুর্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখা, সে-ও কবির সংযম। দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন, তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

দুষ্মন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, তখন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল—

> মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
> ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়—কালিদাস তখনই ধর্মারণ্যের, কাব্যকাননের এই মূর্তিমান

বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন—ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন—সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের 'পরে সমস্ত দাবি কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবি নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই—পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই—কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্তিকে তাঁহাব কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি শান্তি, সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনো বা তাহা শকুন্তলার যৌবনলীলায় আপনার লীলামাধুর্য অর্পণ করিয়াছে, কখনো বা মঙ্গল-আশীর্বাদের সহিত আপনার কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করিয়াছে, কখনো বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক বিদায়বাক্যে করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্মলতা একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের রশ্মি নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলাকাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে অথচ ব্যাপকভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে-কাজ টেম্পেস্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে—তাহা সৌন্দর্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।

টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টে

মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে-সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে, শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ব, গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

কাদম্বরীচিত্র

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। অন্য দেশে নগর হইতে সভ্যতার সৃষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে; বসনভূষণ ঐশ্বর্যের গৌরব সর্বত্রই আছে, আর বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেই; অন্যান্য দেশ ধর্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার-বিহার-আচারে স্বাধীন; ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার-বিহার-আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যাইতে পারে সাধারণ মানবপ্রকৃতি হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেই অসামান্যতার আর একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভালোবাসে; কিন্তু কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেরই গল্প শুনিতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না; যদি বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস-উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। বর্ণনা, তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত, সে-আলোচনা নিষ্ফল; কারণ প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না। পর্বতশৃঙ্গ হইতে নদী যদি বা শৈবাল বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার স্রোত ক্ষীণবেগ না হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় না। ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন, তখন সমস্ত ভগবদ্‌গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। কিষ্কিন্ধ্যা এবং সুন্দরাকাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নাই এ-কথা মানি, তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অত বড় একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা

মার্জনা করিতে পারে। কেনই বা সে মার্জনা করে? কারণ, গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে, প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারোটি বিপুলায়তন পর্ব অকাতরচিত্তে, মৃদুমন্দগতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

আবার, গল্প শুনিবার আগ্রহ অনুসারে গল্পের প্রকৃতিও ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ছয়টি কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, একটিমাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসংকোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার? আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এই দেখিয়া আসিলাম যে, অধর্মচারী নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরম শত্রু; অসাধারণ শৌর্যে ও বিপুল আয়োজনে সেই ভয়ংকর রাবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন, তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর হইল, আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত হইলাম, এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে কবি দেখাইয়া দিলেন, সীতার চরম শত্রু অধার্মিক রাবণ নহে, সে-শত্রু ধর্মনিষ্ঠ রাম; নির্বাসনে তাঁহার তেমন সংকট ঘটে নাই, যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামীর গৃহে; যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিবামাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল। গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্যপ্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি, সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মহাভারতেও তাই। এক স্বর্গারোহণপর্বেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। গল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছে গল্পের অবসান যেখানে, মহাভারত সেখানে থামিলেন না— অত বড়ো গল্পটাকে বালুনির্মিত খেলাঘরের মতো এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন—সংসারের প্রতি এবং গল্পের প্রতি যাহাদের বৈরাগ্য তাহারা ইহার মধ্য হইতে সত্যলাভ করিল এবং ক্ষুব্ধ হইল না। মহাভারতকে যে-লোক গল্পের মতো করিয়া পড়িতে চেষ্টা করে, সে মনে করে অর্জুনের শৌর্য অমোঘ, সে মনে করে শ্লোকের উপর শ্লোক গাঁথিয়া মহাভারতকার অর্জুনের জয়স্তম্ভ অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছেন—কিন্তু সমস্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হঠাৎ এক দিন এক স্থানে অতি অল্প কথার মধ্যে দেখা গেল, এক দল সামান্য দস্যু কৃষ্ণের রমণীদিগকে অর্জুনের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল; নারীগণ কৃষ্ণসখা পার্থকে আহ্বান করিয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, অর্জুন গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। অর্জুনের এমন অভাবনীয়

অবমাননা যে মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ববর্তী অতগুলা পর্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু কাহারও উপর কবির মমতা নাই। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্যবীর্যমহত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া অনাসক্ত, সেখানে কবিও নির্মম, এবং কাহিনীও কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ভার মোচন করিয়া দ্রুতবেগ অবলম্বন করে না।

তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে একেবারে কালিদাসে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জনের জন্য কী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। উৎসবে যে মাটির প্রদীপের সুন্দর দীপমালা রচনা হয়, পরদিন তাহা কেহ তুলিয়া রাখে না; ভারতবর্ষে আনন্দ-উৎসবে নিশ্চয়ই এমন অনেক মাটির প্রদীপ, অনেক ক্ষণিক সাহিত্য, নিশীথে আপন কর্ম সমাপন করিয়া প্রত্যুষে বিস্মৃতিলোক লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম তৈজস প্রদীপ দেখিলাম কালিদাসের,—সেই পৈতৃক প্রদীপ এখনো আমাদের ঘরে রহিয়া গেছে—আমাদের উজ্জয়িনীবাসী পিতামহের প্রাসাদশিখরে তাহা প্রথম জলিয়াছিল—এখনো তাহাতে কলঙ্ক পড়ে নাই। কেবল আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃত-সাহিত্যে কেবল কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি খণ্ডকাব্যের কথা বলিতেছি, নাটকের কথা নহে।) মেঘদূত তাহার এক দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত-সাহিত্যে বোধ করি আর নাই। যাহা আছে তাহা মেঘদূতেরই আধুনিক অনুকরণ, যথা পদাঙ্কদূত প্রভৃতি; এবং তাহাও পৌরাণিক। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নহে, কাব্য; তাহা চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন নাই। ভারতবর্ষীয় আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন—আশা করি, ঋতুসংহার পাঠে মোক্ষলাভের সহায়তা হইবে, এমন উপদেশ কেহ দিবেন না।

কিন্তু তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই—যেটুকু আছে সে-সূত্রটি অতি সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন; এবং তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্যহস্ত হইতে কোনো উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না পাইলেন সে-সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না—তাঁহাকে তাড়া দিবার লোকও কেহ নাই। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময় শকহূণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার এক জন নায়ক ছিলেন; অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের

পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গ তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু কই? রাজসভার শ্রোতারা দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন। মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা, কোনোটাতেই ত্বরান্বিত হইবার জন্য কোনো উপরোধ দেখি না। সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক্, এখন ওই বর্ণনাটাই চলুক। রঘুবংশও বিচিত্র বর্ণনার উপলক্ষ্য মাত্র।

রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত। হায়, অবন্তীরাজ্যে নববর্ষার দিনে উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা যে গল্প করিতেন, সে-সমস্ত গেল কোথায়? আসল কথা, গ্রামবৃদ্ধেরা তখন গল্প করিতেন, কিন্তু সে গ্রামের ভাষায়। সে-ভাষায় যে কবিরা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা যথেষ্ট আনন্দদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অমরতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের কবিত্ব অল্প ছিল বলিয়া যে তাঁহারা বিনাশ পাইয়াছেন এমন কথা বলি না। নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাকবি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম্যভাষা প্রদেশবিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিতমণ্ডলী কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে—সে-ভাষায় যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোনো স্থায়ী ভিত্তি পান নাই; নিঃসন্দেহ অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যপুরী চলনশীল পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে-ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরেজি অলংকারে যে-শ্রেণীর কবিতাকে lyrics বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভবে না। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে, তাহাতেও গানের লঘুতা, সরলতা ও মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না। বাঙালি জয়দেব সংস্কৃত ভাষাতে গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।

মৃত ভাষায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না; কারণ, গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক,—ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভাবের মতো বহন করিয়া চলিতে হয় তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।

কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মতো সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না—তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত—এক বার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানাযন্ত্রের এমন কন্সর্ট বাজিয়া উঠে, তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্‌নৈপুণ্য দ্বারা পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া আবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়;—বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরি লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। ময়ূরপুচ্ছনির্মিত এমন অনেক সুন্দর ব্যজন আছে যাহাতে ভালো বাতাস হয় না—কিন্তু বাতাস করিবার উপলক্ষ্য মাত্র লইয়া রাজসভায় কেবল তাহা শোভার জন্য সঞ্চালন করা হয়। রাজসভায় সংস্কৃত কাব্যগুলিও ঘটনাবিন্যাসের জন্য তত অধিক ব্যগ্র হয় না; তাহার বাগ্‌বিস্তার, উপমাকৌশল, বর্ণনানৈপুণ্য রাজসভাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চমৎকৃত করিতে থাকে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে, তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যেমন রমণীর তেমনি পদ্যেরও অলংকারের প্রতি টান বেশি—গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতই কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়—এইজন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহুশোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই,—বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হউক কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।

সেইজন্য বাণভট্ট যদিচ স্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই; সংস্কৃত ভাষাকে অনুচর-পরিবৃত সম্রাটের মতো অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায়-ভাবে ছত্র বহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র। ভাষার রাজমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই সে আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই।

শূদ্রক রাজা কাদম্বরী গল্পের নায়ক নহেন—তিনি গল্প শুনিতেছেন মাত্র, অতএব তাঁহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে কোনো ক্ষতি ছিল না। আখ্যায়িকায় বহিরংশ যদি যথোপযুক্ত হ্রস্ব না হয়, তবে মূল আখ্যানের পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় আমাদের কল্পনাশক্তিও সীমাবদ্ধ ; আমরা কোনো জিনিসের সমস্তটা একসঙ্গে সমান করিয়া দেখিতে পাই না—সম্মুখটা বড়ো দেখি, পশ্চাৎটা ছোটো দেখি, পৃষ্ঠদেশটা দেখি না, অনুমান করিয়া লই ; এইজন্য শিল্পী তাঁহার সাহিত্যশিল্পের যে অংশটা প্রধানত দেখাইতে চান সেইটাকে বিশেষরূপে গোচরবর্তী করিয়া বাকি অংশগুলিকে পার্শ্বে পশ্চাতে এবং অনুমানক্ষেত্রে রাখিয়াছেন। কিন্তু কাদম্বরীকার মুখ্য গৌণ ছোটো বড়ো কোনো কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চান নাই। তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয়, মূল প্রসঙ্গটি দূরবর্তী হইয়া পড়ে, তাহাতে তিনি বা তাঁহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি কথা কিছু বাদ দিলে চলিবে না, কারণ কথা বড়ো সুনিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য ; কৌশলে, মাধুর্যে, গাম্ভীর্যে, ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ।

অতএব মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনির মতো কথা আরম্ভ হইল—“আসীদ্ অশেষনরপতি-শিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ”—কিন্তু হায় আমার দুরাশা। কাদম্বরী হইতে সমগ্র পদ উদ্ধার করিয়া কাব্যরস আলোচনা করিব আমার ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের এমন শক্তি নাই। আমরা যে-কালে জন্মিয়াছি, এ বড়ো ব্যস্ততার কাল—এখন সকল কথার সমস্তটা বলিবার প্রলোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়। কাদম্বরীর সময়ে কবি কথাবিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে কথা-সংক্ষেপের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য যে-বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, এখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক তাহার উল্টা বিদ্যা আবশ্যক হইয়াছে।

কিন্তু এক কালের মধুলোভী যদি অন্য কাল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজকালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্য কালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইতেছে ; মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরসবিলাসী রাজ্যেশ্বরবিশেষ, রাজসভা মধ্যে সমাসীন এবং “সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ।” এইরূপ রসচর্চায় রসিকপরিবৃত হইয়া থাকিলে

লোক প্রতিদিনের সুখদুঃখসমাকুল যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত কর্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মাতাল যেরূপ আহার ভুলিয়া মদ্যপান করিতে থাকে তাহারাও সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাবের তরলরস পানে বিহ্বল হইয়া থাকে; তখন সত্যের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কেবল আদেশ হইতে থাকে, ঢালো ঢালো, আরও ঢালো। এখনকার দিনে মনুষ্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি হইয়াছে; লোকটা কে, এবং সে কী করিতেছে ইহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল, এইজন্য ঘরে বাহিরে চতুর্দিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমরা তন্ন তন্ন করিয়া পর্যালোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু সেকালে পণ্ডিতই বল, রাজাই বল, মানুষকে বড়ো বেশি কিছু মনে করিতেন না। বোধ করি স্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে এবং একান্ত অবহিতভাবে শাস্ত্রাদি আলোচনায় তাঁহারা জগৎসংসারে অনেকটা বেশি নির্লিপ্ত ছিলেন। বোধ করি বিধিবিধান-নিয়মসংযমের শাসনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বড়ো একটা প্রশ্রয় ছিল না। এইজন্য রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী সংস্কৃত-সাহিত্যে লোকচরিত্রসৃষ্টি এবং সংসার-বর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অবলম্বন। রঘুর দিগ্বিজয়-ব্যাপারে অনেক উপমা এবং সরস বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু রঘুর বীরত্বের বিশেষ একটা চরিত্রগত চিত্র পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। অজ-ইন্দুমতী-ব্যাপারে অজ এবং ইন্দুমতী উপলক্ষ্য মাত্র—তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ মূর্তি সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু পরিণয়, প্রণয় ও বিচ্ছেদশোকের একটি সাধারণ ভাব ও রস সেই সঙ্গে উচ্ছলিত হইতেছে। কুমারসম্ভবে হরপার্বতীকে অবলম্বন করিয়া প্রেম, সৌন্দর্য, উপমা, বর্ণনা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্য ও সংসারের বিশেষত্বের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য থাকাতে ভাষা বর্ণনা মনুষ্যকে ও ঘটনাকে সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আপন রস বিস্তার করিয়াছে। সেই কথাটি স্মরণ রাখিয়া আধুনিক কালের বিশেষত্ব বিস্মৃত হইয়া কাদম্বরীর রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দের সীমা থাকিবে না।

কল্পনা করিয়া দেখো—গায়ক গান গাহিতেছে "চ-ল-ত-রা-আ-আ-আ-আ-," ফিরিয়া পুনরায় "চ-ল তরা আ আ আ" সুদীর্ঘ তান,—শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এদিকে গানের কথায় আছে, "চলত রাজকুমারী" কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে রাজকুমারী না চলে তো না-ই চলুক, কিন্তু তানটা চলিতে থাক্। অবশ্য, রাজকুমারী কোন্ পথে চলিতেছেন সে-সংবাদের জন্য যাহার বিশেষ উদ্বেগ আছে তাহার পক্ষে তানটা দুঃসহ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি রস

উপভোগ করিতে চাও, তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয় অধীর না হইয়া তানটা শুনিয়া লও। কারণ যে-জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছ সেখানে কৌতূহলে অধীর হইয়া ফল নাই, ইহা রসে মাতোয়ারা হইবার স্থান। অতএব স্নিগ্ধজলদনির্ঘোষে আপাতত শূদ্রক রাজার বর্ণনা শোনা যাক। সে-বর্ণনায় আমরা শূদ্রক রাজার চরিত্রচিত্র প্রত্যাশা করিব না। কারণ চরিত্রচিত্রে একটা সীমা-রেখা অঙ্কিত করিতে হয়—ইহাতে সীমা নাই—ভাষা কল্লোলমুখর সমুদ্রের বন্যার ন্যায় যত দূর উদ্বেল হইয়াছে তাহাতে তাহার বাধা দিবার কেহ নাই। যদিও সত্যের অনুরোধ বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদিশা নগরীর রাজা, তথাপি অপ্রতিহতগামিনী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, তিনি "চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা।" শূদ্রকের মহিমা কতটুকু ছিল সেই ব্যক্তিগত তুচ্ছতথ্যালোচনায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজকীয় মহিমা কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, সেই কথা যথোচিত সমারোহসহকারে ঘোষিত হউক।

সকলেই জানেন, ভাব সত্যের মতো কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা, ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা। সেই স্বভাববিপুল ভাষা কাদম্বরীতে পূর্ণবর্ষার নদীর মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ভাষা ও ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত প্লাবিত হইয়া একাকার হইয়া যায় নাই। কাদম্বরীর প্রথম আরম্ভ-চিত্রটিই তাহার প্রমাণ।

তখন ভগবান মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই; নূতন পদ্মগুলির পত্রপুট একটু খুলিয়া গিয়াছে, আর তাহার পাটল আভাটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে।

এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইল। এই বর্ণনার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রং মাখাইয়া দেওয়া, এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন ডুলাইয়া দেওয়া। "একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি"—কথার কী মোহ! অনুবাদ করিতে গেলে শুধু এইটুকু ব্যক্ত হয় যে, তরুণ সূর্যের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম, কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজালে, কেবলমাত্র ওই বিশেষ্যবিশেষণের বিন্যাসে একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাত-কাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। এ যেমন প্রভাতের তেমনি একটি কথায় তপোবনে সন্ধ্যাসমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করি।

"দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা"

দিনশেষে তপোবনের রক্তচক্ষু ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিরিয়া আসে, কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণা। কপিলা ধেনুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়া সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতেছেন। সকালের বর্ণনায় যেমন কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাসটুকুর বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্যে এবং সুস্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন—তেমনি বর্ণের উপমাচ্ছলে তপোবনের গোষ্ঠে-ফেরা অরুণচক্ষু কপিলবর্ণ ধেনুটির কথা তুলিয়া সন্ধ্যার যত কিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে বলিয়া লইয়াছেন।

এমন বর্ণসৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রংকে লাল রং বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্বরীকারের লাল রং কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোনো লাল লাক্ষালোহিত, কোনো লাল পারাবতের পদতলের মতো, কোনো লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান।

"একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্তপক্ষসংপুটে বৃদ্ধহংসে ইব মন্দাকিনীপুলিনাদ্ অপরজলনিধিতটম্ অবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতাম্ আশাচক্রবালে গজরুধিররক্তহরিসটালোমলোহিনীভিঃ আতপ্তলাক্ষিকতন্তুপাটলাভিঃ আয়ামিনীভিরশিশিরকিরণদীধিতিভিঃ, পদ্মরাগশলাকাসম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমাণে গগন-কুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে।"

এক দিন আকাশ যখন প্রভাতসন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মতো রক্তবর্ণ-পক্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্যায় মন্দাকিনী-পুলিন হইতে পশ্চিম-সমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন, দিকচক্রবালে বৃদ্ধ রঙ্কুমৃগের মতো একটি পাণ্ডুতা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে; আর গজরুধিররক্ত সিংহ-জটার লোমের ন্যায় লোহিত, এবং ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্য-রশ্মিগুলি ঠিক যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জনীর ন্যায় গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্রপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।

রং ফলাইতে কবির কী আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রং শুধু চিত্রপটের রং নহে, তাহাতে কবিত্বের রং ভাবের রং আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রং শুধু সেই বর্ণনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। কথাটা এই যে, ব্যাধ গাছের উপর চড়িয়া নীড় হইতে পক্ষিশাবকগুলিকে পাড়িতেছে—সেই অনুপজাত-উৎপতনশক্তি শাবকগুলির কেমন রং?

"কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ কাংশ্চিদর্কোপল-

সদৃশান্ কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব প্রতিকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।"

কেহ বা অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটলকান্তি যেন শাল্মলিকুসুমের মতো; কাহারও পদ্মের নূতন পাপড়ির মতো অল্প-অল্প ডানা উঠিতেছে; কাহারও বা পদ্মরাগের মতো বর্ণ; কাহারও বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ উন্মুক্তমুখ কমলের মতো; কাহারও বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে;— এই সমস্ত প্রতিকারে অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক-একটি ফলের মতো গ্রহণপূর্বক গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিন্যাস নহে—তাহার সঙ্গে করুণা মাখানো রহিয়াছে অথচ কবি তাহা স্পষ্টত হা হুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই, বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনা-গুলির সৌকুমার্যে তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এমন করিলে প্রবন্ধ শেষ হইবে না। কারণ কাদম্বরীর মধ্যে প্রলোভন রাশি রাশি,—এই কুঞ্জবনের গলিতে গলিতে নব নব বর্ণের পুষ্পিত লতাবিতান— এখানে সমালোচক যদি মধুপানে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার গুঞ্জনধ্বনি বন্ধ হইয়া যাইবে। বাস্তবিক আমার সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবলমাত্র প্রলোভনে পড়িয়া এই পথে আকৃষ্ট হইয়াছি। যে উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম অমনি সেই প্রসঙ্গে কাদম্বরীর সৌন্দর্য আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিয়া লইব। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বুঝিতেছি এ-পথ সংক্ষিপ্ত নহে,—এই রসস্রোতে আত্মসমর্পণ করিলে লক্ষ্যপথে আর শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।

বর্তমানসংখ্যক "প্রদীপে" যে চিত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে, সে-চিত্র অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার মূল পটটি বর্ণতৈলে অঙ্কিত, বিষয়টি কাদম্বরী হইতে গৃহীত এবং চিত্রকর আমার পরম স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক আত্মীয় শ্রীমান যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ-কথা নিশ্চয়, সংস্কৃত-সাহিত্যে আঁকিবার বিষয়ের অভাব নাই। কিন্তু শিল্প-বিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলাতি ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোনো উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চক্ষু দিয়া দেশী চিত্র-বিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যামিনীপ্রকাশ অল্প বয়সেই সেই

কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রথম চেষ্টার যথেষ্ট সফলতা দেখিয়াই "প্রদীপের" শিল্পানুরাগী বন্ধু ও কর্তৃপক্ষগণ আগ্রহের সহিত এই চিত্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং আমাকে ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাদম্বরীর যে-প্রসঙ্গটি চিত্রে বিবৃত হইয়াছে সেইটি সংস্কৃত হইতে বাংলায় ব্যাখ্যা করিলে ইহার উপযুক্ত ভূমিকা হয়। সেই প্রসঙ্গটি কাদম্বরীর ঠিক প্রবেশদ্বারেই। আলোচনা করিতে করিতে ঠিক সেই পর্যন্তই আসিয়াছিলাম, কিন্তু লোভে পড়িয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পুনর্বার সেইখানে ফেরা যাক।

নব প্রভাতে রাজা শূদ্রক সভাতলে বসিয়া আছেন এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া ক্ষিতিতল-নিহিত-জানুকরকমলা হইয়া নিবেদন করিল, "দক্ষিণাপথ হইতে চণ্ডালকন্যা একটি পিঞ্জরস্থ শুক লইয়া কহিতেছে যে, মহারাজ সমুদ্রের ন্যায় সকল ভুবনতলের সর্বরত্নের একমাত্র ভাজন, এই বিহঙ্গটিও একটি পরমাশ্চর্য রত্নবিশেষ বলিয়া দেবপাদমূলে প্রদান করিবার জন্য আমি আগত হইয়াছি, অতএব দেবদর্শনসুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।"

পাঠকগণ মনে করিবেন না প্রতিহারী এত সংক্ষেপে নিষ্কৃতি পাইয়াছে—অকৃপণা কবিপ্রতিভা তাহার প্রতিও অজস্র কল্পনাবর্ষণ করিয়াছে—

তাহার বামপার্শ্বে অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্র লম্বিত থাকাতে তাহাকে বিষধরজড়িত চন্দনলতার মতো ভীষণরমণীয় দেখিতে হইয়াছে, সে শরৎলক্ষ্মীর ন্যায় কলহংসশুভ্রবসনা, এবং বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় বেত্রলতাবতী ; সে যেন মূর্তিমতী রাজাজ্ঞা, যেন বিগ্রহিণী রাজ্যাধিদেবতা।

সমীপবর্তী রাজগণের মুখাবলোকন করিয়া উপজাতকুতূহল রাজা প্রতিহারীকে কহিলেন, তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও। প্রতিহারী তখন চণ্ডালকন্যাকে সভাস্থলে উপস্থিত করিল।

সেখানে অশনিভয়পুঞ্জিত-শৈলশ্রেণীমধ্যগত কনকশিখরী মেরুর ন্যায় নরপতিসহস্রমধ্যবর্তী রাজা। নানা রত্নাভরণকিরণজালে তাঁহার অবয়ব প্রচ্ছন্নপ্রায় হওয়াতে মনে হইতেছে যেন সহস্র ইন্দ্রায়ুধে অষ্টদিগ্‌বিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া বর্ষাকালের ঘনগম্ভীর দিন বিরাজমান। লম্বিতস্থূলমুক্তাকলাপ ও স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ মণিদণ্ডচতুষ্টয়ে অমল শুভ্র অনতিবৃহৎ দুকূলবিতান বিস্তৃত, তাহারই অধোভাগে ইন্দুকান্ত মণিপর্যঙ্কে রাজা নিষণ্ণ ; তাঁহার পার্শ্বে কনকদণ্ড চামরকলাপ উদ্ধূয়মান ; পরাভবপ্রণত শশীর ন্যায় বিশদোজ্জ্বল স্ফটিকপাদপীঠে তাঁহার বামপদ বিন্যস্ত ; অমৃতফেনের ন্যায় তাঁহার লঘুশুভ্র দুকূলবসনের প্রান্তে গোরোচনার দ্বারা হংসমিথুনমালা অঙ্কিত ; অতি সুগন্ধ চন্দনানুলেপনে তাঁহার উরঃস্থল ধবলিত, তাহারই মধ্যে মধ্যে কুঙ্কুমচর্চিত হওয়াতে স্থানে স্থানে নিপতিত প্রভাত-রবিকিরণে অঙ্কিত কৈলাসশিখরীর ন্যায় তিনি শোভমান ; ইন্দ্রনীল অঙ্গদযুগলে তিনি দুই বাহুতে চপলা রাজলক্ষ্মীকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ; তাঁহার কর্ণোৎপল ঈষৎ আলম্বিত, মস্তকে আমোদিত মালতীমালা, যেন উষাকালে অস্তাচলশিখরে তারকাপুঞ্জ পর্যস্ত ; সেবাসংগতা অঙ্গনাগণ দিগ্‌বধূর ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন

করিয়া আছে। তখন প্রতিহারী নরপতিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য রক্তকুবলয়দলকোমল হস্তে বেণুলতা গ্রহণ করিয়া এক বার সভাকুট্টিমে আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ তালফলপতনশব্দে বনকরিযূথের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, আর্যবেশধারী ধবলবসন একটি বৃদ্ধ চণ্ডাল অগ্রে আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে কাকপক্ষধারী একটি বালক স্বর্ণশলাকানির্মিত পিঞ্জরে বিহঙ্গকে বহন করিয়া আনিতেছে। এবং তাহার পশ্চাতে নিদ্রার ন্যায় লোচনগ্রাহিণী এবং মূর্ছার ন্যায় মনোহরা একটি তরুণযৌবনা কন্যা;—অসুরগৃহীত অমৃত অপহরণের জন্য কপটপটুবিলাসিনীবেশধারী ভগবান হরির ন্যায় সে শ্যামবর্ণা, যেন একটি সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিপুত্তলিকা; আগুল্‌ফবিলম্বিত নীলকঞ্চুকের দ্বারা তাহার শরীর আচ্ছন্ন এবং তাহারই উপরে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠনে যেন নীলোৎপলবনে সন্ধ্যালোক পড়িয়াছে; একটি কর্ণের উপরে উদয়োন্মুখ-ইন্দুকিরণচ্ছটার ন্যায় একটি শুভ্র কেতকীপত্র আসক্ত; ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, যেন কিরাতবেশা ত্রিলোচনা ভবানী।

আমাদের সমালোচ্য চিত্রের বিষয়টি কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া দিলাম। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই এ-কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে—বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন—এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন ধারাবাহিক, তাহা নহে; এক-একটি ছবির চারিদিকে প্রচুর কারুকার্যবিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া, ফ্রেমসমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।

১৩০৬

কাব্যের উপেক্ষিতা

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর-একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখ-বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি-কমণ্ডলু হইতে এক বিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না। হায় অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো

মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় বা তোমার অস্তশিখরী তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

কাব্যসংসারে এমন দুটি-একটি রমণী আছে যাহারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন, তাহা পাঠকবিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে উর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্স্‌পীয়র বলিয়া গেছেন—গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে, কারণ গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ। তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে। এক বার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

উর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে এক দিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহ-সভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। উর্মিলা চিরবধূ—নির্বাককুণ্ঠিতা নিঃশব্দ-চারিণী। ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্তেই জন্য প্রকাশিত

হইয়াছিল—সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবারমাত্র তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, ইনি কে?" লক্ষ্মণ লজ্জিতহাস্যে মনে মনে কহিলেন, ওহো উর্মিলার কথা আর্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে-ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন; তাহার পর রামচরিত্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখ-চিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল-অঙ্গুলি এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে তো কেবল বধূ উর্মিলা মাত্র।

তরুণ শুভ্রভালে যেদিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সেদিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না? আর যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সেদিন বধূ উর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া ছিল তাহা কি কেহ জানে? সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল? যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনিও এক বার চাহিয়া দেখিলেন না।

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে-গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে কিন্তু সীতার জন্য উর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। সে-কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ তো বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন—নারী-জীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর উর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল? সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্ত-চরণক্ষেপের প্রতি নত দৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন—যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচিরপ্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল? পাছে সীতার সহিত উর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই

শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?

সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়ংবদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল, নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। কঠিনহৃদয় কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকার জন্য কত অক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্মমচিত্তে বিসর্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে যাহাকে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয়? দীপ্তরোষ ঋষিশিষ্যদ্বয় এবং হতবুদ্ধি রোরুদ্যমানা গৌতমী যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া উৎসুক উৎকণ্ঠিত সখী দুইটিকে রাজসভার বৃত্তান্ত জানাইল তখন তাহাদের কী হইল, সে-কথা শকুন্তলা নাটকের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই অকথিত অপরিমেয় বেদনা সেইখানেই ক্ষান্ত হইয়া গেল? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বিনা ছন্দে বিনা ভাষায় চিরদিন তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল না?

কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি, প্রিয়ংবদা অনসূয়া শকুন্তলার কতখানি ছিল—তখন সেই কণ্বদুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়বিচারসংগত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর।

শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য-গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দুটি লাবণ্যপ্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনটি সখী যখন জলের ঘট লইয়া অকালবিকশিত নবমালতীর তলে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দুষ্মন্ত কি একা শকুন্তলাকে ভালোবাসিয়াছিলেন? তখন হাস্যে কৌতুকে নবযৌবনের বিলোলমাধুর্যে কাহারা শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল? এই দুটি তাপসী সখী। একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ! শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে যেখানে একাকিনী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমাকুলতা বর্ণিত আছে সেখানে কবি অনেকটা হীনবল হইয়াছিলেন—কোনোমতে অচিরে গৌতমীকে আনিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন—কারণ শকুন্তলাকে যাহারা আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ

করিয়া ছিল তাহারা সেখানে ছিল না। বৃন্তচ্যুত ফুলের উপর দিবসের সমস্ত প্রখর আলোক সহ্য হয় না—বৃন্তের বন্ধন এবং পল্লবের ঈষৎ অন্তরাল ব্যতীত সে আলোক তাহার উপর তেমন কমনীয় কোমল ভাবে পড়ে না। নাটকের ওই কটি পত্রে সখীবিরহিতা শকুন্তলা এতই সুস্পষ্টরূপে অসহায় অসম্পূর্ণ অনাবৃতভাবে চোখে পড়ে যে, তাহার দিকে যেন ভালো করিয়া চাহিতে সংকোচ বোধ হয়—মাঝখানে আর্যা গৌতমীর আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকমাত্রেই মনে মনে আরাম লাভ করে।

আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা, চেনা কঠিন হইতে পারে।

শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনো পরিবর্তন হয় নাই? হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না, তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া। এখন হইতে অপরাহ্নে আলবালে জলসেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোকতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে?

এখন সেই সখীভাবনির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে মর্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারা তো ছায়া নহে; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই তো। তাহারা জীবন্ত, মূর্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে—অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না—এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক-এক দিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

সংস্কৃত-সাহিত্যে আর একটি অনাদৃতা আছে। তাহার সহিত পাঠকদের পরিচয় সাধন করাইতে আমি কুণ্ঠিত। সে বড়ো কেহই নহে, সে কাদম্বরী কাহিনীর

পত্রলেখা। সে যেখানে আসিয়া অতি স্বল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনোপ্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড়ো সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট।

এই আখ্যায়িকার পত্রলেখা যে সুকুমার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে সেরূপ সম্বন্ধ আর কোনো সাহিত্যে কোথাও দেখি নাই। অথচ কবি অতি সহজে সরল-চিত্তে এই অপূর্ব সম্বন্ধবন্ধনের অবতারণা করিয়াছেন, কোনোখানে এই ঊর্ণাতন্তুর প্রতি এতটুকু টান পড়ে নাই যাহাতে মুহূর্তেকের জন্য ছিন্ন হইবার আশঙ্কামাত্র ঘটিতে পারে।

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে কৈলাস নামে এক কঞ্চুকী প্রবেশ করিল—তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা, অনতিযৌবনা ; মস্তকে ইন্দ্রগোপ কীটের মতো রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দনতিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমলতনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য নূতন অঙ্কিত ;—এই তরুণী লাবণ্যপ্রভাপ্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া রুণিতমণিনূপুরাকলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।

কঞ্চুকী প্রণাম করিয়া ক্ষিতিতলে দক্ষিণ কর রাখিয়া জ্ঞাপন করিল, "কুমার, আপনার মাতা মহাদেবী বিলাসবতী জানাইতেছেন—এই কন্যা পরাজিত কুলুতেশ্বরের দুহিতা, বন্দিনী, পত্রলেখা ইহার নাম। এই অনাথা রাজদুহিতাকে আমি দুহিতানির্বিশেষে এতকাল পালন করিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে তোমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম। ইহাকে সামান্য পরিজনের মতো দেখিয়ো না, বালিকার মতো লালন করিয়া নিজের চিত্তবৃত্তির মতো চাপল্য হইতে নিবারণ করিয়ো, শিষ্যার ন্যায় দেখিয়ো, সুহৃদের সমস্ত বিশ্রম্ভব্যাপারে ইহাকে অভ্যন্তরে লইয়ো, এবং এই কল্যাণীকে এমত সকল কার্যে নিযুক্ত করিয়ো যাহাতে এ তোমার অতিচির পরিচারিকা হইতে পারে।" কৈলাস এই কথা বলিতেই পত্রলেখা তাঁহাকে অভিজাতপ্রণাম করিল এবং চন্দ্রাপীড় তাহাকে অনিমেষলোচনে সুচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া "অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে" বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিংকরীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখীত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো—কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়? নবযৌবন কুমারকুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক্ হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন?

কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন, এই গণ্ডির রেখামাত্র-বাহিরে তাহাকে কোনো দিন টানেন

নাই। হতভাগিনী বন্দিনীর প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কী হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনো দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখীত্ব-পর্দার একটা প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।

অথচ সখীত্বের মধ্যে লেশমাত্র অন্তরাল ছিল না। কবি বলিতেছেন পত্রলেখা সেই প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্রেই সেবারসসমুপজাতানন্দা হইয়া দিন নাই রাত্রি নাই উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে ছায়ার মতো রাজপুত্রের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। চন্দ্রাপীড়েরও তাহাকে দেখা অবধি প্রতিক্ষণে উপচীয়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল। প্রতিদিন ইহার প্রতি প্রসাদ রক্ষা করিলেন এবং সমস্ত বিশ্বাসকার্যে ইহাকে আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এই সম্বন্ধটি অপূর্ব সুমধুর, কিন্তু ইহার মধ্যে নারী-অধিকারের পূর্ণতা নাই ; নারীর সহিত নারীর যেরূপ লজ্জাবোধহীন সখীসম্পর্ক থাকিতে পারে পুরুষের সহিত তাহার সেইরূপ অসংকোচ অনবচ্ছিন্ন নৈকট্যে পত্রলেখার নারী-মর্যাদার প্রতি কাদম্বরী-কাব্যের যে একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাতে কি পাঠককে আঘাত করে না? কিসের আঘাত? আশঙ্কার নহে, সংশয়ের নহে। কারণ কবি যদি আশঙ্কা-সংশয়ের লেশমাত্র স্থান রাখিতেন তবে সেটা আমরা পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি কথঞ্চিৎ সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা এবং সন্দেহের দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পর্যন্ত নাই। পত্রলেখা তাহার অপূর্ব সম্বন্ধবশত অন্তঃপুর তো ত্যাগই করিয়াছে কিন্তু স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সমীপবর্তী হইলে স্বভাবতই যে একটি সংকোচে সাধ্বসে এমন কি সহাস্য ছলনায় একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে ইহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই। সেই কারণেই এই অন্তঃপুরবিচ্যুতা অন্তঃপুরিকার জন্য সর্বদাই ক্ষোভ জন্মিতে থাকে।

চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার নৈকট্যও অসামান্য। দিগ্‌বিজয়যাত্রার সময় একই হস্তিপৃষ্ঠে পত্রলেখাকে সম্মুখে বসাইয়া রাজপুত্র আসন গ্রহণ করেন। শিবিরে রাত্রিকালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজশয্যার অনতিদূরে শয়ননিষণ্ণ পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন তখন নিকটে ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।

অবশেষে কাদম্বরীর সহিত চন্দ্রাপীড়ের যখন প্রণয়সংঘটন হইল তখনও পত্রলেখা

আপন ক্ষুদ্র স্থানটুকুর মধ্যে অব্যাহতভাবে রহিল। কারণ পুরুষচিত্তে নারী যতটা আসন পাইতে পারে তাহার সংকীর্ণতম প্রান্তটুকুমাত্র সে অধিকার করিয়াছিল—সেখানে যখন মহামহোৎসবের জন্য স্থান করিতে হইল, তখন ওইটুকু প্রান্ত হইতে বঞ্চিত করা আবশ্যকই হইল না।

পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর ঈর্ষার আভাসমাত্রও ছিল না। এমন কি, চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার প্রীতিসম্বন্ধ বলিয়াই কাদম্বরী তাহাকে প্রিয়সখীজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিল। কাদম্বরীকাব্যের মধ্যে পত্রলেখা যে অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে সেখানে ঈর্ষা সংশয় সংকট বেদনা কিছুই নাই, তাহা স্বর্গের ন্যায় নিষ্কণ্টক, অথচ সেখানে স্বর্গের অমৃতবিন্দু কই ?

প্রেমের উচ্ছ্বসিত অমৃতপান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ভ্রাণেও কি কোনো দিনের জন্য তাহার কোনো একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই ? সে কি চন্দ্রাপীড়ের ছায়া ? রাজপুত্রের তপ্তযৌবনের তাপটুকুমাত্র কি তাহাতে স্পর্শ করে নাই ? কবি সে প্রশ্নের উত্তরমাত্র দিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা।

পত্রলেখা যখন কিয়ৎকাল কাদম্বরীর সহিত একত্রবাসের পর বার্তাসহ চন্দ্রাপীড়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, যখন স্মিতহাস্যের দ্বারা দূর হইতেই চন্দ্রাপীড়ের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া নমস্কার করিল, তখন পত্রলেখা প্রকৃতিবল্লভা হইলেও কাদম্বরীর নিকট হইতে প্রসাদলব্ধ আর একটি সৌভাগ্যের ন্যায় বল্লভতরতা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে অতিশয় আদর দেখাইয়া যুবরাজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

চন্দ্রাপীড়ের এই আদর এই আলিঙ্গনের দ্বারাই পত্রলেখা কবিকর্তৃক অনাদৃতা। আমরা বলি কবি অন্ধ। কাদম্বরী এবং মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়তৃষার্ত চিরবঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেছে সে-কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। বাণভট্টের কল্পনা মুক্তহস্ত—অস্থানে অপাত্রেও তিনি অজস্র বর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। কেবল তাঁহার সমস্ত কৃপণতা এই বিগতনাথা রাজদুহিতার প্রতি। তিনি পক্ষপাতদূষিত পরম অন্ধতাবশত পত্রলেখার হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন তরঙ্গলীলাকে তিনি যে-পর্যন্ত আসিবার অনুমতি করিয়াছেন, সে সেই পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া আছে—পূর্ণচন্দ্রোদয়েও সে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করে নাই। তাই কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয় অন্য সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই।

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, ও রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও সংকলিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

চৈতালি

চৈতালি ১৩০৩ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় কবি চৈতালি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

> " 'চৈতালি' শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্রমাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।"

ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে (শিলাইদা, ১৪ আগস্ট, ১৮৯৫) 'কর্ম' কবিতাটি রচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

> "…মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা এক দিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁছ করতে গেল।…"

সাহিত্যের পথে গ্রন্থে প্রকাশিত "সাহিত্যতত্ত্ব" প্রবন্ধে কবি প্রসঙ্গান্তরে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

> "…ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে-তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ

বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় ছিলি! সে বললে, আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। বলেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক করে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল, সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

"সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।..."

"তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি" কবিতাটি কাব্যগ্রন্থাবলীতে চৈতালির সূচনায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ছিল; চৈতালির পরবর্তী সংস্করণে এটি আর ব্যবহৃত হয় নাই। রচনাবলীতে কবিতাটি কাব্যগ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত কবির পুরাতন হস্তাক্ষরে চৈতালির সূচনায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

কাব্যগ্রন্থাবলী-সংস্করণ চৈতালিতে মুদ্রিত "অভিমান" ("কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ") কবিতাটি চৈতালির প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। রচনাবলী-সংস্করণ চৈতালিতে সেটি পুনর্মুদ্রিত হইল।

৩৭ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র 'তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে' পড়িতে হইবে।

কাহিনী

কাহিনী ১৩০৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কাহিনীর অন্তর্গত "পতিতা" ও "ভাষা ও ছন্দ" কবিতা দুইটি নাট্য বলিয়া গ্রহণীয় না হইলেও, কবির ইচ্ছানুসারে গ্রন্থখানির অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রচনাবলীর নাট্য ও প্রহসন বিভাগে সংকলিত কাহিনীতেও ঐ রচনা দুইটি মুদ্রিত হইল।

নৌকাডুবি

নৌকাডুবি ১৩১৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিচিত্র প্রবন্ধ

বিচিত্র প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ রূপে ১৩১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৪২ সালে বিচিত্র প্রবন্ধের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ইহাই বর্তমানে প্রচলিত। এই সংস্করণে প্রকাশকের পাঠ-পরিচয়ে লিখিত আছে,

> "নানা কথা ও পথপ্রান্তে নামক রচনা দুইটি পঞ্চাশ বৎসর আগেকার "ভারতী" এবং "বালক" পত্রিকাদ্বয় হইতে সংগৃহীত। ইতিপূর্বে আর কোনো গ্রন্থে ইহারা প্রকাশিত হয় নাই। বিষয় ও ভঙ্গীগত মিল থাকায় আষাঢ়, সোনার কাঠি, ছবির অঙ্গ ও শরৎ—রচনা চারিটি "পরিচয়" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে যোগ করা গেল। পক্ষান্তরে, রাজপথ, য়ুরোপযাত্রী, পঞ্চভূত, জলপথে, ঘাটে, স্থলে ও বন্ধুস্মৃতি রচনা-কয়টি এবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, উহার কোনোটি পূর্ব হইতেই অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর, কোনোটি বা বিষয়ের সামঞ্জস্য হেতু শীঘ্রই গ্রন্থান্তরে সংকলিত হইবে।…গত দশ বৎসরের পত্র-সংগ্রহ হইতে ২৫টি পত্র বাছিয়া গ্রন্থশেষে "চিঠির টুকরি" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।"

প্রচলিত সংস্করণে ১৩১৪ সালের পরবর্তী বহু রচনা সংগৃহীত হইয়াছিল; কালানুক্রমিকতা রক্ষার জন্য রচনাবলীতে বিচিত্র প্রবন্ধের প্রথম সংস্করণই প্রধানত ব্যবহৃত হইয়াছে ও প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৩১৪ সালের পরবর্তী কোনো রচনা সংকলিত হয় নাই। রচনাবলীর অন্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থে যে-সকল রচনা সংকলিত হইয়াছে বা হইবে সেইগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত "অসম্ভব কথা" ও "রাজপথ" (বা "রাজপথের কথা") গল্পগুচ্ছে; "মন্দির" (বা "মন্দিরের কথা") ভারতবর্ষ গ্রন্থে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড); "য়ুরোপযাত্রী" (বা "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি") পাশ্চাত্য ভ্রমণ গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে; "পঞ্চভূত" স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে; "জলপথে", "ঘাটে" ও "স্থলে" ছিন্নপত্রে মুদ্রিত আছে বা হইবে; এইজন্য রচনাবলী-সংস্করণ বিচিত্র প্রবন্ধ হইতে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। "বন্ধুস্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় রচনাবলীর পরবর্তী কোনো খণ্ডে নূতন একটি "বন্ধুস্মৃতি" বিভাগে ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত সংকলিত হইবে। বিচিত্র প্রবন্ধের বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত ১৩১৪ সালের পূর্ববর্তী প্রবন্ধের মধ্যে "পথপ্রান্তে" প্রবন্ধটি রচনাবলী-সংস্করণে

মুদ্রিত হইল, "নানা কথা" প্রবন্ধটি "সংশোধিত" ও পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাহা এই গ্রন্থে সংকলিত হইল না, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত সেটি রচনাবলীর পরবর্তী কোনো খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

"রুদ্ধ গৃহ" প্রবন্ধ ১২৯২ সালের আশ্বিন-কার্তিকের "বালক" পত্রে মুদ্রিত হয়। ঐ সালের পৌষ মাসের বালকে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে একটি পত্র প্রকাশিত হয়।

> "বন্ধুবর—…'রুদ্ধ গৃহের' ভাব ধরিতে পারিলাম না। এক জনের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া থাকা, এক জনকে লইয়াই চিরদিন শোক করা আপনি গর্হিত বলিয়াছেন। কিন্তু কি করা যায় বলুন! যখন এক চন্দ্রের দিকে চাই তখন আমার দৃষ্টির অপূর্ণতাবশতঃ নক্ষত্রগুলিকে আর দেখিতে পাই না এবং সেই এক চন্দ্র যখন অস্ত যায় তখন নক্ষত্রেরা আমাকে আর তেমন আলো দিতে পারে না। একদিকে চাহিয়া থাকা, একের চারিদিকে ঘোরাই প্রকৃতির নিয়ম, তাহাই প্রকৃতির বন্ধনের কারণ। আজ যদি পৃথিবী বলিয়া বসে আমি সূর্যের চারিদিকে ঘুরিব না, কেননা সূর্যকে মেঘে ঢাকিয়াছে, সূর্য আমাকে আর আলো দেয় না, আমি অন্য আলোকের চেষ্টা দেখি, তাহা হইলে প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন হয়, পৃথিবীর মৃত্যু হয়, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। তাই বলিতেছি প্রকৃতির নিয়মই একদিকে চাহিয়া থাকা—পৃথিবীর ন্যায় এক সূর্যের বন্ধনে অনন্ত শূন্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়া। সে বন্ধন না থাকিলে শূন্যের মধ্যে আঁধারের মধ্যে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা। আর একটি কথা—পৃথিবী এক সূর্যের দিকে চাহিয়া ঘোরে বলিয়া কি তাহার কোটি গ্রহনক্ষত্রের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে? না সেই সূত্রেই অনন্তের সহিত পৃথিবীর বন্ধন হইয়াছে? তাই পর্বত আকাশের দিকে চাহিয়া সুন্দর, তাই নদী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সুন্দর, রাত্রি দিনের দিকে চাহিয়া সুন্দর, মনুষ্যও প্রকৃতির সন্তান, সেও যদি একদিকে চায় সেও সুন্দর হয়। শ্রীঅঃ—"

রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন,

> "সুহৃদ্বরেষু—…আপনি 'রুদ্ধ গৃহ' যে ভাবে বুঝিয়াছেন, আমি ঠিক সে ভাবে লিখি নাই। আপনি যাহা বলিয়াছেন সে ঠিক কথা। একের চারিদিকেই আমাদিগকে ঘুরিতে হইবে নহিলে অনেকের মধ্যে

বিলুপ্ত হইয়া যাইব। কিন্তু জগতের মধ্যে আমাদের এমন "এক" নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে "এক" হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে—এক কাড়িয়া আর এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের "এক" যৌবনের "এক" নহে। যৌবনের "এক" বার্ধক্যের "এক" নহে, ইহজন্মের "এক" পরজন্মের "এক" নহে। এইরূপ শতসহস্র "একে"র মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ "একে"র দিকে লইয়া যাইতেছে। সেইদিকেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই। জগতের আর সমস্ত "এক"ই পথের মধ্যে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিবার জন্য; বাস করিবার জন্য নহে। রাত্রি প্রভাত হইলেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে—পড়িয়া পড়িয়া শোক করিলে হইবে না। কিছুই থাকিতে চায় না অথচ আমরা রাখিতে চাই, ইহাই আমাদের যত শোকদুঃখের কারণ। "সকলকে যাইতে দাও, এবং তুমিও চলো। জগতের সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম করিয়ো না" এই কথা আমরা যেন সার জানি।

"শূন্যতার ভয় করিবেন না—কিছুই শূন্য থাকিবে না। সমস্ত শূন্য করিয়া দেয় জগতে এমন বিরহ কোথায়! ক্ষুদ্রতর এক বৃহত্তর একের জন্য স্থান রচনা করিয়া দেয়। হৃদয়ের পুত্তলিকাসকল ভাঙিয়া গেলে ঈশ্বর সেখানে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রিয়তমের মৃত্যুতে জগৎ প্রিয়তম হয়। ক্ষুদ্রকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎকে ভালোবাসিতে শিখি। জগতের কিছুরই মধ্যে আমাদের নিবৃত্তি নাই এবং সে নিবৃত্তিকামনা করা নিষ্ফল ও আমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক। আমাদের ভ্রম লইয়া আমরা কাঁদি বই তো নয়। যাহা যায় তাহাকে আমরা থাকে মনে করি, —যে নিজের ও সমস্ত জগতের জন্য হইয়াছে, তাহাকে আমরা আমারই জন্য হইয়াছে মনে করি,—যাহাকে আমরা কখনই চিরদিন ভালোবাসিতে পারিব না তাহাকে আমরা চিরদিনের জন্য চাই—কিন্তু প্রকৃতি-মাতা আমাদের এ সকল মিছে আবদার শুনিবেন কেন, আমাদের হাত হইতে মাটির ঢেলা কাড়িয়া লন, আমরা কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হই; কিন্তু সে কান্না ফুরায়, সে অশ্রুজল শুকায়, প্রকৃতির উপর হইতে আমাদের অভিমান চলিয়া যায়; আবার আমরা হাসি খেলি সংসারের কাজ করি, মাতার প্রতি আবার বিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু যে শিশু গোঁ ধরিয়াই থাকে,

কিছুতেই প্রসন্ন হইতে চায় না, তাহার পক্ষে শুভ নহে, সে মায়ের কাছ হইতে মার খায়, সেই রুদ্ধ গৃহ।

"আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই-চারিটা চন্দ্রসূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না, এক দিনের জন্যও তাহার ঘরকন্নার কাজ বন্ধ হয় না, অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে, তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে। তাহার কোলে আসিতেছে ও যাইতেছে; তাহার মুখ চিরপ্রসন্ন, তাহার স্নেহ চিরবিকশিত।

"যখন আমরা নিতান্ত এক জনের মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, তখন আমরা জানিতেই পারি না আমাদের কতখানি ভালোবাসিবার ক্ষমতা। একটি ক্ষুদ্র বস্তুও যখন চোখের নিতান্ত কাছে ধরি তখন মনে হয় সেই ক্ষুদ্র বস্তুটি ছাড়া আমাদের আর কিছুই দেখিবার ক্ষমতা নাই। সেই ব্যবধান অপসারিত করিয়া দাও, বৃহৎ জগৎ তাহার সৌন্দর্যরাশি লইয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।

"এই জন্য সচরাচর ভালোবাসাকে লোকে অন্ধ বলে, অথচ ভালোবাসার একটি প্রধান গুণ এই যে, সে দৃষ্টিশক্তি প্রখর করিয়া দেয়—ভালোবাসা চোখের উপর হইতে ব্যবধান দূর করিয়া দেয়। অপ্রেমিক কিছু দেখেই না, যদি বা দেখে, ভিতর পর্যন্ত দেখিতে পায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রেম অনেকটা অন্ধ বটে, কারণ সে একটুকুকেই এত করিয়া দেখে যে আর-কিছুই দেখিতে পায় না। সে, বৃহৎ সমগ্রের সহিত সেই একটুকুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে না—সে সেই একটুকুকে অংশ বলিয়া না জানিয়া সর্বেসর্বা মনে করে। এই ভ্রমে পড়িয়া অবশেষে তাহাকে শোক করিতেই হয়। এই জন্যই অনেকের দিকে চাহিয়া এই ভ্রম দূর করা আবশ্যক। আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এই ভ্রম ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

"সকল মানব-হৃদয়েই প্রেমের অমৃত-উৎস আছে; তাহার জন্যই জগতে সন্ধান পড়িয়া গেছে। প্রতিদিন ভাই ভগ্নী বন্ধু চন্দ্র তারা পুষ্প

সেই উৎস আবিষ্কারের জন্য হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, খনন করিতেছে। কত কঠিন পাষাণের স্তর বিদীর্ণ করিতে হইতেছে—প্রতিদিন পাষাণ টুটিতেছে ধৈর্য টুটিতেছে না। অল্প অল্প স্রোত উঠিতেছে আবার শুকাইয়া যাইতেছে। কিন্তু এক দণ্ড আঘাতের বিশ্রাম নাই। যত দিন যাইতেছে ততই মানব-হৃদয়ের সেই অমৃত-উৎস গভীরতর হইতেছে।

"যদি এমনি হয় যে, এক জন সহসা এক আঘাতে তোমার হৃদয়ের কঠিন স্তর বিদীর্ণ করিয়া অমৃত-উৎসের অনন্ত মূল অবারিত করিয়া দিয়াছে তবে সেই উৎস কি কেবল খননকারীর নাম-খোদিত সমাধি-পাষাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে? সংসারে শতসহস্র তৃষিত আছে। তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিয়ো না; তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের তৃষ্ণা দূর করো; তোমারই প্রিয়তমের কল্যাণ হইবে। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া সমস্ত আমেরিকা জুড়িয়া যদি নিজের গোরস্থান রচনা করিতেন সে কি তাঁহার যশের হইত? সভ্যতার বিলাসভূমি স্বাধীন উন্মুক্ত আমেরিকাই তাঁহার স্মরণচিহ্ন। জীবনই মৃত্যুর প্রকৃত স্মরণ-চিহ্ন। পুত্রই পিতার যথার্থ স্মরণচিহ্ন একমুষ্টি চিতাভস্ম নহে। প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রতই প্রেমিকের স্মরণচিহ্ন, পাষাণভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল নহে।

"প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে শিলমোহরের ছাপ মারিয়া "আমার" বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে। তাহার উৎসের মধ্যে গোরের মাটি চাপা দিয়া তাহার প্রবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা কেবল বৃথা কষ্টের কারণ মাত্র।

"মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি। কিন্তু অনেক সময় সে-ভয় অকারণ। বিস্মৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া স্মৃতির শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া যায়। আমাদিগকে কিছুক্ষণের মতো স্বাধীন করিয়া দেয়। যখন কোন কার্য বা ঘটনা হইতে তাহার সমস্ত ফল লাভ করিয়া চুকাইয়া দিয়াছি বা তাহারা নিষ্ফল ভাবে আমাদের কাছে স্তূপ বাঁধিয়া আছে তখন বিস্মৃতি আসিয়া সেই সমস্ত উচ্ছিষ্ট-অবশেষ ও আবর্জনা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেয়। শাবক বাহির হইয়া

গেলে ডিমের খোলা ফেলিয়া দেয়, মুকুল ঝরিয়া পড়িলে তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দেয়। প্রতি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি জমিয়া জমিয়া অবশেষে আমাদের বাতাস আটক করিতে চাহে, আমাদের নীলাকাশ রোধ করিতে চাহে, পদে পদে আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করে—বিস্মৃতি আসিয়া এই সকল বেড়া ভাঙিয়া দেয়। বিস্মৃতি আমাদের জীবন-গ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবন-বিকাশের সহায়তা করে। একটি গ্রন্থের মধ্যে সহস্র দাঁড়ি আছে, তবে তো তাহাতে ভাব ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। এক জীবনের মধ্যেও শতসহস্র বিস্মৃতি চাই তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণবিরুদ্ধ একটিমাত্র দীর্ঘস্মৃতি লইয়া জীবন শেষ করিলে জীবন শেষই হয় না।

"অতএব আমাদিগকে বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না। তাই বলিয়াছিলাম দ্বার রুদ্ধ রাখিয়ো না, যে আসে সে আসুক যে যায় সে যাক আমি কেবল প্রীতি ও প্রিয়কার্য সাধন করিব।"

প্রাচীন সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্য গদ্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ রূপে ১৩১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন সাহিত্যের ধম্মপদং প্রবন্ধটি ভারতবর্ষ গ্রন্থে (রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড) মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ প্রাচীন সাহিত্য হইতে বর্জিত হইল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী